

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও নির্মাল্য আচার্য সম্পাদিত

সাহিত্য ও সংস্কৃতিবিষয়ক দ্বিমাসিক পত্রিকা শাসনীয় সংখ্যা ১৩৮০



কবাকুমুম

তেন মাথা কি ছেড়েই দিনি?

তা কেন, দিনের বেলা তেন
মোখে ধূসে বেড়াতে
অনেক সময় অমুবিধা লাগে।

কিন্তু তেন না মোখে
চুলের খসু নিবি কি করে?
আমি তো দিনের বেলা

অমুবিধা হলে বাহ্যে
সুত খাবার আগে ভাল
করে কবাকুমুম মোখে
চুম খাচড়ে শুই।

কবাকুমুম মাথনে
চুম তো ভাল থাকেই
ধুমত জবী ভাল হয়।



সি. কে. সেন অ্যান্ড কোং
প্রাইভেট লিঃ
কবাকুমুম হাউস,
কলিকাতা, নিউ দিল্লী



১৯৫১-৫২

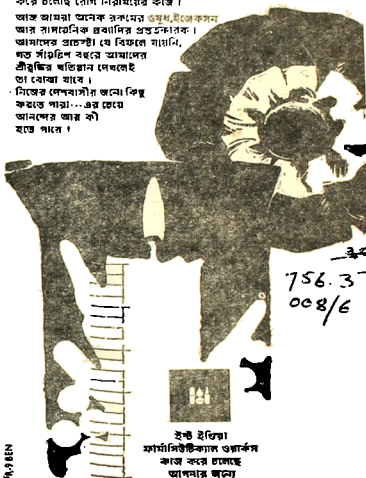
দেশবাসীর জন্যে উৎকৃষ্ট ওষুধ তৈরি করা—৩৭ বছর ধরে এই আমাদের লক্ষ্য

দেশের সামাজিক লজ্জা পূরণে এই আমাদের প্রাথমিক কাজ।
আমাদের অশ্রম যে ওষুধ ভারতে, তাই নয়
মনে-প্রাণেও আমরা ঘোল আনা ভারতীয়।

অসুখ-বিসুখ ঠেকিয়ে দেশবাসী যাতে নিরোগ জীবনযাপন করতে
পারেন, সেজন্যে আমরা বামিয়ে চলেছি নানা ধরনের
ওষুধ। আর নিতনতুন পণ্যসমগ্র মাধ্যমে সমানে
করে চলেছি প্রোগ নিরাময়ের কাজ।

আজ আমরা অনেক রকমের ওষুধ, ইজেকশন
আর রাসায়নিক প্রবাসির প্রস্তুতকারক।
আমাদের প্রচেষ্টা যে বিফলে যায়নি,
গত সাতটিশ বছরে আমাদের
ঐতিহ্যের স্বত্ত্বান দেশেই
তা বোঝা যাবে।

মিজের দেশবাসীর জন্যে কিছু
করতে পারা... এর চেয়ে
আনন্দের আর কী
হতে পারে।



309
756.3
008/6
3/22/51
2.1.60

ইস্ট ইন্ডিয়া
ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস
কাজ করে চলেছে
আপনার জন্যে

ENCLOSURE

ইস্ট ইন্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড, কলিকাতা-৬৩

আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই

করোগেটিং অ্যাণ্ড পেপার প্রসেসিং
কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড

২৪৩ ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড
কলকাতা ৩৬

টেলিফোন : ৫৫-৩০৫৮/৫৯

সোনা রং শরৎ দিনে
আজ উৎসবের সুরঝংকার

মারফি রেডিও

সেই সুর-লহরী নিয়ে যাক
আপনার ঘরে



পূর্বভারতের একমাত্র পরিবেশক :

দেবসবস প্রাইভেট লিমিটেড

কলিকাতা • পাটনা • কটক • পৌহাটী • জবলপুর

বিশ্বভারতী

শ্রী প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য

এই গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে একটি দুঃ দেশকালের রাষ্ট্রনৈতিক সামাজিক ও ধর্মীয় ইতিহাস, বিবৃত হয়েছে ঐশ্ব্যনির সঙ্গে হিন্দুধর্মের বিরোধ, তাৎকালিক সাময়িক পত্রপত্রিকা এবং গ্রন্থপ্রকাশের ইতিবৃত্ত, বাংলা গল্পের ধীর অথচ সুনিশ্চিত পদক্ষেপের কাহিনী। রঙিন চিত্র ও সুদৃশ্য প্রচ্ছদে সুবিত। মূল্য ১২'০০, শোভন ১৫'০০ টাকা।

শ্রী রানী চন্দ

শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ

অবনীন্দ্রনাথের শিল্পকৃষ্টির চিত্রাকর্ষক কাহিনী এবং ব্যক্তি অবনীন্দ্রনাথের অস্বল্প পরিচয়। অবনীন্দ্র জয় শতবর্ষ উপলক্ষে প্রকাশিত। শিল্পীগুরুর আত্ম-প্রতিকৃতি, বিখ্যাত রঙিন চিত্র 'কালো মেয়ে', কুটুম কাটাঘের তিনখানি প্রতিলিপি এবং সুদৃশ্য প্রচ্ছদপটে অনংকৃত। মূল্য ১০'০০, শোভন ১২'০০ টাকা।

শ্রী মলিনা রায়

চার্লস ফ্রিয়ার এগুরুজ

ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের একনিষ্ঠ সেবক, বিশ্বভারতীর আদর্শ প্রচারে রবীন্দ্রনাথের একান্ত সহকারী বহু, গাফীতি ও বিদ্বেষনাথের সহোদর তুল্য চার্লস ফ্রিয়ার এগুরুজের বহুবিচিত্র জীবনের সরস ও সুখপাঠ্য আলোচ্য। বহুবর্ণ চিত্র, পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি এবং সুদৃশ্য প্রচ্ছদপটে অনংকৃত। মূল্য ১০'০০ টাকা।

শ্রী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

আধুনিক শিল্পশিক্ষা

আধুনিক ভারতে শিল্পশিক্ষার ইতিহাস, তিনটি পর্বায়ে আলোচিত : ১, ইংরাজ-প্রবর্তিত আর্ট স্কুলের শিক্ষা, ২, ভারতীয় পদ্ধতিতে শিল্পশিক্ষা এবং ৩, আধুনিকতম শিল্পশিক্ষার আদর্শ ও উদ্দেশ্য। এই রচনা শিল্পী ও শিল্প-অনুসন্ধিৎসু হিমায়ে লেখকের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের মনোভাব। অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলালের শিল্প সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা সংবলিত। মূল্য ৬'০০ টাকা।

বিশ্বভারতী

১০ প্রিটোরিয়া স্ট্রিট। কলিকাতা ১৬



অবাধ খুশির আবরণে ছোটোদের বাড়ন্ত পা

বাড়ানোর চাইতে ছোটোরাই অনেক অনায়াসে
ঠিক জিনিসটা বেছে নিতে পারে। তাই ওদের বাড়ার
জুতো এত গুরুত্ব। বড়োরাও সার মেন।
কেননা, বাড়ার জুতো ক'টা শূন্য থেকে ঘেঁষে জড়িয়ে
রাখে, তেমন বাড়বারও সম্ভাবনিতা দেয়। বক,
জিভাইন, পুরার আরাম, অমরবৃত্ত—সবকিছতে চোখ রেখে
বাড়ার জুতো টিভি। ছোটোদের মনমতো
জুতো বেছে নিতে দিন। দেখবেন ঠিকটি বেছে নেবে।

বাড় ৮৭
২০.৫০



বাড় ৩১
২০.৫০



বাড়ার ১৮
৫.২৫



মোকাসিন ১৫
৫.৫০-৬.৫০



বাড়লা ৫২
৫.২৫-৬.২৫



বালক ১৭
৮.২৫



Bata
Bata
Bata
Bata

Insist On
“KHATAU VOILES”



The Khatau Makanji Spg.
& Wvg. Co. Ltd.,
Laxmi Building,
6, Shoorji Vallabhadas Marg,
Fort, BOMBAY 400001.



আপনার কর্মসংস্থান
আপনি নিজেই করতে পারেন

কানাড়া ব্যাঙ্ক
আপনাকে সহায়তা করবে

এ কাজে কানাড়া ব্যাঙ্কের ঐতিহ্য বহু বছরের ।
যে সমস্ত অভিজ্ঞ ও উদ্যোগী ব্যক্তি নিজেদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা
করতে ইচ্ছুক অথবা যারা তাঁদের বর্তমান ব্যবসায়ের প্রসার বা উন্নয়ন
চান তাঁদের সাহায্যে কানাড়া ব্যাঙ্ক সর্বদাই প্রস্তুত ।

চিকিৎসক, যোগাতাসম্পন্ন ইঞ্জিনিয়ার, দক্ষ কারীগর বা অন্যান্য বিষয়ে
প্রয়াসী — যারা নিজস্ব কোনো উদ্যোগ প্রতিষ্ঠা করতে ইচ্ছা করেন —
তাঁদের সকলের জন্তে আমাদের বিশেষ পরিকল্পনা আছে ।
বিস্তারিত বিবরণের জন্ত আপনার নিকটবর্তী শাখায় আসুন ।

কানাড়া ব্যাঙ্ক

হেড অফিস : বাঙ্গালোর ২

জ ন গ ণের সে বা য় নি.যু.ক্ত

The Alkali and Chemical Corporation of India Limited—popularly known as ACCI—has been a pioneer in the manufacture of chemicals in India.

Established in 1937 at Rishra near Calcutta, ACCI's operations started with the commissioning of the first electrolytic plant in India to produce liquid chlorine and caustic soda. Ever since then there has been unique progress in the volume and variety of the products manufactured by the company.

In 1949 a synthetic hydrochloric acid plant was started. The following year a "Gammexane insecticide formulation plant using impure benzene hexachloride (BHC) was started and the manufacture of BHC commenced in 1952. Meanwhile in 1951 the production of synthetic and nitrocellulose paints was undertaken.

Growth

has been of enormous

A major expansion took place in 1959 with the establishment of India's first plant in Rishra for the production of polythene. Another new product range was added with the manufacture of rubber chemicals in 1963, again for the first time in India.

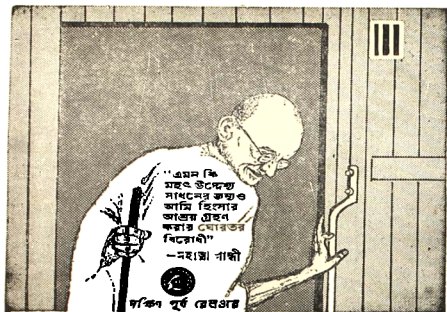
The present range of ACCI's manufactures includes caustic soda, chlorine, hydrochloric acid, BHC technical and formulations, organic fungicides, liquid insecticides, water treatment products, emulsion synthetic and nitrocellulose paints, metal pretreatment chemicals, polythene granules and compounds, rubber chemicals and veterinary pro-

ducts. ACCI also proposes to manufacture a range of pharmaceutical specialities.

Over the last thirty years ACCI has played a significant role in the industrial development of the country by supplying a diverse range of products for industry and agriculture. Today this chemical complex covers an area of 100 acres and employs nearly 3000 people.



The Alkali and Chemical Corporation of India Limited



STADMED ENTROZYME tablets

Safe and sure remedy for amoebic and mixed dysenteries, intestinal amoebiasis, fermentative dyspepsia, diarrhoea etc.

STADMED
PRIVATE LIMITED,
CALCUTTA-700020

আমরা ধরে নেব ব্রাহ্মণ্যায় শ্রুতিমুখির খেলা
নীল আকাশে কে ভ্রমালে সাদা মেঘের খেলা।

শান্তিনিকেতন...

শরতের নির্মল আকাশ আর
ধানক্ষেতে দোলা লাগানো সূর্যমল্ল বাতাসের স্পর্শ। এখানে ওখানে
হাজিরো গাছের আড়ালে নাম-না-জানা অক্স প্রাণির ভীড়। সুবকি-
ঢালা লাল গাছের পাশে পাশে গাছের ছায়ায় প্রাচীন তপোবনের
ঐতিহ্য। একাধিক বিশ্বকর মূর্তি...ভাস্কর্যের বিমূঢ় প্রতীক। উপবন
বিচিত্র। আর উদয়ন...কবিগুরুর পূণ্য স্মৃতিধন। অম্লকুণ্ড আর শাল-
বীধিতে পথিকের ভীড়। আগ্রমের বাইরে মেঠো পথে রাখালিরা বাঁশের
হুঁর। এ সব নিয়েই আজকের শান্তিনিকেতন... আপনার আমার
'প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি'।

আজই চলে আসুন। আরামদায়ক আর মনোমত্ত ভ্রমণের জন্যে ট্যুরিস্ট
লব্ধ আর কটেজের খোঁজ নিন। রিজার্ভেশনের জন্যে আমাদের সঙ্গে
যোগাযোগ করুন :

ট্যুরিস্ট ব্যুরো

কলিকাতা-১ কোড : ২৫-৮২৭১

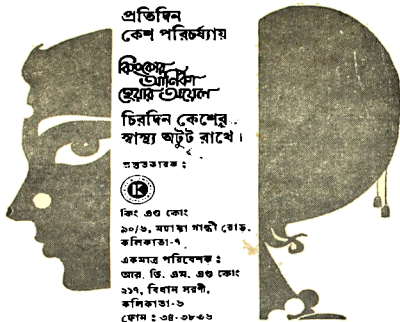
ডায় : TRAVELTIPS

৫/১, বিনয়-বাসল-সীমেল বাগ (ডালহৌসি হোয়া'ব) ঠাকু

হুয়া'স্তা (পল্টন) বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার





প্রতিদিন
কেশ পরিচর্যায়
কিঙ্কর
আনিকা
হয়োর অয়েল
চিরদিন কেশের
স্বাস্থ্য অটুট রাখে।

প্রস্তুতকারক :



কিং এণ্ড কোং
৯০/৯, মহাশ্বা গান্ধী রোড,
কলিকাতা-৭
একমাত্র পরিবেশক :
আর. ডি. এম. এণ্ড কোং
২১৭, বিধান সরণী,
কলিকাতা-৬
ফোন : ৩৪-৩৮৬৬

With Best Compliments Of

ANKAR INDUSTRIES

16/1 GANESH CHANDRA AVENUE

CALCUTTA 700013

দূরকে নিকট করার শুভলগ্ন

আকাশে মেঘ

ইতিমধ্যেই হালকা হতে শুরু করেছে।

লঘুপক্ষ পাখির মতো তাদের আনাগোনা।

আন্দোলিত তরুশাখায় দূরের হাতছানি।

শান্ত নদীর ঢেউয়েও দেখো যাবাব তাড়া।

বেরিয়ে পড়ার দিন। ঘরে ফেরার দিন।

দূরকে নিকট করার শুভলগ্নও বলতে পারো।

সত্যিসত্যিই পূজা এল।

নির্বিঘ্ন যাত্রায়
পূজার আনন্দ নির্বিঘ্ন হোক

পূর্ব রেলওয়ে



MORE POWER FOR MORE EMPLOYMENT

**Till March 1972 electricity reached only 3328
of the total number of 38458
villages of West Bengal.**

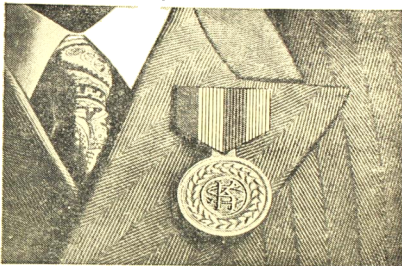
**By August 1973 the Board took power to
nearly 4500 additional villages.**

**Rural Electrification is the key to a better
future.**

In the service of the people

West Bengal State Electricity Board

আমরা 'টেরিন' স্মার্টিং-এর নিশানা এম. কুমারের নাম!



নতুন যুগের তালে তাল বেখে উৎকৃষ্ট
বুনটের আকর্ষণীয় ঘনলোভা কাপড়
ভৈরী হয় ক্যাফি, মাহুড়া আর লক্ষ্মী
বিক্রম মত স্নানামথনা প্রতিষ্ঠান! আর
এই সব স্মরণ 'টেরিন' স্মার্টিং, শাটিং
আর শাড়ী আপনার জন্যে এনেছে
এম. কুমার! সারা দেশে আমাদের পুরস্কার
সহযোগী ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক

আর সুব্যবস্থিত গবেষণার ব্যবস্থা।
ব্যাকার ফলে আমরা জানি আপনারদের
পছন্দ দিক কি—কারগ, আপনারদের
পছন্দই আমাদের পছন্দ! জীবন রঙীন
করে তুলুন... পক্ষ আপনার পছন্দমত
কাপড়... উপভোগ করুন এক অসুখ
অনুভূতি... আর, এই অনুভূতিরই
অন্য নাম— এম. কুমার!

এম. কুমার

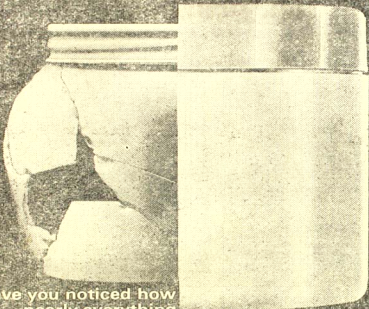


রেজিষ্টার্ড
ট্রেড মার্ক

'টেরিন' স্মার্টিং, শাটিং ও শাড়ীর ক্ষেত্রে
এক নির্ভরযোগ্য নাম!

এম. কুমার, নিরঞ্জন, ৯৯, দেবরীন্ড ক্রাইড, বম্বে ৪০০ ০০২

BBTA 1-1K-107-82N



Have you noticed how
nearly everything
is being made
a lot better, lately?

Then you've noticed STYRON.
Lighter than glass, yet not so fragile. Clearer than crystal.
Yet boasts an entire spectrum of rainbow colours. Easy to mould,
easy to decorate. STYRON represents a revolution in packaging.
Wherever packaging counts, STYRON counts most.
No wonder life's getting better.

STYRON
makes a world of difference

Write or call us:
Indur Chemicals Co.
Private Ltd.
7, Jambhuli Tala Road
Chembur, Rastmation
Bamby 20



POLYCHEM LIMITED
7, Jambhuli Tala Road
Chembur, Rastmation Bamby 20
* STYRON is manufactured under license from
The Dow Chemical Company, U.S.A.

Premier MINIBUS

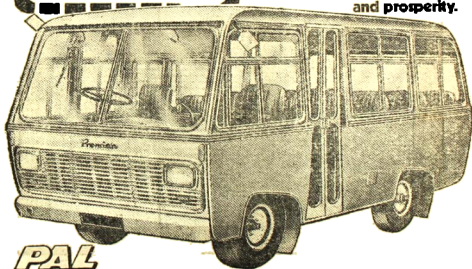
An ideal
CONTRACT CARRIAGE
for point to point
transport in peak hours
in Metropolitan towns.

An acute transport problem?

That's what we are facing in almost all the metropolitan towns. The crying need is to have a supplementary transport to the city bus service and the suburban railway service, wherever it exists. Elegant Premier Minibuses run as contract carriages is the answer. Built on short wheel base (2907 mm), full forward control, Premier model Pioneer PFS-45/29 Chassis, they blend practical utility and elegance with comfort.

Built essentially for light commercial application, they are extensively used all over India as Minibuses, Delivery Vans, Ambulances, Publicity Vans, Mobile Banks, Mobile Post Offices and Mobile Workshops.

Premier
your prime mover to progress
and prosperity.



PAL

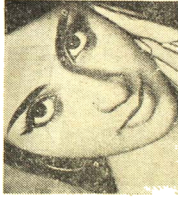
বুনটে, গঠনে,
বেচিদ্রে, স্থায়িত্বে
— অতুলনীয়



- গেঞ্জী ও মোজা
- জামিয়া ও স্কাটসার্ট
- বক্সআবরনী ও ইলাস্টিকটুপ

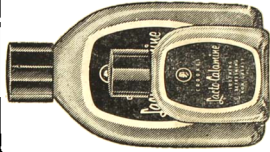
Marketed by J Sales Division - Calcutta-12

Behind every
beautiful face,
there's always a
beautiful secret



CROOKES
Lacto-Calamine

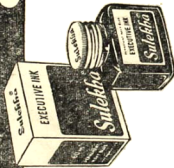
Duphar-Intorfran Ltd. Bombay-18.



The complexion-care secret

Your aim is to look pretty. Crookes Lacto-Calamine's job is to keep your skin that way. Clear. Fresh. Fair. Pretty. Nothing else does so much for your skin with so little effort. Use Crookes Lacto-Calamine morning and evening before you make up your face — and last thing at night. Then watch how your face grows beautiful — stays beautiful!

ସମ୍ମାନ ଡ଼େକର୍ସ୍‌ରେ ବିବିଧା ମୂଲ୍ୟାଧୀ



ଅସ୍ଥିକିର୍ତ୍ତିତ ଇଞ୍କ
ମହଲମତ ଗୁଡ଼େ ମାରିନ—

ସାମାନ୍ୟତଃ :
ଏସ୍ ଏକାକ • ମୋଡି ଏସ୍
ମୁଖାର ଏକାକ • ଡାକ ଟ୍ରାଫିକ୍
ଓଡ଼ିଆସବନ :
ସହାନ ଏସ୍ • ଏସାରାଓ ଟ୍ରାଫିକ୍
କାରକାର୍ତ୍ତ ରେଡ • ଡିନିଆର ଡାହାଲଟ

ମୁଲ୍ୟାଧୀ ଓହ୍ଲାର୍କମ୍ ମିନିମିଡିଡ
କନିକାତା • ମାଡିଆରାମ

IMPALA SW 53/73



Trans-world maritime trade routes meet at **SCINDIA**

Every man's cliché —
'The world's a small
place', and most
businessmen's thoughts:
'SCINDIA visits every
major world port'. East or
West, North or South —
SCINDIA ships your cargo
to safety with her fast,
efficient economic services |

Scindia ships ply through
INDIA-BANGLADESH-
PAKISTAN-SRI LANKA-
BURMA-WEST ASIA GULF-
RED SEA-WEST AFRICA-
U.K.-CONTINENT-POLAND-
SCANDINAVIA-
MEDITERRANEAN-ADRIATIC-
A.R.E-BLACK SEA-SINGAPORE-
MALAYSIA-INDONESIA-
HONG KONG-TAIWAN-U.S.A.-
GREAT LAKES-CANADA-
MEXICO-CARIBBEAN-
SOUTH AMERICA-
CENTRAL AMERICA,



THE SCINDIA STEAM
NAVIGATION CO., LTD.,
Scindia House,
Narottam Morarjee Marg,
Ballard Estate, Bombay-1.
Telephone 269161
Telex 011-2205/011-3519

AGENTS IN ALL PRINCIPAL
PORTS OF THE WORLD

কখনো কখনো কাভের কাথা জানতে পূর্ব প্রস্তুতি হ'তো না।

তখন উনি খেতে শুরু করলেন

ভিনকোলা-১২

আমরন-উটামিন টনিক



এখন থেকে দেখুন! কাভে কতো উৎসাহ, মনে কতো ফুটি!

কখনো কখনো অশনিষড় নিক্স মনে হয়
শরীরে বল নেই, মনে উৎসাহ নেই। ভাব
আশনার জন্মে দরকার ভিনকোলা-১২...
সুখটি আরনে-ভিটামিন টনিক যা আপনাকে
একদম ওঠানোজ্ঞ করবে তুমারে।



১. কোভার ফার্মাচুটিফার্ম সিং. কলিকতা-৩৫



এবার পৃথিবীর
প্রীতির উৎসব

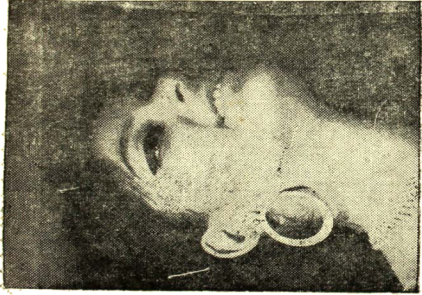
হাকোবা

এন্ট্রয়ডার্ভ ফ্যাব্রিকস্



হাকোবা হলো এন্ট্রয়ডার্ভ ফ্যাব্রিকস্, আ ও এন্ট্রয়ডার্ভ ফেল্ড-এর বেসিটার্ড ট্রেডমার্ক

- ১৩৫ কংগ্রেস ক্যালি কর্পোরেশন লিঃ, ১৩, বম্বে সন্মোচন ইন্ড, বোম্বাই-১



কান্তা

-মৌরভে

আপনার মনোহরণ করবে

...আনন্দিত করে যুগে
আপনার জীবন। হালকা মিষ্টি
গন্ধের ছোঁয়ায় এমন তরুণ
পুলক বোধাক। কান্তা আপনাকে
নিবৃত্ত করবে; কখনও এক
লৌহিত্যের রস—মুগ্ধ হইবে
স্বপ্নের মত।



ক্যালকাটা
কোমিক্যানের ষ্ট্রী



THERE'S
SO
MUCH
MORE TO
M & M

Now join the famous JEEP vehicles. M & M are equally active in
STEEL - M & M make available to the country a wide range of steel and alloy sheets.
MACHINE TOOLS - M & M bring to a choice of machine tools from
U.K., West Germany, Canada and India.

INSTRUMENTATION - M & M provide industrial Electronic, Process Controls
and Automation Equipment.

ELECTRONICS - M & M manufacture Industrial Controls, Professional Grade Components,
Electronic Medical Instruments and Military Equipment.

AGRO-AVIATION - M & M undertake aerial agricultural and pest material spraying.

For technical programs with a social purpose.

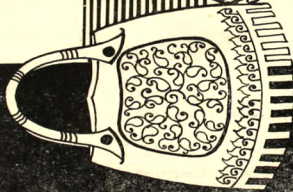


MAHINDRA & MAHINDRA LTD.
Ranney Building, Apollo Bungalows, Bandra 4.

Silpa Sree Works

MANUFACTURERS & EXPORTERS
7, SHAMA CHARAN DE STREET,
CALCUTTA-12

Advertisement



Telephone :
34-3734

Telegrams :
"JADRISHI" Calcutta.



ই ই

ইউবিআই-তে ব্যাঙ্ক বোঝায়
ইশানবাবু টাকা জমায়।

SSDG-72



ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)

বিবাহ, উৎসবে ও উপহারে
বেনারসী, সিল্ক ও তাঁত বস্ত্রের সম্ভ্রান্ত প্রতিষ্ঠান
সিলেক্ট হোম

২১০/১এ ও বি, বাঙ্গাবিহারী এভিনিউ, গড়িয়াহাট মোড়।

কলিকাতা - ২২ । ফোন : ৪৬-৫৩৭২

ঋষিকনি বন্ধনের আনন্দমগ্নে সত্যানন্দ যখন মাতৃপ্রতিমার
সম্মুখে নেতৃত্বাপন্ন করবার বাসনা প্রকাশ করেছিলেন,
বন্ধিমহর্ষি তখন তাঁকে মাতৃমূর্তি দর্শন করাত্তে চাইলেন।
মহাপুরুষের মুখ দিয়ে তিনি বললেন :

চল, জ্ঞানলাভ করিবে চল। হিমালয়-শিখরে মাতৃমন্দির
আছে, সেইখান হইতে মাতৃমন্দির দেখাইব।...

কি অপূর্ণ শোভা !...জ্ঞান আসিয়া ভক্তিকে ধরিয়াছে—
ধর্ম আসিয়া কর্মকে ধরিয়াছে ; বিসর্জন আসিয়া
প্রতিষ্ঠাকে ধরিয়াছে।

বন্ধিমহর্ষির মানসনেত্রে এই বাঙালীর মাতৃমূর্তি। মাতা
দশভূজার আগমনে তারই মঙ্গলগীত আকাশবাতাসে ধ্বনিত
হোক :

কে. সি. দাশ প্রাইভেট লিঃ

কলিকাতা ॥ ব্যাপারের

আবিষ্কারক : রসোয়ালাই

কেম্বো-কার্বিন

আপনার চুলের সত্যিকারের যত্ন নেয়



এখন থেকে
উন্নততর ফরমুলায়
নীলাভ-সবুজ রঙে
ভৈরী হচ্ছে

মেক মেডিকেলের ভৈরী

Deyan

শতাব্দিকী সঙ্গণে

নটশূর্য অষ্টীন্দ্র চৌধুরীর ভূমিকা এবং নাট্যকার

নম্রথ দায়ের গ্রন্থপরিচিতি সংবলিত

সাপারণ রঙ্গালয়ের ইতিহাস

শিশির বসু রচিত

একশ বছরের বাংলা থিয়েটার

প্রথম খণ্ড : ত্রিশ টাকা

নাভানা ॥ ৪৭ গনেশচন্দ্র অ্যান্ডসনিউ ॥ কলিকাতা ১৩

বিশেষ ঘোষণা

সতীনাথ গ্রন্থাবলী

সম্পাদনা : শঙ্খ ঘোষ / নির্মাল্য আচার্য

দ্বিতীয় খণ্ড ৭ ১৮'০০

সতীনাথ ভাট্টাচার্য গ্রন্থাবলীর জন্ম নতুন করে দ্বিতীয় পর্যায়ের গ্রাহক নেওয়া হচ্ছে। ১০'০০ টাকা জমা দিয়ে গ্রাহক হয়ে হবে। গ্রাহকরা ১০% বাদ দিয়ে নগদ মূল্যে বই পাবেন। তৃতীয় খণ্ড এবং চতুর্থ খণ্ড ছাপা হচ্ছে। প্রথম খণ্ড আন্তর্জাতিক ফেব্রুয়ারী '৭৪ সালে পাওয়া যাবে। জমার টাকা শেষ খণ্ড নেবার সময় বাদ যাবে। এই গ্রন্থাবলী সম্পাদন, ছাপা, কাগজ, বাধাই ইত্যাদি প্রতিটি বিষয়েই বৈশিষ্ট্যের দাবী রয়েছে।

আমাদের প্রকাশিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

কবিতার ক্লাস ৫'০০

পরিগণিত ও পরিমাপিত তৃতীয় সংস্করণ

শঙ্খ ঘোষ

নিঃশব্দের তর্জনী ৪'০০

ছন্দের বারান্দা ৩'০০

অশ্রুকুমার সিকদার

আধুনিক কবিতার দিগ্‌বলয়

অক্ষণা প্রকাশনী : ৭ হুগলকিশোর দাম লেন, কলকাতা ৬

পরিবেশক : সিগনেট বুকশপ : ১২ বঙ্কিম চ্যাট্টো স্ট্রিট, কলকাতা ১২

মা ও শিশুকে সুস্থ, সবল করে গড়ে তুলুন

- ভিটামিনেরা, ভিটামিন ক্যা, ও ধাতুঃকায় রোগের প্রতিষেধক হিসাবে শিশুদের ট্রিপল এন্টিজেন দিয়ে দিন।
- মা ও গর্ভস্থ শিশুদের ধাতুঃকায় রোগ প্রতিরোধের জন্য টিটেনাস টক্সয়েড দিন।
- মায়াদের রক্তশূন্যতা প্রতিরোধের জন্য ফলিয়ার ট্যাবলেট খেতে দিন।
- অন্ধ ও রাতকানা শিশুদের ভিটামিন 'এ' অয়েল প্রতিষেধক হিসাবে খাওয়ান।

যে কোন পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রে যোগাযোগ করে
এ সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য জেনে নিন।

Advt. no. 230173-74 (প. ব. গা. প. প. সংখ্যা)

With Best Compliments

KRISHNAGAR FERTILIZER AND AGRO CHEMICAL COMPANY

BOWBAZAR,
KRISHNAGAR
NADIA

সুবর্ণরেখার বই

সুবর্ণরেখা । ৭৩ মহাখা গান্ধি রোড । কলিকাতা ৯

বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা ॥ সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

বাঙালীর বাঙ্গালীত্বচর্চায় এমন তথ্যবহুল ইতিবৃত্ত এর আগে আর লেখা হয় নি। রামমোহন রায় থেকে হরেন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ, চিত্তবস্তু, বরীন্দ্রনাথ, হুতাসচন্দ্র ও মানবেন্দ্রনাথ প্রমুখ ১২ জন বাঙালীর বাঙ্গালীত্ব মনীষার বিশ্লেষণ করেছেন লেখক এ-বইয়ে। মূল্য ১৮-০০

প্রাচীন শিল্প-পরিচয় ॥ গিরীশচন্দ্র বেনাধ্যায়

বাঙালী পার্শ্বের দৌড়ানায়িত গ্রাহ অর্থতাত্ত্বিক পথে বইটির পুনর্মুদ্রণ সম্ভব হয়েছে। ভারত-সংস্কৃতি সম্পর্কে অল্পদৃষ্টিয় ব্যক্তিমায়েবই এ বই অবগত-পঠনীয়। অলঙ্কার, ছাতা, জুতা থেকে শুরু করে পাঁকবিজা, চিরবিজা সহ ৬৬টি বহুবিচিত্র বিষয় এটি গ্রন্থে আলোচিত। ‘...পণ্ডিত মচালয়ের গবেষণা-প্রবৃত্তি ও অধ্যবসায় দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছি।’—লিখেছেন রামেন্দ্রসুন্দর দ্বিবেদী। সচিত্র। মূল্য ৭-০০

বীরভূমের যম-পট ও পটুয়া ॥ দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

হাল আমলে বাংলাভাষার লোকশিল্প সম্পর্কিত আলোচনার অভাব নেই। কিন্তু সে-সবের অধিকাংশই পুঁথিগত পাণ্ডিত্যের বোঝার ভাষাক্রান্ত। দৈনিক থেকে ‘বীরভূমের যম-পট ও পটুয়া’ বইটির বিশিষ্টতা পার্শ্বকম্পারেরই চোখে পড়বে। বীরভূমবাসী হিসেবে দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় মেথানকার পটুয়া-সমাজের সঙ্গে দীর্ঘকাল বনিষ্টভাবে মেলামেশার সুযোগ পেয়েছেন। উরু শিল্পীগোষ্ঠী ও তাঁদের শিল্পকর্মের সঙ্গে লেখকের প্রত্যক্ষ পরিচয় থেকেই এই ছোট বইটির জন্ম হয়েছে। সচিত্র। মূল্য ৪-০০

গল্প-সংগ্রহ ॥ কমলকুমার মজুমদার

সম্প্রতিকালে বাংলাভাষার প্রকাশিত সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ। এ বই সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে ‘দেশ’ (৫-৪-৭৩) লিখেছেন, ‘...তার রচনার যে শিল্পগুণ, যাহাযে চরিত্রের অন্তর্নিহিত ধর্মটি খুঁজে বার করার যে ক্ষমতা, ইন্দোনীকালের কোনো বাঙালী লেখকের মধ্যে তা নেই। লেখক হিসেবে তিনি চিরকালের আসরে স্থান পেতে পারেন।’ এই বহুপ্রশংসিত লেখকের এযাবৎ প্রকাশিত (১৯৩৭-১৯৭২) যাবতীয় ছোটগল্প বর্তমান সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত। এই গ্রন্থের কয়েকটি গল্প পৃথিবীর যে কোনো দেশের সাহিত্যের পক্ষেই গৌরবজনক বলে বিবেচিত হবে। মূল্য ১০-০০

আমার কথা ও অন্যান্য রচনা ॥ বিনোদিনী দাসী

বঙ্গবঙ্গমকের সর্বকালের এক শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর আত্মকথা হিসেবেই নয়, অসামান্য লিপিকৌশলের কারণেও সাহিত্যের ইতিহাসে এ বই বিশিষ্ট স্থান করে নিয়েছে। এই আশ্চর্য গ্রন্থটিকে বহু পরিশ্রমে অবলুপ্তির করণ থেকে উদ্ধার করে বঙ্গীয় পাঠকের হাতে লগ্নে উপহার দিয়েছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও নির্মালা আচার্য। প্রাসঙ্গিক বহু তথ্য ও চিত্রাবলি সহ। মূল্য ৭'০০

ঠগীকাহিনী ॥ ফিলিপ মেডোস টেলর

কর্মেল মেডোস টেলর রচিত *Confessions of a Thug* গ্রন্থটি ইংরেজি ভাষায় চিরায়ত সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করেছে। ১৮৩৯ সালে প্রথম প্রকাশের পর থেকে আজ পর্যন্ত এ বই অসংখ্য সংস্করণে লক্ষ লক্ষ পাঠকের মনোহরণ করে আসছে। ঘটনাক্রমে মেডোস টেলর সাহেব ঠগদলের শাসক সংস্পর্শে এসেছিলেন। তাঁর সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই বর্তমান গ্রন্থটি লুখাত 'ঠগী আমির আলির আত্মকথা' হিসেবে বিবৃত হয়েছে। বোম্বাকর সাহিত্যে ধারা পছন্দ করেন, তাঁদের কাছে এ বইয়ের জুড়ি মেলা ভার। মূল্য ১৫'০০

দেশদ্রোহী ॥ অসীম রায়

সমকালীন বাংলা সাহিত্যে অসীম রায় একটি সম্মানিত নাম। অসীম রায় বহুগ্রন্থ লেখক নন—কিন্তু তৎসবেরও তাঁর প্রতিটি রচনা সম্পর্কে চিহ্নান্বিত পাঠকমাত্রেই অপরিমীম আগ্রহ। 'দেশদ্রোহী' উপন্যাসের পটভূমিকা ১৯৬৫-৬ ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ। দেশবিভাগে বাঙালী সাহিত্যিকের প্রতিবাদ নেই, 'দেশদ্রোহী' প্রকাশের পর সে অভিযোগ আর টেকে না। মূল্য ৩'৫০

বিআক্কার রাজা ॥ তরু দত্ত। অহুবাদ : পল্লব সেনগুপ্ত

প্রতিভাময়ী বাঙালী লেখিকা তরু দত্ত রচিত ইংরেজি উপন্যাসের স্বচ্ছ বাংলা অহুবাদ। মূল্য ৩'০০

বঙ্গীয় লোকশিল্প-সংগ্রহ : দেশে ও বিদেশে

বাংলার লোকশিল্প ভারতে ও ভারতের বাইরে বহু সংগ্রহশালার রক্ষিত হয়েছে। সেই সব সংগ্রহশালার একটি সংক্ষিপ্ত স্বচর্চা নির্ভরযোগ্য পরিচয়-পত্র হিসেবেই বর্তমান পুস্তিকাটি রচিত। মূল্য ১'০০

অন্তঃ বই

অমৃতকলী যাত্রা ॥ কমলকুমার মজুমদার । মূল্য ৫'৫০

গড় চন্দ্রকেতুর কথা ॥ মূল্য ৬'৫০

ত্রিপুরার মন্দির ॥ কান্তিক লাহিড়ী ॥ মূল্য ৩'০০

বঙ্গীয় শিষ্যধারা ॥ কমলকুমার মজুমদার । মূল্য ৪'০০

বঙ্গীয় গ্রন্থচিত্রণ ॥ কমলকুমার মজুমদার । মূল্য ৪'০০

রামকৃষ্ণদেব : জীবন ও বাণী ॥ ফ্রিডরিশ্ মাক্সমুলার । মূল্য ৫'০০

উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যে বিজ্ঞোহী

ভারতের চিত্রকল্প ॥ পরব সেনগুপ্ত । মূল্য ৪'০০

কলিকাতার কথা ॥ শ্রমবন্দ্য মল্লিক । ২ খণ্ড । মূল্য ৩০'০০

রবীন্দ্রনাথ ও সঙ্গীতিকল্প ॥ জগদীশ ভট্টাচার্য । মূল্য ১০'০০

Dessins inspiré de Ramproshad ॥ নীরদ মজুমদার । মূল্য ২২'৫০

ভারতের শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ইত্যাদি
সম্পর্কিত যে-কোনো ছন্দিত বইয়ের প্রয়োজন
হলে স্ববর্ণবেধায় ছন্দ্রাপা-গ্রন্থ-বিভাগে
যোগাযোগ করতে অহুযোগ করি । আপনাকে
সাহায্য করতে আমরা সর্বদাই প্রস্তুত ।

সূক্ষ্ম কারুকার্য সমন্বিত ত্রিপুরার
বিখ্যাত কারুশিল্পের জিনিসগুলো
ঘর সাজাবার এবং উৎসবে উপহার
দেওয়ার পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী।

ত্রিপুরা সরকারী বিক্রয়-কেন্দ্র

৫৮/বি চৌরঙ্গী রোড

কলকাতা ১৬

। ত্রিপুরা শিল্প অধিকার থেকে প্রচারিত ৭

শারদীয়া অতিনন্দন ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই

যুগালিনী বিড়ি ম্যানুফ্যাকচারিং
কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড

হেড অফিস

অরুণাবাদ ॥ মুর্শিদাবাদ

প্রস্তুতকারক

দাম বিড়ি • গণেশ বিড়ি • যুগান্তর বিড়ি

ঘড়ি বিড়ি

ধূমপানে অস্বীকার

With Compliments of

PRECISION BEARINGS INDIA LIMITED

Manufacturers of 'NORMA' Ball & Roller Bearings
COMMERCE HOUSE, 2nd FLOOR

**2, Ganesh Chandra Avenue,
Calcutta-13.**

Phone : 23-3421
Gram : 'PREBEARIND' Calcutta

Registered Office :
**'NIRMAL' 14th Floor,
Backbay Reclamation,
Nariman Point, Bombay 1.**

WHAT MAKES A BANK DIFFERENT ?

**Friendliness
prompt attention
and efficient service**

It is the friendly personal attention given to your problems that will convince you why banking with us is worthwhile. However small may be your deposit, our full range of prompt and different services is available to you.

A WELCOME AWAITS YOU AT **THE CHARTERED BANK**

(Incorporated in England by Royal Charter, 1853)

Where service is taken into account

- 4, Netaji Subhas Road, Calcutta-1
- 14, Netaji Subhas Road, Calcutta-1
- 31, Chowringhee Road, Calcutta-16
- 208, Rashbehari Avenue, Gariahat, Calcutta-29 (with Safe Deposit Locker facilities)
- 6, Vivekananda Road, Jorasanko, Calcutta-7 (with Safe Deposit Locker facilities)
- 10, Nirmal Chunder Street, Bowbazar, Calcutta-12
- 21/A, R. G. Kar Road, Shyambazar, Calcutta-4
- 67, Cossipore Road, Calcutta-36 (with Safe Deposit Locker facilities)

Interest on Savings Account
4% p. a.

Interest on Term Deposits -
Please enquire at any of
our offices.

Income from investments upto
Rs. 3000 - in aggregate -
Income Tax Free.

Interest Receipts upto any
amount - *No deduction of*
Tax at source.

শারদীয় অভিনন্দন জানাই

কালচারাল এন্টারপ্রাইজার্স করপোরেশন

পি ৬৩ স্বন্দরীমোহন অ্যাভিনিউ

কলিকাতা ১৪

With Compliments

SHIVMONI & CO.

29 STRAND ROAD

CALCUTT 1

With Best Compliments

FARM EQUIPMENT AND CHEMICALS SUPPLIES SYNDICATE

33, Chittaranjan Avenue
Calcutta 12

To be published soon

G. V. Plekhanov

THE ROLE OF THE INDIVIDUAL IN HISTORY

Edited by

Bijan Bihari Purakayastha

Amritava Banerji

Price Rs. 2.00 only

Published by

PRAGATI PRAKASANI

Available at

National Book Agency (Pvt.) Ltd.
12, Bankim Chatterjee Street, Calcutta 12

With Compliments From :

M. L. Bose & Co. Pvt. Ltd.

61 Park Street

Calcutta 16

Telephone : 24-0375



সাহিত্য ও সংস্কৃতিবিষয়ক বিনামূলিক পত্রিকা।

প্রথম বর্ষ : বই সংখ্যা : সার্বভৌম ১০০০ টি পত্র

প্রবন্ধ

তিতুমীরের ধর্ম এবং বিদ্রোহ : বিনয় ঘোষ ১

মাকদীয়া শিল্পের বিষয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ : নিত্যাশ্রয় ঘোষ ৩৩

গণনাট্য আন্দোলন ও লোকসংগীত : হেমাজ বিশ্বাস ৪৪

একটি প্রবন্ধের পর : অশোক মিত্র ৯৩

গল্প

নদীতীরে : সুবীল সঙ্গোপাধ্যায় ৭১

চিত্রনাট্য

অশনি সংকেত : সত্যজিৎ রায় ৭৯

কবিতা

শম্ভু ঘোষ ১৩৬ শক্তি চট্টোপাধ্যায় ১৩৬ তারাপদ রায় ১৩৭

নোকনাথ ভট্টাচার্য ১৩৮ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ১৩৯

নবনীতা বেব সেন ১৪০ দিব্যেন্দু পালিত ১৪১

শান্তিকুমার ঘোষ ১৪১ পার্থনারবি চৌধুরী ১৪২

কদ্রিহীন আগার ১৪৩ কবিরাজ উসমান ১৪৪

কাজল চৌধুরী ১৪৪ সত্যজিৎ রায় ১৪৫

উত্তরীণ চট্টোপাধ্যায় ১৪৬ শংকর চট্টোপাধ্যায় ১৪৭

রত্নেশ্বর হাজরা ১৪৮ পবিত্র স্বেচছাচাধ্যায় ১৪৯

শিবশঙ্কু পাল ১৪৮

ক্রেতৃপত্র

বজ্রীয় রক্তাক্ত : বোমবেশ মুক্তকী ১

প্রবন্ধপট : সত্যজিৎ রায়

সম্পাদক : সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও নির্মাণা আচার্য

কার্যালয় : ৭০ মহাত্মা গান্ধি রোড : কলকাতা ৯



তিতুমীরের ধর্ম এবং বিদ্রোহ

১৮২১ সালের বঙ্গবঙ্গ।

জাহ্নসারি ১৮। আলবিদ্যন নামক জাহাজে আরোহণপূর্বক শ্রীযুক্ত বাবু রামমোহন রায় কেপে পহুছেন।

ছন্দ ৫। সংপ্রতিকার হিন্দু কালেক্টর ছাত্র শ্রীযুক্ত বাবু রুকমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত ইংরেজী ভাষায় ইনকোয়েরর নামে প্রথম সংখ্যক সম্বাদপত্র এই সম্বাদে আমরা প্রাপ্ত হইলাম। এই অল্পময় বিজ্ঞালয়েতে যে উদ্দৃশ্য শুভ ফল জন্মিতোছে তাহাতে আমরা অতিশুভে চিত্ত হইলাম।

ছন্দ ২৭। বঙ্গদেশে অঙ্গনাগণের বঙ্গভাষা লিখন পঠনের প্রসঙ্গ হইয়াছে তৎসম্বন্ধিত-মতে কিকিৎ লিগিভেতি সঙ্গতাসঙ্গত বিবেচক মহাশয়েরা বিবেচনা করিবেন। শ্রী-লোকের লেখাপড়া করাওণের প্রয়োজন কি। যদি বল তাহারদের লিখনপঠন শিক্ষাবিনা কিতাবৎ জ্ঞান কি তাবৎ জ্ঞান জন্মিতে পারে না।

উত্তর। সে প্রকৃত বটে কিন্তু এমনি কোন পুংবজ্জিত দেশ বিশ্বনির্ধাতা নির্মাণ করেন নাই যে যেখানে পাটেরগিরি ও মুহুরিগিরি ও নাজীরী ও জমীদারী ও ব্রহ্মদারী ও আমীরী নারীবিনা সম্পন্ন না হওনের সম্ভাবনা হয়।

সেপ্টেম্বর ৩০। বাবু মাধবচন্দ্র মল্লিক কলিকাতার ইংলিশ সন্ধানপত্রে প্রকাশ করিয়া লেখেন যে তিনি ও তাহার মিত্রেরা হিন্দু ধর্মে অত্যন্ত অসম্মত।

অক্টোবর ১৫। অপর রামমোহন রায় কলোনিজেশিয়ানের পক্ষ ইহাও এদেশে সেদেশে বিখ্যাত আছে তাহার বাহ্যে কোন প্রকারে এ প্রদেশে কলনাইজ হয় তন্নিমিত্ত তদ্রতাবলম্বী শ্রীকালীনাথ রায় প্রভৃতি সতীকেষি কএক জনকে প্রবৃত্তি লওয়া-ইয়া কলোনিজেশিয়ানের পক্ষ আরজীতে স্বাক্ষর করাইয়াছিলেন কিন্তু হিন্দুযাজের অভিসার নহে যে এদেশে ইংরেজ লোক আসিয়া চাববাস করে এবং তালুকদার হয়। তাহাতে যে দোষ তাহা কলোনিজেশিয়ানের বিপক্ষ আরজীতে বিশেষরূপে বর্ণনা করিয়া বিলাত পাঠান গিয়াছে। অতএব তিনি কোন প্রকারেই এতদেবীয় সাধারণের উপকারক নন। কতচিৎ নগরবাসি দর্পণ পাঠকত্ব।

নবেম্বর ১১। তিতুমীরনামক এক ব্যক্তির আত্মক্রমে কতক মুসলমান যশোহর ও কুষ্মানগর ও কলিকাতার সন্নিকটে কয়েক রাজবিদ্রোহি কণ্ঠ আরম্ভ করে। তাহারা আপনারা মৌলবী নামে খ্যাত হয় এবং তাহাদের অভিপ্রায় যে কেবল লুণ্ঠপাঠ করে এমনত বোধ হইল। ঐ তিতুমীর সৈয়দ আহম্মদের শিষ্য এমনত রাষ্ট্র আছে ঐ সৈয়দ আহম্মদ প্রীত রণজিৎ সিংহের দেশে উৎপাতকরণের উত্তোগে হত হয়।

নভেম্বর ২৭। বারাকপুর হইতে এক রেজিমেন্ট পদাতিক এবং কলিকাতা ও দমদমা হইতে কতক অস্বারূঢ় তাহারদের প্রাতিফুলো প্রেরিত হয়। তিতুমীর ও তাহার অনুচর ৮০।২০ লোক হত এবং ২৫০ লোক ধৃত হইয়া কলিকাতায় প্রেরিত হয়।

ডিসেম্বর ১০। কথিত আছে যে উক্ত বাবু (রায়মোহন রায়—বি) যেরূপ লোকের-দিগকে বাধ্য করিতেছেন তদ্ব্যতীত কোর্ট অফ ডায়েরেক্টর্স সাহেবেরদের উদ্দেশ্যে জন্মিয়াছে এবং দিল্লীর বাদশাহ যে এমনত উত্তম ব্যক্তিকে উকীলবরূপ নিযুক্ত করিয়াছেন ইহাতে ঐ বাদশাহের সৌভাগ্য সকলেই জ্ঞান করিতেছেন। অতএব কলিকাতায় কতক এতদ্বন্দ্বীয় লোকেরদের আশা মিথ্যা জ্ঞান করিয়া আমরা সংপ্রতি লিখিয়াছিলাম যে রায়মোহন রায় ইংলওদেশে পরমসম্মানে গৃহীত হইয়াছেন তাহা এই-রূপে প্রমাণ হইল।

‘তিতুমীর একজন ধর্মোন্মত্ত মুসলমান। তাহার বাস নদীয়া (বর্তমান যশোহর) জিলার গোবরডাকার সন্নিকটে বাহুড়িয়া থানার এলাকাধীন হারদরপুর গ্রামে ছিল।’ ভৌগোলিক বিবরণ ভুল হলেও একথা লিখেছেন শশিভূষণ বিদ্যালংকার তাঁর ‘জীবনী-কোষ’ গ্রন্থে (১৩৪৮)। ‘কুশবীপ-কাহিনী’কার (১৩০৮) এই অঞ্চলের (তিতুমীরের বিদ্রোহাকাল প্রাচীন কুশবীপের অন্তর্গত) মুসলমানদের বিবরণ প্রসঙ্গে তিতুমীরের কথা উল্লেখ করেছেন: ‘মুসলমান আতি। ইহাদের মধ্যে কয়েক ঘর পাঠান বংশীয় ব্যতীত অপর সকলেই বাঙ্গালী। অধিবাসিগণের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। সামাজিক অবস্থানে ইহাদের অবস্থা তাদৃশ উন্নত নহে। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ সামান্য তালুকদার ও ব্যবসায়ী। কিন্তু হিন্দুগণের অপেক্ষা মুসলমানগণের অবস্থা অত্যন্ত হীন। এতদ্ব্যতীত মুসলমানের সংখ্যা অধিক হইবার কারণ এই যে, মোগল সাম্রাজ্যের পূর্বে, পাঠানেরা বলদর্পে অনেক হিন্দুকে মুসলমান করিয়াছিলেন; তাহাদের সন্তানসন্ততিগণ ক্রমশঃ বর্ধিত হইয়া, এই প্রদেশে সমধিক সঞ্চার করিয়াছে। এ অঞ্চলে মুসলমানগণের বসতিগুলি সম্প্রদায় দ্বৈধে বিভক্ত পাওয়া যায়, সেই সকলের মধ্যে ‘ফরাইজি’ বা ‘সরাই’ দল সর্বাধিক বিখ্যাত ও পরাক্রান্ত। কিন্তু ইহারাও সাধারণ কৃষিজীবীগণের জ্ঞান হ্রাসচালন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। প্রায় ৫০।৫৫ বৎসর গত হইল, তিতুমীরের নামক ইহাদের জনৈক দলপতি কতকগুলি সন্ন্যাসী একত্র করিয়া, চকিষপরণার অন্তর্গত নারিকেলবেড়ে নামক গ্রামে বিদ্রোহী হয় এবং অচিরেই ব্রিটিশ অধিবাসে ভয়ঙ্কর হইয়া প্রাণত্যাগ করে।’

কে এই বিদ্যালংকার-বণিত 'ধর্মোন্মত্ত মুসলমান' তিতুমীরা? কে এই কুশরীপ-কাহিনীকার-কথিত 'জনৈক দলপতি' যে 'নারিকেলখেড়ে নামক গ্রামে বিদ্রোহী হয় এবং অচিরে ত্রিটপ অধিবাণে ভস্মীভূত হইয়া প্রাণত্যাগ করে' ? মোলবী ফকির পীর পয়গম্বর ফরাঙ্গী ওয়াহবী সর্গার দহা বাদশাহ এবং ইংরেজ শাসকদের 'ডায়াবল Murderer, Marauder, Ruffian, Dacoit, Rebel, Bandit বলে কথিত অণু-কথিত এই তিতুমীরা নামক বিদ্রোহী কে, কেন তার বিদ্রোহ এবং কাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ? হিন্দুসাধারণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নামে এটা কি ধর্মীয় জিহাদ অথবা হিন্দু জমিদারদের বিরুদ্ধে শ্রেণীবিশেষের পরিবর্তে সাম্প্রদায়িক বিশেষের প্রকাশ অথবা হিন্দু-মুসলমান নিবিশেষে জমিদার-মহাজনদের বিরুদ্ধে এবং দোচ্ছাত্তারী নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে এবং তাদের প্রতিপালক ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে নির্বাতিতদের নির্মম আক্রোশের বিক্ষোভ অথবা কেবল লুটতরাজ খুনখারাবি রাহাজানি দস্যবৃত্তির উচ্ছ্বল উদ্গিরণ!

হয়ত এই উপাদানগুলির প্রত্যেকটি তিতুমীরের বিদ্রোহের মধ্যে কমবেশি মিলেমিশে ছিল, কিন্তু তাদের যারিক সংমিশ্রণ অথবা গাণিতিক ধোংগলই বিদ্রোহ নয়, তার অতিরিক্ত কিছু, দুই আর দুইয়ে পাচের মতো। শহর কলকাতার ভোপক্ষনির সীমানার মধ্যে প্রায় অবস্থিত বলা চলে তিতুমীরের বিদ্রোহাকাল, অথচ কলকাতার নাগরিকজীবনে তার কোনো প্রতিধ্বনি শোনা যায় নি, যেমন তার আগে চোয়াড়বিদ্রোহের সময় শোনা যায় নি, যখন রাজা রামমোহন রায় ও তাঁর অহুগামীদের মতো সমাজসংস্কারের সন্ধান্ত প্রবক্তারা কলকাতা শহরেই বসবাস করছিলেন এবং তজ্জন্ত তাঁদের থানাপিনা-ভোজসহ ইংরেজের অভ্যুজ্জাজিত সংস্কারকর্মে উৎসাহ আদৌ মন্দীভূত হয় নি। কিন্তু পূর্বোদ্যুত বর্ষফলে দেখা যায়, তিতুমীরের বিদ্রোহকালে রামমোহন রায় আলবিয়ন নামক জাহাজে ইংলণ্ড পৌঁছেছেন এবং দেখানো তিনি এদেশীয় নিন্দুকদের নির্বাক করে 'পরমসমাদরে গৃহীত' হয়েছেন। তখন ভিরোজিয়ানদের যুগ। অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের মতো বিশ্বসভা ও বিতর্কসভায় কলকাতা শহর গম্ভূম করছে, বিতর্কসভায় বাক্যের সঙ্গে বাক্যের চক্ৰমকির্ঘর্ষণে আগুনের কুল্কি উড়ছে, মধ্যশিক্ষিত তরুণ সিংহ-শাবকরা ঘন ঘন গর্জন করছেন 'Down with Hinduism! Down with Orthodoxy!' পাণ্ডি ডাকের ভাষায় 'Indeed, the spirit of discussion became a perfect mania, and its manifestation, both in frequency and variety, were carried to a prodigious excess'. (তুলনীয়, অধ্যকার 'সেমিনার' প্রাবল্য)। Age of Reason-এর ঐতিহ্য প্রবেশের প্রতিক্রিয়ায় বাক্যের কনংকার যে সমস্ত বিশ্বসভায় শোনা যেত, তিতুমীরদের মতো লাওলা চাষীদের বিদ্রোহ (অথবা চোয়াড়দের মতো) সেখানে আলোচ্য বিষয়বস্তুর মর্যাদা লাভ করে নি। যেহেতু ইয়োরোপীয় এলিটের তত্তাবধানে তখন 'নেটিভ এলিটের' মাহুকাচকারিঃ আরম্ভ হয়েছে এবং বাছা বাছা সব তাক্সা তাক্সা তরুণদের গুপ্ত লোহার দাগ দিয়ে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে

দীক্ষা দেওয়া হচ্ছে, ব্রাহ্মণ্যব্রাহ্মণ তনয়দের মুখে হিউম-পেইনের বুলি তপ্ত খোলায় থেয়ে মতো ছুটেছে, এমন সব বুলি যা কঠিনালী থেকে বিনির্গত হবার পথে পাতের পাটিতে আঠার মতো লেগে থাকে, ছাড়তে চায় না। 'The European elite undertook to manufacture a native elite. They picked out promising adolescents; they branded them, as with a red-hot iron, with the principles of western culture; they stuffed their mouths full with high-sounding phrases, grand glutinous words that stuck to the teeth.' ('Preface' by Jean-Paul Sartre : Fanon's *The Wretched of the Earth*)।

যুক্তিবাদের যুগ এসেছে, পশ্চিম থেকে সাম্রাজ্যবাদী বণিকদের হানসও ও রাজনগের সঙ্গে, বিত্ত যুক্তিবাদ, ক্ষমতাবিবেকবঞ্জিত অভিনব যুক্তিবাদ, অতএব ঔপনিবেশিক নেটিভ এলিটগোষ্টির কঠে তার অভিনবমনের শঙ্খধ্বনি এবং একটা অত্যাচার্য আত্মচৈতন্যহীন বিস্মল তদুপত্যাব। নবযুগের নব্যজ্ঞানের পণ্ডিতেরাও হতবাক। তার মধ্যে চোয়াড়-বিত্রোহ অথবা তিতুমীরের বিদ্রোহ অথবা গাঁওতালবিদ্রোহের মতো অশিক্ষিত অসভ্য অযুক্তিবাদী তুচ্ছতাকজাহ্নমময়বিধাদী ধর্মভীরু চাষীদের বিদ্রোহ, বিশেষ করে বাক্য-বিতর্কবহির্ভূত 'সমগ্র' বিদ্রোহের স্বভাবতই কোনো স্থান ছিল না, মর্যাদা ছিল না, গুরুত্ব ছিল না, যেহেতু অশিক্ষিত অত্যাচারিত চাষী 'যুক্তি' এবং স্বশিক্ষিত সম্রাজ্ঞ এলিটের 'যুক্তি'র মধ্যে পার্থক্য আশ্রয়মানজমিন, যদিও সবই 'যুক্তি' এবং প্রসঙ্গত ফরাসি নৃবিজ্ঞানী লেভি-স্ত্রাউসের *The Savage Mind*-এর কথা মনে হয়। আদিম অসভ্য মানুষের ধ্যানধারণা চিন্তাভাবনা আচারআচরণ ইত্যাদির একটা 'যুক্তি' আছে, যেমন আধুনিক হুমতা মানুষের সর্ববিধ অকাজকুকাজের একটা 'যুক্তি' আছে, যেমন অত্যাধিকসভ্য আমেরিকান শাসকদের ভিয়েতনাম-কাম্বোডিয়ায় নিরীহ মানুষের উপর হাজার হাজার টন বোমাবর্ষণের একটা 'যুক্তি' আছে, যেমন শত শত বিদ্রোহী তরুণ যুবকদের বিনা বিচারে যে কোনো 'গণতান্ত্রিক' অজুহাতে হত্যা করার একটা 'যুক্তি' আছে, কিন্তু কেবল এই কথাই মনে হয় যে যখন এবলুশ্যনাল এক যুক্তিবাদের স্বর্ণযুগে আমরা বাস করছি তখন কার যুক্তি বা কোন্ যুক্তি ভাল বা মন্দ, প্রেম বা হেয় তার বিচার করবে কোন্ যুক্তিবাদী! অতএব পাশ্চাত্য যুক্তিবাদের যুগে যদিও ১৮৩০-৩১ সালে অসংখ্য বিশ্বাসভা-বিতর্কসভার বিকাশ হয়েছিল অস্বদেশীয় কলকাতা শহরে এবং যত্বেপি সর্বত্র 'bigotry, high-handed tyranny, superstition and Hindu orthodoxy was denounced in no measured terms' এবং যত্বেপি তিতুমীরের বিদ্রোহাঙ্কল কলকাতা শহরের ভোপধ্বনির সীমানার মধ্যে অবস্থিত ছিল, অর্থাৎ পূর্বের বশিরহাট-কলিক থানা এবং বর্তমানে বাহুড়িয়া থানার অন্তর্গত অঞ্চল, তথাপি এই বিদ্রোহ আমাদের বসুদেবে ঘটেছিল কি না তার কোনো সংবাদ কলকাতা শহরের নব্যশিক্ষিতদের কোনো বিতর্কসভার আলোচিত বিষয়বিবরণীতে পাওয়া যায়

না। অঞ্চল নারকেলবেড়িয়া গ্রামে সম্প্রতি একটি বিচিত্র দৃশ্য দেখে চমৎকৃত হলাম। রাষ্ট্রনৈতিক বাণিজ্যের মূলধন হয়েছেন তিতুমীর, তাঁর একটি নিমেষের কুৎসিত শহীদ-তত্ত্ব স্থাপিত হয়েছে এবং নিরিপলি নারকেলবেড়িয়ায় ভাঙা মসজিদের ভিটের পাশে কয়েকটি শাসক/ভবেষ্টিত একটি স্থানে মৈজুদ্দিন বিশ্বাসের বংশধরদের (যেমন মহম্মদ দারবাক বিশ্বাসদের) গৃহের সরিকটে দরগাহের কোণে নিমেষপ্রান্তারের তুলে তিতুমীর অমরত্ব এবং তাঁর বীরত্বের সন্ধান লাভ করেছেন। অনেকের ধারণা (এবং সেই ধারণার উপরেই তত্ত্ব) এই যে কামানের গোলায় ছিন্নবিচ্ছিন্ন তিতুমীরের দেহ স্থানীয় চাষীরা সমাধি দিচ্ছেন, যদিও সরকারী দলিলপত্রে প্রকাশ যে যুদ্ধে নিহত তিতুমীর ও তাঁর সহযোগীদের, আতঙ্কিত ইংরেজ শাসকদের নির্দেশে, গোপনে অগ্নিসংস্করণে ভস্মীকৃত করা হয়েছিল, যাতে না তাঁদের মৃতদেহের দৃশ্য বিদ্রোহীদের উত্তেজিত করতে পারে অথবা তাঁরা বিদ্রোহীদের দ্বারা বীর শহীদের যোগ্য মর্যাদায় সমাধি দিতে পারেন। এ সংবাদ কোনোদিন প্রকাশ করা হয় নি, ১৮৩১ সালে অথবা তার পরে কোনোদিন।

মুসলমানদের দাড়ি আর মসজিদ, হিন্দুদের গুরু আর মন্দির, মোল্লা আর পুরুত, তক্তির-মোলদী আর ডাক্ষণ-কায়স্থ, লুন্ডি আর পৈতে, এই প্রকার কতকগুলি ধর্মীয় প্রতীকের অকস্মাৎ মূণ্ডামূণ্ডি সংঘাত বলে মনে হয় তিতুমীরের বিদ্রোহ। অন্তত মহাক্ষেত্রখানার দলিলপত্রাদি দেখলে হঠাৎ তাই মনে হয়, যেমন তদানীন্তন ইংরেজ রাজ্যে নিচা-বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারি টমাসনের কাছে লিখিত বারাসাতের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজান্ডার, নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেট দ্বিথ, বিভাগীয় কমিশনার বারওয়েল, এঁদের চিঠিপত্রিপোর্ট ইত্যাদি। অতঃপর কিয়ৎকণ সাহেবলোকদের চিঠিপত্রাদির ভাষার মর্মস্থলে দৃষ্টিনিবন্ধ করলে দেখা যায় যে দাড়িগুরুমসজিদমন্দিরের বহুপ্রচারিত ধর্মীয় প্রতীকী সংঘর্ষের কৃৎসিতকার ভিতর দিয়ে নিসার আলি ওরফে তিতু মিঞা-তিতুমীর নামক 'গুয়াহাটী' আশরাফুগামী 'ধর্মোন্মত্ত' মুসলমানটির বিদ্রোহের একটা প্যাটার্ন, একটা আদল, ধীরে ধীরে রেখায়িত হয়ে উঠছে এবং সেটা আর যাই হোক ইদানীংকার শোষণকেন্দ্রীকরণোদ্ভূত অতিবীভৎস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহান্ধামা নয়, কদাচ নয়। হিন্দু-মুসলমানের ধর্মীয় বিবেকের বিধ অথবা দাড়িগুরু কোনোপ্রকারের বিরোধ সংঘর্ষ তার মধ্যে ছিল না এমন কথা কোনো ঐতিহাসিক অস্বীকার করবেন বলে মনে হয় না। কিন্তু ঐতিহাসিক সত্যের খাতিরে একথাও স্বীকার করতে হবে যে এই সাম্প্রদায়িক বিবেকের ইচ্ছন প্রধানত যুগিয়েছেন বশিরহাট-বারাসাত অঞ্চলের শোষণকেন্দ্রীক, দ্বারা অধিকাংশই হিন্দু জমিদার এবং তাঁদের হত্যাকর্তৃত্বলা স্টর্ম আর ডেভিসের মতো দোর্দণ্ডপ্রতাপ ইংরেজ নীচকরেরা, দ্বারা আবার স্থানীয় ইংরেজ শাসকদের রাজদণ্ড-ভিত্তি। অতএব সর্বোপরি মহাক্ষেত্রখানার দলিলপত্রাদি দেখা যাক।

গোড়া থেকে শেষের দিক নয়, শেষ থেকে গোড়ার দিকে। এই বিশেষ রীতির বিশেষ

তাৎপর্য হয়ত শেষে পরিষ্কার হতে পারে। নারকেলবেড়িয়ার বাণেশর কেন্দ্রা খতম। তিতুমীর ও তাঁর সহস্রাধারীরা অনেকে নিহত, অনেকে আহত, অনেকে গৃহ ও বন্দী, স্বন্দরবনের পথে আলিপুর ছেলে প্রেরিত, বাকি সকলে ছত্রভঙ্গ অথবা। কমিশনার বারওয়েল বিচারবিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারি টমাসনকে লিখছেন (২৮ নভেম্বর ১৮৩১) : 'বারাসাত জেলায় সম্প্রতি যে বিদ্রোহ হয়ে গেল তার মূল উৎস হল মুসলমানদের মধ্যে একটা বিশেষ গোষ্ঠীর ধর্মোন্মত্ততা এবং সেই উন্মত্ততা কৃষ্ণদেব রায় নামে স্থানীয় একজন জমিদারের অত্যাচারের ফলে তাঁরই জমিদারীতে সর্বপ্রথম বিদ্রোহের রূপ ধারণ করে। বিদ্রোহীদের অসন্তোষের কারণ স্থানীয় অস্থায়ী ভয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট সঠিকভাবে তদন্ত করেন নি এবং বশিরহাট থানার একটি অগ্রদূতের দুর্ঘটনার সংবাদ পেয়েও তিনি উক্ত জমিদারের খেজাচারিতার প্রতিকার করতে অথবা বিক্ষুব্ধ সাধারণের আশঙ্কা নিবারণে অগ্রসর হন নি। তৎসব্ধেও বার। অত্যাচারিত নির্ধাত্ত বলে তাদের মনে করে তারা উচ্চ-আদালতে আশ্রয় করতে সম্মত ছিল। কিন্তু তখন আমার এবং অধ্যক্ষ উকিল ও আইনআদালতের কর্মচারীদের অল্পপাঠিতির জন্ত (হিন্দু পূজাপার্বণের ছুটি উপলক্ষে) তাদের পক্ষে তা সম্ভব হইল না এবং অবশেষে তারা বাধ্য হয়ে নিজেরাই অত্যাচারের প্রতিকার করবে স্থির করল, শাসন শৃঙ্খলার সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করতে উদ্যত হল।'

একটি বিস্তারিত বিবরণ (৫৬ অক্সফোর্ড সংবলিত) ভয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজান্ডার পেশ করেন বারওয়েলের কাছে (বারাসাত, ২৫ নভেম্বর ১৮৩১), উদ্বেগ পানিকটা নিজের দোষকাল্পন করা। বিবরণের মর্ম এই : '২৭ জুন ১৮৩১ বশিরহাট থানার মুহুরি সাহেবকে জানান যে মোজা নগর সরফরাঙ্গপুরের (পূজা) পরলোকগত তালুকদার নবগোবিন্দ রায়ের নায়েব রামধন সরকার থানায় একটি এজাহার দিয়েছেন এই মর্মে যে বিশতিরিশ জন লোক স্থানীয় এক প্রজার গৃহে জমায়েত হয়েছে দেখে তিনি তিনজন পেয়াদা পাঠান তাদের অভিসন্ধি জানার জন্ত, কিন্তু তারা পেয়াদার সঙ্গে বড়ই দুর্ব্যবহার করে এবং একজন পেয়াদাকে ধরে বেধড়ক প্যাঁদানি দিয়ে বিদায় ক'রে দেয়। চৌকিদার ও অধ্যক্ষদের বিরুদ্ধে এবিষয়ে পরস্পরবিরোধী। দায়েম কারিগর থানায় এসে লিপ্য ক'রে বললে যে কৃষ্ণদেব রায় (নবগোবিন্দের পুত্র) মুসলমান প্রজাদের কাছ থেকে দাড়ির জন্ত আড়াই টাকা ক'রে ট্যাক্স আদায় করছেন এবং ট্যাক্স না দিলে জরিমানা ও নানারকমের অত্যাচার করছেন। পারিয়াল কারিগর এসে বললে যে তালুকদার কৃষ্ণদেব রায় তিনশো লাঠিয়াল নিয়ে এসে তাদের মসজিদে আগুন ধরিয়ে দেন। তারাগনিয়ায় যে বরকন্দাজ ছিল সে এই ঘটনার আগেই সরে পড়ে। ১৫ জুলাই দায়েম কারিগর অভিযোগ করে যে কৃষ্ণদেব রায় দু-তিনশো ক'রে লাঠি-সড়কিতলোয়ারধারীদের নিয়ে গ্রামে গ্রামে যদৃচ্ছা জবরদস্তি ক'রে দাড়ির ট্যাক্স আদায় করছেন। কৃষ্ণদেব জানান যে সমস্ত অভিযোগ বিতর্কজাত ও ভিত্তিহীন। সন্দ্বীকান্ত বোম্ব, খুসল সিং, জ্ঞান মহম্মদ, খুসব গাজী (সকলে জমিদারের চাকর) কৃষ্ণদেবের পক্ষে এবং রহমতুল্লা, ইয়ার গাজী, মল্লিকটাদ কারিগর, দিলু কারিগর, দায়েম কারিগর,

কাদেরবন্দু কারিগর বিপক্ষে সাক্ষী দেয়। অতঃপর প্রায় সন্ধ্যায় রক্ষিৎসাব চলেতে থাকে ম্যাগিস্ট্রেটের কোর্টে, যেমন চলে থাকে। ২ সেপ্টেম্বর ম্যাগিস্ট্রেট সাহেব পরস্পরবিরোধী সাক্ষী ও বিবৃতিতে বিভ্রান্ত হয়ে দিকান্ত করেন যে বিবাদমান উভয়পক্ষের প্রত্যেককে পঞ্চাশ টাকার একটি বণ্টন দিয়ে স্থানীয় শাস্তিশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব নিতে হবে এবং নিজ এলাকা ছেড়ে অল্প কৌণাও যাওয়া চলবে না। পরে সাহেব তাদের বড় আদালতে আপীল করার অহুমতি দেন এবং কাদেরবন্দু কারিগর আপীল করবে জানায়।

অতঃপর সাহেব তাঁর স্থানীয় প্রতিবেদনে তিতুমীর ও তার নবাসপ্রদায় সম্বন্ধে একটি অহুমতি (৩৫নং) সন্নিবেশ করে বলেন : 'প্রসঙ্গত এখানে তিতুমীর সম্পর্কে কিছু বলা দরকার এবং আমি তার সম্বন্ধে যেটুকু তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছি তাই এখানে সংক্ষেপে নিবেদন করছি। তিতুমীর হল একটি নতুন মুসলমান ধর্মপ্রদায়ের পাণ্ডা ('Ring leader')। তার বয়স প্রায় পঞ্চাশ বছর (সাহেবের অহুমান সভ্য হলে তিতুমীরের বয়স হয় ১৭৮০-৮১ সালে)। বোল বছর তিতু কলকাতায় একজন কৃতিগীর ছিল, পরে একজন জমিদারের অধীনে সর্দারের চাকরি করে এবং এক দাঙ্গাহাঙ্গামায় জড়িত হয়ে কারাদণ্ড ভোগ করে। কারাদণ্ড হবার পর তিতু জমিদারের গোলামি ছেড়ে মজা যাত্রা করে, একজন রাজহুমায়ের ('Prince of Delhi') সঙ্গে। মজায় সৈয়দ আহমদ নামে এক 'প্রবন্ধকের' সঙ্গে (সাহেব 'impostor Syed Ahmed' বলেছেন) তার সাক্ষাৎ হয়। দেশে ফিরে আসার পর তিতুমীর কিছুদিন কলকাতায় থাকে, তারপর নারকেনলবেড়িয়ার কাছে হায়দারপুরে এসে তার নতুন ধর্মপ্রচারে মনোযোগী হয়। গত তিন-চার বছরের মধ্যে এই অঞ্চলে তিতু খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, তার জীবনযাত্রার ধারার অনেক পরিবর্তন হয়, কঠোর সংযত জীবন যাপন করতে থাকে এবং তার ধর্মদর্শন দীক্ষা দেওয়াই হয় তার প্রধান কাজ। পীরের পূজা করা, দরগাহ তৈরি করা, এসব আসল ইসলামধর্মবিরোধী, প্রকৃত মুসলমানের উচিত এ সমস্ত অভ্যাস বর্জন করা। এই ছিল তিতুর ধর্মপ্রচারের মূল কথা!'

এর বেশি তিতুমীরের পরিচয় প্রসঙ্গে সাহেব তার রিপোর্টে আর কিছু বলেন নি। তারপর পূর্বের ঘটনাক্রম অহুমতরণ করে লিখেছেন : '৩১ অক্টোবর ১৮৩১ তিনি বিশিরাট খানা থেকে একটি রিপোর্টে জানতে পারেন যে তিতুমীর তার দলের লোকজন নিয়ে কৃষ্ণদেবের তালুকে একটি গোহত্যা করার জন্য যাত্রা করেছে এই খবর পেয়ে দারোগা হুজুর বরকন্দাজ পাঠিয়েছেন। এদিকে গুরুপ্রসাদ চৌধুরী, কৃষ্ণদেব রায়, শিবচন্দ্র রায়, পঞ্চানন্দ রায়, এরাঁও তাঁকে এই খবরটি জানান। এর পর ১০ নভেম্বর পর্যন্ত আর কোনো খবর সাহেবের কাছে পৌঁছয় নি। খবর না পেয়ে সাহেবের ধারণা হয় যে দাঙ্গাহাঙ্গামার ঘটনা অতিরিক্ত। পরে শোনা যায় যে তিতুমীর প্রায় তিনশো লোক নিয়ে গোহত্যা করার পর হাঠখোলার বাজার লুট করেছে। দারোগা খবর পান যে প্রায় বাট-সত্তর জন লোক অস্থলপন্ন নিয়ে পথে ছুর বেড়াচ্ছে এবং তাঁকে খুন করার জন্য খুঁজছে। কাজেই কয়েকজন বরকন্দাজ নিয়ে দারোগা এদের জব্দ করতে পারবেন না বলে

সাহেবকে জানান। এদিকে শিখের (নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেট) কাছ থেকে সংবাদ আসে যে তিনি যখন হাতিয়ার পিঠে চড়ে সফরে বেরিয়েছিলেন তখন অন্তত চার-পাঁচশো লোক তাঁকে অক্রমণ করে এবং তাঁর ভৃত্য নবাবউদ্দিন গুরুতর আহত হয়। নবাবউদ্দিনের এজাহারে প্রকাশ যে গোলাম মাহমুদ, দায়েম কারিগর, করিম কারিগর, বাবুয়া কারিগর, কবির কারিগরের নেতৃত্বে একদল সশস্ত্র বিদ্রোহী গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেদিন গোবুল ভট্টাচার্য নামে এক ব্রাহ্মণকে, স্থানের পথে ধরে তারা দোহম ওয়ার দিয়েছে এবং গোলাম মাহমুদ বামুনকে মুসলমান করবে বলে শালিয়ে, তাকে বিবস্ত্র করে, পথের ধারে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। মহেশ নোবের একটি গুরু ধরে নিয়ে গিয়ে তারা হত্যা করেছে। হাটখোলার ব্যবসায়ী ও দোকানদার লক্ষণ দেব, মোহন সাহা, গোলোক সাহা ও আরও অনেকে বলে যে গুরুটিকে একটি মন্দিরের সামনে হত্যা করে সেই মন্দিরের গায়ে গোরস্ত লেপন করা হয়। কুজনগর জেলায় (নদীয়া) একটি গ্রামে দেবনাথ রায়কে তারা খুন করে। এর পর কলিকাতার দারোগার রিপোর্ট, নীলকর স্টর্ম সাহেবের রিপোর্ট, নীলকর ডেভিসের কর্তৃত্বাধীন সাহেবের রিপোর্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পৌঁছয়। তিফুরীর সশস্ত্র বিদ্রোহী বাহিনী মথকে কেবল আলেকজান্ডার নন, স্থিথ, পারওয়েল সকলে বিচলিত হন, কলকাতার বড়সাহেবদের কাছে আবেদন করা হয় দৈন্য পাঠানোর জন্য। কমিশনারের নির্দেশে আলেকজান্ডার ১৫ নভেম্বর সোমবার সন্ধ্যায় বিশিহাট খানায় যান। পরদিন ১৬ নভেম্বর মঙ্গলবার ভোরে একজন হাবিলদার, একজন জমাদার এবং কুড়িজন সেনাই নিয়ে রওয়ানা হয়ে বেলা নটার সময় তিনি বাহুড়িয়া আসেন। বাহুড়িয়া থেকে নারকেলবেড়িয়া তিন কোশ দূর। দৃষ্টকারীরা এইখানে আজ্ঞা গেড়েছে বলে তিনি খবর পান। সেনাইদের সঙ্গে বিশিহাট খানার দারোগা চৌকিদার বরকন্দাজদের নিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বেলা বারোটার সময় নারকেলবেড়িয়া উপস্থিত হন। প্রায় ৫০০/৬০০ লোকের জমাত হয়েছিল সেনানে, সাহেবের অহুমান। তারা সাহেব ও সেনাইসামন্ত মধ্যে একপাও পিছোতে চায় না। কামানবন্দুক গোলাগুলি ভরার জন্য জমাদারকে হুকুম দেওয়া হয়। সাহেবী ভক্তিতে ম্যাজিস্ট্রেট একবার জমাতের দিকে কিছু বলবার উদ্দেশ্যে কয়েক পা এগিয়ে যান। তৎক্ষণাত সাহেবের উপর প্রবল ইটপাটকেল বর্ষণ হয়। সাহেব পিছোতে থাকেন, জমাত এগোতে থাকে। জমাদারকে গোলাবর্ষণের হুকুম দেওয়া হয়। কিন্তু 'nobody fell or appeared wounded in the slightest degree.' (সাহেবের এই উক্তি লক্ষণীয়। 'গুলি থা ভালোগা' ধ্বনি ও কফিরী ভেড়ির কথা মনে হয়)। তারপর সাহেব দেখেন জমাতের ডিঙার থেকে কে একজন তাঁর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে তলোয়ার ঘুরিয়ে এগিয়ে আসছে। হঠাৎ তখন তিনি পেছনে চেয়ে দেখেন তাঁর সেনাই-বরকন্দাজরা প্রাণের ভয়ে দৌড় দিচ্ছে ('every person on my side was running away') এবং নিজপায় হয়ে তিনিও পলাতকদের পশ্চাদ্ধাবন করতে থাকেন ('I also was obliged to run for my life')। খোলা তলোয়ার নিয়ে

বিত্রোহীরাও তাঁদের তাড়া করে। প্রায় পাঁচমাইল উর্ধ্বদিকে দৌড়বার পর সামনের একটি নালার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মীতরে সাহেব অপর পারে ওঠেন, সেখান থেকে পুনরায় দৌড়তে দৌড়তে বাহুড়িয়া পৌঁছন এবং সেখান থেকে নৌকো ক'রে বশির-চাটের কাছে বাগাণ্ডি (বা বাঘমুণ্ডি) গ্রামে উপস্থিত হন হৃৎকালেক। এ যাত্রা প্রাণে বেঁচে যান ম্যাক্সিমেল সাহেব। ১৫ নভেম্বর ১৮৩১, মঙ্গলবার।

অনপথে নৌকো ক'রে সন্দরবন দিয়ে কলকাতা বাওয়া স্থির করেন আলেকজান্ডার এবং অবিলম্বে তাঁর ব্যবস্থা ক'রে যাত্রা করেন। সাক্ষাতে সমস্ত ঘটনার বিবরণ বড়-সাহেবদের সেওয়া প্রয়োজন। ১৬ নভেম্বর বুধবার তিনি কলকাতায় পৌঁছন বেলা তিনটের সময়। কাউন্সিলের ডাইস-প্রেসিডেন্ট ও অধ্যক্ষ কর্তাদের তিতুমীরদের বিব্রোহনার্তা সবিত্তারে জানানো হয় এবং স্থির হয় যে অবিলম্বে মিলিটারি পার্শ্বাবার ব্যবস্থা করা হবে। মেজর স্টুট, লেফটেন্যান্ট শেক্সপীয়ার, ক্যাপটেন সাদারল্যাণ্ড গোলন্দাজ অধারোহী ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে বারাসাতের দিকে যাত্রা করেন। তাঁদের রসদাদির ব্যবহার জন্ত এবং পথঘাটব্রিঞ্জ ইত্যাদি ঠিক করার জন্ত আলেকজান্ডার আগেই রওয়ানা হয়ে যান।

১৮ নভেম্বর শুক্রবার ডোর চারটের সময় অধারোহীদের নিয়ে আলেকজান্ডার বাহুড়িয়া পৌঁছন বেলা আটটার সময়। তারপর ক্যাপটেন সাদারল্যাণ্ডকে নিয়ে নারকেলবেড়িয়ার পথে যাত্রা করেন। পথে বিব্রোহীদের সঙ্গে বিজির লড়াই হয়। সাদারল্যাণ্ড মেজর স্টুটকে লেপেন গোলন্দাজ সৈন্যদের পার্শ্বাবার জন্ত। গোলন্দাজ-বাহিনীর কমান্ডার লেফটেন্যান্ট শেক্সপীয়ারের কাছে দাঁড়িয়ে যখন আলেকজান্ডার কথা বলছিলেন তখন তাঁকে লক্ষ্য ক'রে বিব্রোহী একজন গোলা বর্ষণ করে এবং গোলাটি তাঁর কান ঘেঁষে চলে যায় ('an insurgent took deliberate aim at me and the Ball passed close to my ear')। সেই একই ব্যক্তি যে গোলাটি তাঁকে লক্ষ্য ক'রে ছাড়ে, সে ম্যাকান নামে একজন গোলন্দাজকে গুলি ক'রে মারে। এই ব্যক্তিটি হল তিতুমীর।

হৃৎকালেক পূর্বন্ত নারকেলবেড়িয়ায় এইভাবে লড়াই ক'রে তাঁরা স্বস্থানে ফিরে আসেন। ১৯ নভেম্বর শনিবার সকালে আবার সেনাদল নিয়ে তাঁরা নারকেলবেড়িয়া যান। সেইদিন সকালে সম্মুখলড়াইয়ে তিতুমীরের দলের পরাজয় হয়, তিতুমীর ও তাঁর প্রাণ পলাশজন সহযোগী নিহত হন এবং অনেকে আহত ধৃত ও বন্দী হন। সেইদিনই কমিশনার বারওয়েল সাহেবকে আলেকজান্ডার জানান যে নিহতদের মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেলা উচিত, বিশেষ ক'রে নিহতদের মধ্যে তিতুমীরও একজন যেহেতু, কারণ তা না হলে বিব্রোহীরা শহীদের সম্মানে তিতুমীরের দেহ সমাধি করবে ('I consider that the bodies of the dead should be burnt, particularly as their leader Titoo Meer is among them and they might take his body and bury him as a martyr.')। ২০ নভেম্বর রবিবার

আলেকজান্ডার নারকেলবেড়িয়ার বিধ্বস্ত বাঁশের কেল্লায় গিয়ে ধ্বংসপ্রাপ্তির মধ্যে ভরতল ক'রে খুঁজেছেন, এমন কোনো কাগজপত্র কিংবা ইশতেহার বা ফতোয়া পাওয়া যায় কিনা, তার মধ্যে ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে তিতুমীরের দলের কোনো ভয়ঙ্কর ইঙ্গিত আছে। বাঁশের কেল্লা তখন গুলিগোলায় আঙনে ভরষীকৃত, কাজেই তার মধ্যে কোনো কাগজপত্র কিংবা ফতোয়া ইশতেহার পাওয়া যায় নি। সেইদিন নিহতদের বাকি সমস্ত মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেলার হুকুম দেন আলেকজান্ডার, যেহেতু আগের দিন (১২ নভেম্বর ১৮৩১, যেদিনকার চূড়ান্ত লড়াইয়ে তিতুমীর পরাজিত ও নিহত হন) তিতুমীর ও অধ্যক্ষ বিজোহী নেতাদের মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে (‘I then gave orders for the burning of the remaining dead bodies, Titoo Meer and the other chief persons having been burnt the day before for fear of persons taking away their bodies.’)।

আলেকজান্ডারের প্রতিবেদনে ১৭ নভেম্বরের কোনো ঘটনা উল্লেখ করা হয় নি। নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেট শিখ সাহেব ঐ তারিখের একটি পত্রে বারাসাতের জয়েন্ট-ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজান্ডারকে লেখেন : ‘আজ বিকেল পাঁচটার সময় আমি ও ডেভিড অ্যান্ড্রু, চারজন ইংরেজ অ্যাগিস্ট্যাট আর কিছু অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বারঘরের নীলকুঠিতে গিয়ে-ছিলাম। আমাদের সঙ্গে ছিল এগারটি (?) হাতি এবং একদল পুলিশ ও বরকন্দা। তা ছাড়া স্থানীয় জমিদাররা সকলে কথা দেন যে তিতুমীরের দুর্বৃত্তদের সায়েস্তা করার কাজে তারা যথাসাধ্য আমাদের সাহায্য করবেন। আজ সকালে তিতুর দলের লোকেরা এগানকার ঈর্ষ সাহেবের নীলকুঠি আক্রমণ করে, কিছু জিনিস লুটপাট ক’রে নিয়ে যায়, বাকি সব লণ্ডও ক’রে নষ্ট ক’রে দেয়। আপনি কালকেই বেশ কিছু সৈন্য নিয়ে নারকেলবেড়িয়া খাজা করুন এবং যত শীঘ্র সম্ভব এই দুর্বৃত্তদের দমন করার ব্যবস্থা করুন। আপনার কাছ থেকে পবরের প্রতীক্ষায় রইলাম। পুনশ্চ : আমরা বন্দুক উচিয়ে প্রস্তুত হয়ে আছি, কারণ এইমাত্র পবর পেলাম যে একটা বেশ বড় জমাত একটু দূরে একটা মাঠে নমাজ পড়ছে। মনে হয় নমাজ শেষ হলে ওরা আমাদের আক্রমণ করবে। তা যদি হয় তাহলে কোনো আইনকাহুন মানব না, শোভা জমাত লক্ষ্য ক’রে গুলি করব।’

বনগার উত্তরে মূলনাথ নীলকুঠি থেকে নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেট শিখ ১৭ নভেম্বর লেখেন : ‘ডেভিড অ্যান্ড্রু, তার লোকলম্বর এবং আমরা আজ কোনোরকমে হাতিশ পিঠে চড়ে প্রাণ নিয়ে এখানে ফিরে এসেছি। আমাদের বাঁচাটা একটা অলৌকিক ব্যাপার বলে

• বারঘরের নীলকুঠি ছিল নারকেলবেড়িয়া থেকে মাইল দুই তিন ইঞ্চি দূরত্বের নদীতীরে। নারকেলবেড়িয়াও নৈমুদ্দিন নিখালের (তিতুমীরের পৃথলোবক) প্রাণোদ্ধ মহত্ব ধারবল্য বিশ্বাস দলেন যে নৈমুদ্দিনের পিতা হানিক গাজী এই নীলকুঠির একজন কইচারা ছিলেন। ডেভিড অ্যান্ড্রু এই অঞ্চলের একজন বনিক নীলকর, ইচ্ছাযতীর তীরে কয়েকটি নীলকুঠির তিনি মালিক ছিলেন।

মনে হচ্ছে। বারঘরের নীলকুঠি তিতুমীরের দল প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করে এবং যথেষ্ট আঘেদ্যস্ত গুলিগোলা থাকা সত্ত্বেও আমরা তা সামলাতে পারি নি। বেসামাল অবস্থায় কোনোরকমে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছি। ডেভিসের প্রচুর কয়কতি হয়েছে, আসবাব-পত্রের প্রেট খালা বামন, দুটি বজরা, একটি পান্সি, কয়েকটি ব্রেলেবোট ও ডিক্সি, একটি হাতি এবং আমার পাঁচটি গোয়া গেছে। সঙ্গে যে আমাদের ছিল তাদের ফেলে রেখে আমরা পালিয়ে এসেছি, জানি না তাদের কি হাল হয়েছে।

‘ঘটনাটা ঘটল এইভাবে। সকাল সাড়ে নটার সময় পান্সি থেকে নেমে হাতির পিঠে চড়ে, বারো-চোদ্দটি ডবল-বারেল বন্দুক নিয়ে, আমরা ছবুস্ত্রদের সন্ধানে বেরিয়ে-ছিলাম। তিতুমীরের শাখরেরদরা দলে ভারি নয়, এবং দুর্বল বলে আমরা যে দালালদের মারফত গোপনে পথের পেয়েছিলাম, তা ঠিক নয়। আমাদের সঙ্গে অন্তত তিনশো লোক ছিল। এইরকম স্বাভাবিক ক’রে বারঘরের মাইল দেড়েক দূরে নারকেলবেড়িয়ার দিকে আমরা যাত্রা করি। কিন্তু দূর থেকে আমাদের বিশাল আকার দেখে আমরা পন্থে পাড়াই এবং তাদের মারমুখী উদ্ভত চেহারা দেখে রীতিমতো ভীত হই। মুহূর্তেই আমরা দূর করি যে এক্ষেত্রে পৃষ্ঠপদর্শন করাই বুদ্ধিমানের কাজ। পালাবার জন্য যখনই আমরা পিছন ফিরি তৎক্ষণাৎ তারা ভড়িৎগতিতে আমাদের আক্রমণ করে। জোরে দৌড়তে না পেরে আমাদের দলের কয়েকজন ধরা পড়ে এবং তাদের তৎক্ষণাৎ কেটে ফেলা হয়। দৌড়তে দৌড়তে নদীর তীরে পৌঁছে আমরা পান্সিতে উঠি। পান্সি থেকে দেখি আমাদের লোকজন যারা পৌঁছতে পারে নি, তাদের ওরা ধরছে আর কাটছে। পান্সি থেকে বন্দুক তুলে আমরাও অনর্গল গুলি করতে লাগলাম, কিন্তু আশ্চর্য! গুলির আওয়াজ হয় আর ঝপ্ করে ওরা মাথা হেঁট করে, আবার মাথা তোলে, আবার আওয়াজ হয়, আবার মাথা হেঁট করে আর মাথা তোলে (‘they bobbe down and avoided the shots’)। (আবার সেই ফকিরী ভেঁকি ‘গুলি খা ডালে গা’-র কথা মনে হয়)। বোধহয় গুলির ব্যর্থতা দেখে, আমাদের সম্মুখী অস্তিত্ব একেবারে উপেক্ষা ক’রে, অদ্ভুত উল্লাসে তারা নাচতে থাকে, লাফাতে থাকে (‘and then began dancing and jumping about in defiance of us’)। ডেভিসের গুলিতে ওদের একজন লোক মারা যায়। তার পোশাক দেখে মনে হয় যে সে দলের একজন সর্গার। কয়েকজন লোকও হয়। কিন্তু তাতে কোনো ভ্রক্ষেপ নেই। ক্রমে তারা নদীর তীরের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। মনে হল পান্সিহুকু আমাদের ধরে কেটে ফেলবে। তাড়াতাড়ি নদী পার হয়ে প্রায় মাইলখানেক দৌড়ে আমরা আমাদের হাতির কাছে পৌঁছলাম এবং হাতিতে চড়ে পালিয়ে এলাম ডেভিসের নীলকুঠিতে। ধরা পড়লে, এবং পড়ার সম্ভাবনা খুবই ছিল, ওরা আমাদের খণ্ড খণ্ড ক’রে কেটে ফেলত। আমার কৌশলগরি নাড়ির ওদের হাতে ধরা পড়ে এবং তাকে টুকরো ক’রে কেটে ফেলা হয়। এছাড়া আরও কত লোকজন যে ওদের হাতে ধরা পড়ে ও মারা যায় এবং জিনিস-পত্রের যে কি পরিমাণ ক্ষতি হয়, তার হিসেব এখনো করি নি।

‘তিতুমীরের এই অসাধারণ শাণের দলের যে তেজউদ্দীপ্ত দৃঢ়তা ও উদ্যমতা আমি স্বচক্ষে লক্ষ করেছি— প্রায় হাজার থেকে দেড় হাজার লোকের দল এবং চারিদিকের গ্রামের লোকের সহায়ত আশ্রিত— তাতে আমি নিঃসন্দেহে গবর্নমেন্টকে অবিলম্বে সর্বপ্রকারের সাহায্যদানের (মিলিটারি) জন্য অহরোধ করতে পারি— (‘After what I have myself witnessed of the spirit, resolution and fanaticism of this most extra-ordinary body of men, whose numbers could not have been less than 1000 or 1500, in league with all the surrounding villages, I have no hesitation in making the most urgent representation to Government of the absolute necessity for prompt and efficient aid, not only to check their progress up the Isamutty River abounding with Indigo Factories, several of which belong to Mr. Andrews, who will now be an object of their special vengeance, but likewise afford protection to the lives and property of the people of the Zillah, and to cut them off in case they approached the Sudder station.)’ ১২ নভেম্বর (যেদিন নারকেলবেড়িয়ার চড়াঙ্গ লড়াইয়ে তিতুমীর নিহত হন) নদীয়ার কোজদারী আদালতগৃহ থেকে ম্যাজিস্ট্রেট মিথ কলকাতায় বিচারবিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারি টমাসনকে লিখছেন, ‘nothing short of a strong military power will be able to deal with these fellows.’ মিথ জানতেন না যে তাঁর চিঠি কলকাতায় পৌঁছবার আগেই বড়সাহেবরা এই কর্তব্য পালন করবেন।

কোনোরকমের গভীর সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ অথবা ঐতিহাসিক কল্পনার প্রসারণ ছাড়াই তিতুমীরের বিদ্রোহের স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট পরিচ্ছন্ন ধারণা যে— কোনো সাধারণ মাত্রারের হতে পারে বলে আমাদের বিশ্বাস, শুধু ইংরেজ জেলাশাসকদের এই চিঠিপত্র ও বিবরণীগুলি পাঠ করলে। আর ঘাই হোক, বিদ্রোহটা যে দাড়ি আর গন্ধ, মন্দির আর মসজিদ, লুপ্তি আর কাছা, বামুন আর মোল্লা ইত্যাদি ধর্মীয় প্রতীকের ‘কনফ্লক্টেশন’ নয় অথবা কোনো হঠাৎ-উদ্ভেজনায় উৎকট বাহ্যপ্রকাশ নয়, সেটা অস্তিত্ব অলোকসাপাত, স্থিতি ও বারংয়ের পদ্ধতিবিপর্যয় থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়। ১৮৩১ সালের জুন-জুলাই মাস থেকে আরম্ভ। তখন দাড়ি গন্ধ মন্দির মসজিদ ইত্যাদির কিঞ্চিৎ বাতলা। একদিকে কৃষকদের মতো হিন্দু জমিদাররা আর অন্যদিকে বিভাগ্যকারবণিত তিতুমীরের মতো ‘ধর্মোন্মত্ত মুসলমান’রা। অতএব ইতিহাস ও ঐতিহাসিকদের বিচারবিবেচনার পথ প্রশস্ত। বিদ্রোহটা নিম্নক হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা ছাড়া অল্প কিছু নয়। কিন্তু তা যে নয় সেটা সরকারী বিবরণী থেকে দিবােলোকের মতো পরিষ্কার। কমিশনার ও জেলাশাসকদের চিঠিপত্রে ও

প্রতিবেদনে দেখা যায়, ক্রমে বিদ্রোহ ও সংগ্রাম বর্ত্ত তীব্র ও ব্যাপক হয়েছে, 'উত্ত দার্জি
পক্ষ হিন্দুর মসজিদ মোক্কা পুকুর ইত্যাদি ধর্মীয় উপাদান সন্ন্যাসী মিবরণী থেকে
অন্তর্হিত হয়েছে এবং তার পরিবর্ত্তে ব্রিটিশ শাসকরা এবং তাদের সহযোগী স্থানীয়
নীলকর ও জমিদাররা শত্রুরূপে বিদ্রোহীদের প্রধান লক্ষ্য হয়ে উঠেছে। আপাতত এইটুকু
শুধু মনে রাখা দরকার, বাকিটুকু এই কাহিনীর অগ্রগতির সঙ্গে এবং শেষে বলা যাবে।

কলভিনের সুদীর্ঘ রিপোর্ট (৪৫ অঙ্কচ্ছেদ সংবলিত, ৮ মার্চ ১৮৩২) কমিশনার বার-
ওয়েল কলকাতায় বিচারবিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারি টমাসনকে ১৬ মার্চ ১৮৩২ পাঠিয়ে
দেন এবং তাঁর চিঠিতে কলভিনের (তখন আলেকজান্ডারের বদলে বারাসাতের অস্থায়ী
জয়েন্ট-ম্যাজিস্ট্রেট) নিরপেক্ষ তদন্তের ও বিচারবৃত্তির কৃপায় প্রশংসা করেন। আলেক-
জান্ডারের বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি বাধ দিয়ে কলভিনের নিজস্ব মন্তব্যের মধ্যে বেগুলি
অস্থাবনযোগ্য, কেবল সেইগুলি এখানে আমরা উল্লেখ করব। যেমন কলভিন বলেছেন
(অঙ্কচ্ছেদ ৪) যে বিদ্রোহ বা হান্সা ঘাই বলে তিতুমীরের ক্রিয়াকলাপকে অভিহিত
করা হোক না কেন, তা একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ। প্রধানত বারাসাতের
উত্তরাংশের লোকজন এবং সংলগ্ন নদীয়া জেলার কয়েকটি গ্রামের অধিবাসীরা এই
বিদ্রোহের সঙ্গে জড়িত ছিল। তাদের মধ্যে অধিকাংশ হল দরিদ্র কৃষক এবং মুসলমান
তন্তব্য ('জেলা' বলে পরিচিত, অন্ততম উপাধি 'কারিগর') এবং এই জেলাদের
সংখ্যা এই অঞ্চলে খুব বেশি। বিদ্রোহীদের দলপতি মীর নিসার আলি, সাধারণত
তিতুমীর নামে খ্যাত। তিতুমীরের কয়েকজন মন্ত্রাস্ত্র আত্মীয়স্বজন এই অঞ্চল বাস করে
বটে, কিন্তু দু-একজনের বেশি নয়। তিতুর অহুচরদের মধ্যে প্রধান হল এই অঞ্চলের
কৃষকরা, যারা তার প্রাথমিক সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে তার দলে যোগ দিয়েছে, এবং
বাকি সকলে তার প্রচারিত নব্য-ইসলামধর্মের সমর্থক।

একটি মানচিত্র কলভিন তাঁর রিপোর্টের সঙ্গে পাঠিয়ে মন্তব্য করেছেন যে তিতু-
মীরের বিদ্রোহাঞ্চলের সীমানা ২৮০ বর্গমাইলের বেশি নয় (অঙ্কচ্ছেদ ৫)। যমুনা ও
ইছামতী নদীর উপর দিয়ে নদীয়া জেলার সীমান্তবর্তী অঞ্চল নিয়ে বিদ্রোহের এলাকা
দৈর্ঘ্যে ১৮ থেকে ২০ মাইল এবং প্রস্থে ১২ থেকে ১৪ মাইলের বেশি নয় ('The
accompanying Map which is tolerably correct and in which I have
marked off the farthest villages in each direction from which the
people were assembled in any numbers, will show the tract of
country over which the influence of their leader extended. This
tract running across the Juhon (যমুনা) and Issamutty rivers into
the Nuddea Jurisdiction is some Eighteen or Twenty miles in
length by Twelve or Fourteen in breadth')। জুহের বিষয়, মানচিত্রটি
মহাক্ষেত্রস্থানীয় নেই।

কলভিন লিখেছেন, 'নারকেলেবেড়িয়ার কয়েকমাইল দক্ষিণপশ্চিমে 'টানপুর' গ্রামে তিতুমীরের বাস (সকলে 'হায়দারপুর' গ্রামের নাম উল্লেখ করেছেন, কিন্তু সেটা তুল নয়, কারণ হায়দারপুর আর টানপুর সংলগ্ন গ্রাম, একই গ্রাম দুইভাগে বিভক্ত বললেও তুল হয় না) এবং সাধারণ মুসলমান চাষীর চেয়ে একটু ভাল অবস্থার কৃষক পরিবারের সম্ভাবন। প্রথম ভাবনে তিতুমীর খুব দুঃসাহসী ও দুর্ধর্ষ প্রকৃতির ছিল এবং গুণাবলী ও দাঙ্গাহাঙ্গামায় একাধিকবার লিপ্ত থাকার ফলে আদালতে দণ্ডিতও হয়েছে। বছর সাত-আট আগে এক ধনিক রাজকুমারের নেকনগরে পড়ে মক্যাবাবার হুযোগ পায় তিতু এবং সেখান থেকে ফিরে এসে বছর খানেক চূপচাপ থাকার পর তার নতুন ইসলামধর্ম প্রচারে ও ধর্মসংস্কারে ত্রুতী হয়। কিছুদিনের মধ্যে তিতু প্রায় ৩০০০ শাগরের তৈরি করে ফেলে। পোশাকে ও চেহারা (ফকিরের মতো বেশ ও হাড়ি) সাধারণ মুসলমানদের সঙ্গে তাদের পার্থক্য ছিল এবং তারা সামাজিক ও ধর্মীয় আচার-ব্যবহারে নিজেদের স্বাভাবিক বজায় রেখে চলত (অহুজেন ৬)। তাদের এই নতুন ধর্ম-সংস্কারের গুরু ছিলেন সৈয়দ আহমদ, 'the well known fanatic who gave so much trouble to the Sikhs in Lahore', কানোরকমের পৌত্তলিকতাগম্ভী কুমারগ্রন্থ ধর্মচরণের সঙ্গে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই এবং এই সমস্ত কুমারের বা প্রধানত হিন্দুসমাজের সঙ্গে দীর্ঘকাল সারিধোর বলে ইসলামধর্মে প্রবেশ করেছে তা বর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। সম্ভাবন করে বলেনছি, কলকাতা শহর ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সমস্ত মুসলমানদের মধ্যে অধিকাংশই উক্ত সৈয়দ আহমদের ধর্মদর্শন অহুগামী ('it is notorious that in Calcutta and its neighbourhood Syeed Ahmeed has for his disciples nearly all the most respectable of the Mahomedan inhabitants')। হিন্দুধর্মী ও কার্ণী ভাষায় এই ধর্মদর্শন ব্যাপ্য করে অনেক পুণ্ড্রপুণ্ড্রিকা ইশতেহার প্রচারিত হয় যেমন 'Serat Dob Mustakeen Hidyur', 'Ool momineem Nosheent Ool Mooslimeen' (?) ইত্যাদি (অহু ৭)। সাধারণ লোকের মধ্যে সৈয়দ অথবা সৈয়দগম্ভী তিতুমীরের এই ধর্মসংস্কারের আদর্শ বিশেষ জনপ্রিয় হয় নি, কারণ মহরম উৎসব, কয়তা (মৃত মুসলমানদের আত্মার কল্যাণার্থে ভোজ্যাদি দানসহ প্রার্থনা বিশেষ), পীরপূজা ইত্যাদি দিগমীর আচরণ বলে নিশ্চিত হলেও সাধারণ মুসলমানদের কাছে তার মর্ম আদৌ বোধগম্য হতো না। সেই কারণে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে তিতুর ধর্মসংস্কারের আশ্রয় বিশেষ লাড়া ত্যাগ নি' (অহু ৮)।

প্রধানত তিতুমীরের দলের ধর্মসংস্কার আন্দোলন স্থানীয় জনসাধারণের কাছে আবেদন-নিবেদনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং তার জন্য কোনো দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়েছে বলে জানি না। স্থানীয় হিন্দু জমিদাররা, থানা সাধারণত কোনোরকমের নতুন আদর্শ বা ভাবধারার প্রচার পছন্দ করেন না তারা একটা হুযোগ পেয়ে, অর্থাৎ একদল মুসলমান প্রজা তিতুদের ধর্মপ্রচার পছন্দ করছে না দেখে, উভয়দলের মধ্যে বিবাদে প্রয়োচনা

দিতে থাকেন। তারা মনে করেছিলেন, বিবাদ বাধিয়ে দিলে শেষ পর্যন্ত তারাষ্ট লাভবান হবেন ('There was...the more certain inducement to interference in the dispute: furnished by the hope of profiting by it')। ভূমিদারদের মধ্যে প্রথম গীরা বিবাদের উদ্বানি দিয়েছিলেন তাঁরা। হলেন, তারাগনিয়ার রামনারায়ণ নাগ (চৌধুরী), নগরপুরের গুরুপ্রসাদ চৌধুরী, গোড়গাহির ভূমিদারনীল এড্‌ওট এবং পুঁড়ার কৃষ্ণদেব রায়। (এর পর বিবাদ দাক্ষাহাক্ষ্য খানাদারোগা মামলামকদ্দমার যে বর্ণনা দিয়েছেন কলভিন ডা অনেকটা আলেকজান্ডারের বিবরণের সঙ্গে মিলে যায়)। স্থানীয় আদালতে এই সমস্ত মামলা মিটে যাবার পর ভূমিদাররা বক্রি পাঞ্জনার মিথ্যা অভিযোগে প্রজাদের উপর নানারকমের জুলুম অত্যাচার করতে থাকেন, তাদের কয়েদ ক'রে মিথ্যা মামলা দায়ের করতে থাকেন, যার চরম শেষ পর্যন্ত তারা মরিয়া হয়ে হিংসাত্মক কার্গকলাপ আরম্ভ করে ('that a fraudulent and oppressive use was made by the Zemindars of the power of summary arrest for arrears of rent authorized under the provisions of Regulation 7, 1799 and that this was one of the provocations which at last forced them into acts of violence.')। এই নিয়ে মামলামকদ্দমা হয় এবং তারা চলিশ-পরগনার জেলা আদালতে আপীল করে। কিন্তু আদালতে আপীল ক'রে তাদের সমস্তার কোনো সমাধান হবে না, এরকম একটা ধারণা তাদের মাধ্যম তিতুমীরের চেনারা চুকিয়ে দেয়। যদিও তিতুমীরের ধর্মসংস্কারের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক ছিল না, তাহলেও সে চাষীদের অস্বাভাবিক অভিযোগ নিষেধ করতে ক'রে গ্রহণ করে ('Yet Titto Meer, the head of their sect, had made common cause with those persons')। তিতুর গ্রামবাসী মহম্মদ মাহমুদ নামে তার একজন অল্পচর চাষীদের প্রতিনিধি ও পরামর্শদাতা হিসেবে তাদের সঙ্গে কলকাতায় যায় এবং সেখানে সলা-পরামর্শ ক'রে, আপীলের পথ ছেড়ে, গ্রামে ফিরে আসে নিজেদের ক্ষমতা প্রয়োগ ক'রে অত্যাচারের প্রতিকার করার চরম ('it is to circumstance of some kind or other that occurred in Calcutta that I ascribe his adopting the resolution of collecting his followers and of seeking revenge for his party by force.')।

নারকেলগেড়িয়া গ্রামে তিতুমীরের দলের সম্মত হয় এবং সেখানেই তারা তাদের প্রধান ষাটি তৈরি করে। তার কারণ এই গ্রামের একজন অবস্থাপন চাষী ('principal ryot'), মৈজুদ্দিন বিশ্বাস (পলাশ বিঘের মতো লাখেরাঙ্গ সম্পত্তির মালিক) ছিল তিতুমীরের ভক্ত। অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ভূমিদারদের আক্রমণ করার চরম এখানে তারা মজবুত ষাটি তৈরি করে। শাস্তিপ্রিয় নিরীহ একদল চাষী হঠাৎ এরকম হিংসাত্মক আইন-শৃঙ্খলাবিরোধী অভিযানের অস্ত্র কেমন ক'রে উৎসাহিত হয়ে উঠল সে কথা ভাবলে বাস্তবিকই অবাক হতে হয় এবং তখন এই কথাই মনে হয় যে একজন ধর্মগুরু বা ধর্ম-

সংস্কারকের প্রভাব অশিক্ষিত অসুহৃদ জনসাধারণের উপর কতদূর ব্যাপক ও গভীর হতে পারে ('The readiness with which a body of persons, who had previously for the most part peaceable and harmless Ryots were induced to lead themselves to the most lawless outrage is a striking instance of the influence which a religious teacher can acquire over an utterly rude and uninformed people'. *Para 21*)। (পরবর্তী বিবরণ আলেকজান্ডারের পুনরাবৃত্তি, কেবল একটি বিষয় প্রসঙ্গত কলভিন উল্লেখ করেছেন যে তিতুমীরের দলের বিদ্রোহী 'অসভ্য' চাষীরা উত্তেজনার বশেও কোনে। নৃশংস কাজ বিশেষ কিছুই করে নি—'Their proceedings at the same time it should be mentioned were not marked by any acts of gross cruelty')।

সমস্ত ঘটনাটা একটা সাময়িক উদ্‌যাদনার প্রকাশ বলে মনে হয়। তবে নারকেল-বেড়িয়ার অনেক কৃষক সাক্ষী দেবার সময় বলে যে তিতুমীরের দলের লোকেরা বহুদিন ধরে নাকি ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে কণাবার্তা বলত এবং একটা কোনো চক্রান্ত করত বলে মনে হয় ('several of the ryots of the Narkelberia village have in their evidence before me, united in stating that the people of Tittoo Meer's sect have been long in the habit of talking of schemes against the Government'.—*Para 26*)। তিতুমীরের দলে ধনিক ও প্রভাবশালী লোকের সংখ্যা কিরকম ছিল (স্বভাবতঃই ধনিক মুসলমান), সেটাও এই তদন্তের অন্ততম বিষয় ছিল। মুনশী উমীর নামে একজন ধনিক জমিদারের সঙ্গে তিতুমীরের আত্মীয়তা ছিল বিবাহসূত্রে, তাই অনেকে সন্দেহ করত যে মুনশীর সঙ্গে তিতুর যোগদানস আছে। তদন্ত ক'রে দেখা গেছে, সন্দেহ ভিত্তিহীন। তিতুমীরের দলে এমন লোক বিশেষ ছিল না যাদের কিছু ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা আছে ('No one with anything to lose could have ventured to put it to risk in such an affair.'—*Para 26*)।

নারকমের সব পাণ্ডা আদায়ের অজুহাতে স্থানীয় জমিদার-তালুকদারদের জোর-জুমুজ্বরদস্তির অনেক অভিযোগ কলভিন কৃষকদের কাছ থেকে শুনেছিলেন তদন্তকালে এবং নিজের লোক দিয়ে অতুসন্ধান ক'রে তিনি জেনেছিলেন যে অভিযোগ সত্য ('the intelligence which I obtained from all quarters was such as to leave not the slightest doubt of any kind, that the exactions they complained of had been actually practised.'—*Para 27*)। অথচ এই জমিদারদের শাসন করা অথবা আইনআদালতের গতির মধ্যে এনে তাঁদের অত্যাচার বিচার করা একরকম অসম্ভব বলা চলে। কারণ 'বিসমিল্লায় গলদ' অর্থাৎ গোড়ায় গলদ অর্থাৎ ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় বখেটে গলদ থাকার ফলে তার আইনআদালত বিচারব্যবস্থা

ইত্যাদি গ্রহণনে পরিণত হয়, বিকৃত হয়, এবং জমিদার বা ধনিক সংগতিপূর্ণ কোনো ব্যক্তি অন্ত্যায় কবলেও তার যথোচিত তদন্ত করা হয় না এবং তাঁর সামাজিক মর্যাদা প্রভাবপ্রতিপত্তি ক্ষুন্ন হতে পারে বলে অন্ত্যায়ের জন্ম কোনো দণ্ডও তাঁকে দেওয়া হয় না। কলভিন লিখেছেন :

The entire root of the mischief which has occurred lies deep and cannot easily be removed. The powers possessed by Zeminders enable them to exercise a petty jurisdiction among their ryots and to make petty exactions on all kinds of pretences. The corrupt character of the people and the defects of our own instruments pervert our administration of justice, and render it a matter of the greatest uncertainty whether we shall arrive at the truth or not in all cases in which men of wealth or influence will be injured by its detection....Para 36.

পূঁড়ার জমিদার রুফদেব রায়কে অন্তত লণ্ডনও দেওয়া উচিত বলে কলভিন মন্তব্য করেছেন, কিন্তু তার পরেই আবার বলেছেন যে এটা করা ঠিক হবে কি না তাও ভেবে দেখা দরকার যেহেতু রুফদেব রায় দণ্ডিত হলে প্রমাণিত হবে যে তিতুমীরের বিব্রোহের কিছুটা যুক্তিসংগত কারণ ছিল ('To award punishment at all would be to admit that Tittoo Meer's party had some ground of justification for the excesses which they had committed...') ।

চিরহায়ীবন্দোবস্তপরবর্তী বাংলার নব্যজমিদারদের বেচ্ছাচারিতার কাহিনী নিয়ে একটি মহাগ্রন্থ রচনা করা যেতে পারে কিন্তু একটি প্রবন্ধের সীমিত গতির মধ্যে তার শতভাগের একভাগেরও আভাস দেওয়া সম্ভব নয়। নতুন জমানার (ব্রিটিশ) এই নতুন জাতের জমিদারদের কদাচ প্রচলিত মধ্যযুগীয় অর্থে ঠিক 'জমিদার' বলা যায় না, বলা উচিত জমিজমার বা ভূসম্পত্তির 'ঠিকাদার'। ঠিকাদারদের অধীনে অসংখ্য উপ-ঠিকাদার (এবং সকলেই 'জমিদার') যেমন পত্তনিদার দরপত্তনিদার দেপত্তনিদার গাতিদার ইত্যাদি। গ্রাম্যসমাজে ভূস্বাতন্ত্র্য শোষণকেন্দ্রের একটা অভিনব স্তরবিস্তার, যে কোনো দেশের ইতিহাসে অতিপয় দুর্লভ, যেন চাষীদের দেহলয় এককাক জ্যোৎস্না, রক্ত ওবে স্বীতকায় হয়ে কলকাতার মতো শহরে বেচ্ছাবাইজিবাজি ক'রে নব্যসংস্কৃতির পোষকতায় নিমজ্জিত। অতিশয়োক্তি নয়। বাংলার এই ঠিকাদার-জমিদাররাই যে বাংলার সাহিত্যসংস্কৃতির সর্বপ্রধান পৃষ্ঠপোষক ও সমর্থনার সেক্ষা তো বাংলার বাহ্য জমিদার বর্মানের মহারাজা খুব বড়াই ক'রে কুশিরাজ্য কমিশনের (ল্যান্ড কমিশন, ১৯৪০) কাছে তাঁর *Note of Dissent*-এ বলেছিলেন :

Those who are conversant with the cultural history of Bengal know full well that art, literature and music have prospered under the aegis of the landowning community, and this patronage will disappear along with the abolition of private landlordism.

মহারাজার উক্তির সমর্থনে একজন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক (রাধাকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়) বলেছিলেন যে যদি 'rack-renting' না হয় তাহলে 'rent-receiving' কোনো অজ্ঞান অপরাধ নয় এবং বাংলার মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিশাল অংশ জুমিরাজস্বভোগীর বৃত্তি গ্রহণ করেছেন একটা মহৎ সদিচ্ছার বশবর্তী হয়ে, সেটা হল 'লাভলে'র বদলে 'কলমে'র সাহায্যে প্রতিষ্ঠা করা এবং আধুনিক বিদ্যালয় ক'রে 'শিক্ষিত' হওয়া :

Rent-receiving is not always a crime unless it is rack-renting. The middle classes have become rent-receivers in their zeal to exchange the plough for the pen, and have built themselves up on the basis of education financed by their income from their tenures or fields in the shape of rents.

জুমিরাজস্বনির্ভর এই বিপুল মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিকাশের জন্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও মধ্যস্বত্বের ব্যবস্থা করা হয়েছিল ব্রিটিশ আমলে এবং দেখা যায় ভারতসচিব পরিদায়ক ক'রে তাঁর এক ডেসপ্যাচে (১৮৬২) বলেছিলেন :

It is most desirable that facilities should be given for the gradual growth of a middle class connected with the land, without dispossessing the peasant proprietors and occupiers. (Despatch No 14, 9th July 1862).

তিতুমীরের বিরোধাকালের মধ্যেই জমিদার মধ্যস্বত্বভোগী ও তাঁদের নায়েব গোমস্তা আমলা কর্মচারী নিয়ে বেশ বড় একটা শোষণশ্রেণীর বিকাশ হয়েছিল গ্রাম্যসমাজে। তাঁদের প্রভুবৎ সহযোগী ছিলেন সাহেব নীলকররা এবং তাঁদের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষণাবেক্ষণের গুরুদায়িত্ব পালন করতেন ব্রিটিশ শাসকরা।

সর্বজনবিদিত সত্য হলেও, এই শ্রেণীর শোষণনির্ধাতনের বহর এবং আচারব্যবহার-চরিত্র সম্বন্ধে সামান্য আঁডাল দেওয়া প্রয়োজন। যেমন জমিদাররা 'ভাণ্ডার রাজস্ব ভিন্ন বাটা, যথাকালে অনাদায়ি রাজস্বের নিয়মভিত্তিক বৃদ্ধি, বাটার বৃদ্ধি, বৃদ্ধির বৃদ্ধি, আগমনি, পার্কনি, হিসাবানা প্রভৃতি অশেষ প্রকার উপলক্ষ করিয়া ক্রমাগতই প্রজা-নিপীড়ন করিতে থাকেন। অনেকানেক জুমি অনাদায়ি ধনের চতুর্থাংশ বৃদ্ধি স্বল্পে গ্রহণ করেন। প্রতি শতে পঁচিশ টাকা করিয়া বৃদ্ধি। ইহার অপেক্ষা অনর্থহুলক ব্যাপার

আমি কি আছে?’ যেমন ‘জুহামির ভবনে বিবাহ, আশ্রয়তা, দেবোৎসব, বা প্রকারান্তর পূণ্যক্রিয়া ও উৎসব ব্যাপার উপস্থিত হইলে প্রজ্ঞাদের অনর্থপাত উপস্থিত, তাহার-
 দিককেই ইহার সমুদয় বা অধিকাংশ ব্যয় সম্পন্ন করিতে হয়। ইহা মানন বলিয়া
 প্রসিদ্ধ। যেমন মাননের একটি দৃষ্টান্ত: ‘কলিকাতাবাসী ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত কোনো প্রসিদ্ধ
 জুহামি একদা আশনার অধিকারস্থ প্রজ্ঞাদিগকে কহিয়াছিলেন, ‘ওহে বাবা সকল!
 আমি ব্রাহ্মণ, এক মৃষ্টি করিয়া চাউল ভিক্ষা হিলে আমার যথেষ্ট হয়। ইহা শুনিয়া
 তাহারা কিছু কিছু প্রদান করিলেক। তাহারা অতি সরল স্বভাব, তাহার কুটিল ভাব
 অবগত হইতে পারিল না। কিছুদিন পরে তিনি সমুদয় তুলনের সমষ্টি করিয়া তাহার
 ১৫০০ টাকা মূল্য নিরূপণ করিলেন এবং এই অথগা যাজ্ঞ প্রচার করিয়া দিলেন যে
 প্রজ্ঞাদিগকে বৎসর বৎসর এই ১৫০০ টাকা করিয়া প্রদান করিতে হইবেক। প্রথমে ঘাফা
 ভিক্ষা ছিল, পরে তাহা বাধিক হইল। কেমন প্রবকনা! কি অত্যাচার!’ অহা!
 ব্রাহ্মণ! একে ভ্রমিয়ার, তার উপর ব্রাহ্মণ! যেমন গোবরভাণ্ডার ভ্রমিয়ার কলীপ্রসঙ্গ
 মুখোপাধ্যায় ব্রাহ্মণ এবং কুলীন ব্রাহ্মণ, তিতুমীরের পরম জ্যেষ্ঠপুত্র, যিনি জেলাশাসকের
 নির্দেশে পাইকবরকল্লাজ লেঠেলনগর পাঠিয়ে ‘ধর্মোন্মত্ত মুলনমান’ তিতুমীরের দলকে
 জব্দ করিতে অগ্রসর হয়েছিলেন, সৈন্যদের রসদ যুগিয়েছিলেন এবং যিনি সংস্কৃতির
 ধারকবাহকরূপে গোবরভাণ্ডার বঙ্গসংস্কৃতির অপূর্ব অত্যাচার্য ‘বাদশ শিবমন্দির সম্বলিত
 আনন্দমন্দির বাটী’ নির্মাণ ক’রে গিয়েছেন। ব্রাহ্মণ ও জুহামিদের সংমিশ্রণে কি
 বিশ্বদ্রবর ওদ্বারের বিকাশ হতে পারে তা কেবল শিবমন্দির ও আনন্দমন্দির দিকে
 ফালফাল্ ক’রে চেয়ে দেখতে দেখতে মনে হয়। অহা ব্রাহ্মণ! সাক্ষাৎ শিবরূপ
 জুহামী! যেমন ‘দম্পতি মাননের বিষয়ে আর এক চমৎকার ব্যাপার বর্ণন করিয়া
 বিশ্বদ্রাবর হইলাম। কলিকাতার দক্ষিণাংশের কোন জুহামী একদা কারাকু হইলে
 তাঁহার কারাগৃহে থাকিবার ব্যয় নির্বাহার্থে প্রজ্ঞাদিগের নিকট এক মাথট হয়, তাহার
 নাম গারদ সেলামি। শুনিতে পাই, অতীবধি নাকি বৎসর বৎসর গারদ সেলামি আদায়
 হইয়া থাকে।’ ‘গারদ সেলামি’র মতো কলকাতা শহরে বাইজিবারানাবিলাসের জন্ত
 প্রজ্ঞাদের কাছ থেকে কোনো ‘বাইজি সেলামি’ ভ্রমিয়ারা আদায় করতেন কি না,
 তার উল্লেখ কোনো সাময়িকপত্রে নেই। আপাতত মাননকাহিনী সমাপ্ত।

যৎকিঞ্চিৎ অত্যাচারের কাহিনী। যেমন ‘জুহামী ও দারোগা এবং তাহাদের কর্ণ-
 চারিরা প্রজ্ঞাদিগের যে প্রকার শারীরিক দণ্ড করে, তাহা কলিকাতাবাসি অনেক লোক
 সবিশেষ অবগত নহেন। অতএব পক্ষাৎ কয়েক প্রকার কাহিন্যের বিবরণ করা যাইতেছে,
 যথা : ১। দণ্ডাঘাত ও বেত্রাঘাত করে ২। চর্মপাছুকা প্রহার করে ৩। বংশকাঠি দ্বারা
 বন্ধন দলন করিতে থাকে ৪। গাপর দিয়া কর্ণ ও নাসিকা মর্দন করে ৫। ভূমিতে
 নাসিকা ঘর্ষণ করায় ৬। পৃষ্ঠভাগে বাহুদ্বয় নীত করিয়া বন্ধন করে এবং বন্ধন করিয়া
 বংশদণ্ডি দ্বারা মোড় দিতে থাকে ৭। গায়ে বিছুটি দেয় ৮। হস্তদ্বয় ও পাদদ্বয় নিগড়-
 বদ্ধ করিয়া মাথে ৯। কর্ণধারণ করিয়া ধাবন করায় ১০। কাঁটা দিয়া হস্ত দলন করিতে

থাকে ১১। ঐশ্বর্যকালে প্রচণ্ড রোডে পানদ্বয় অতি বিযুক্ত করিয়া ইষ্টকোণারি ইষ্টকহতে দণ্ডায়মান করিয়া রাখে ১২। অভ্যন্তরীণ জীভের সময় জলময় করে ও গাজে জল নিষ্কাশ করে ১৩। গোণীবদ্ধ করিয়া জলময় করে ১৪। বৃক্ষে বা অগ্নিতে বহন করিয়া লক্ষ্যমান করে ১৫। ভাত্র ও আধিনমাসে ধানের গোলায় পুরিয়া রাখে — (সে সময়ে গোলায় অভ্যন্তর অভ্যন্তর উষ্ণ হয় এবং ধাত্র হইতে প্রচুর বাষ্প উঠিতে থাকে।) ১৬। চূর্ণের ঘরে বদ্ধ করিয়া রাখে ১৭। কারাক্ষক করিয়া উপবাসি রাখে, অথবা ধাত্রের সহিত ততুল মিশ্রিত করিয়া তাহাই এক সন্ধ্যা আহার করিতে দেয় ১৮। গৃহমধ্যে বদ্ধ করিয়া লক্ষ্য মরীচের ধোঁয়া প্রদান করে।'

যেমন 'সংপ্রতি কৃকনগর জেলার কোন ভূস্বামী ও তাঁহারদের কর্মচারিদিগের চরিত্র প্রবণ করিয়া বিশ্বাস্য হওয়া গেল। তাঁহারা প্রজাদের স্বাবরাষ্ট্রাবর সম্পত্তি দূরে থাকুক, তাহারদিগের শরীরও আপনাদের অধিকারভুক্ত জ্ঞান করেন, এবং তদনুসারে তাহারদিগের কায়িক পরিশ্রমও আপনাদের ক্রীত বস্তু বোধ করিয়া তাহার উপর দাওয়া করেন। তাঁহারদের এই প্রকার অর্থও অহুমতি আছে যে বিনা মূল্যে বিনা বেতনে তাঁহারদিগকে গোপেরা দুই দান করিবেক, মৎস্তোপজীবীরা মৎস্ত প্রদান করিবেক, নাপিতে ক্ষৌর করিবেক, খানবাহকে বহন করিবেক, চর্মকারে চর্মপাছুক। প্রদান করিবেক, ইত্যাদি সকলেই স্ব স্ব উপজীব্যোচিত অস্থিষ্ঠান দ্বারা তাঁহারদিগের সেবা করিবেক। ক্রীতদাসকেও একরূপ দাসত্ব করিতে হয় না।' কৃকনগর জেলার (নদীয়া) ভূস্বামীদের কথা, দ্বারা তিতুমীরের বিজ্রোহাকলঙ্কিত ভূস্বামী। আপাতত অত্যাচারপূর্ণ সমাপ্ত।

অতঃপর সাহেব নীলকরদের অত্যাচারের বিবরণ সংসামান্ত প্রদান করা কর্তব্য বলে মনে হয়। কারণ স্টর্ম, ডেভিসের মতো দোর্দণ্ডপ্রতাপ নীলকরেরা তিতুমীরের দলের প্রেক্ষাপটের মধ্যে অল্পতম ছিলেন এবং বারাসাত ও নদীয়ার জেলাশাসকদের প্রতিবেদন থেকে তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বাংলার গ্রাম্য জীবনের সঙ্গে নীলকর ও নীলচাষের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং বাংলার কৃষকদের সমুদয় সর্বনাশের ক্ষেত্রে নীলকরদের পান অসামান্য ও অন্তর্লীন। নীলচাষের অল্পতম প্রধান ক্ষেত্র ছিল বঙ্গদেশ এবং ১৮১২-২০ থেকে ১৮২৬-২৭ সালের মধ্যে, অর্থাৎ মাত্র পাঁচ-ছয় বছরের মধ্যে, নীল থেকে কেবল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির মুনাফা হয় প্রায় ৪৫ লক্ষ টাকা। পালিয়ামেন্টে প্রদত্ত হিসেব হলেও, এর মধ্যে private merchant-দের মুনাফা ধরা হয় নি, দ্বারা সংখ্যা যথেষ্ট ছিলেন। তা ছাড়া এদেশীয় জমিদাররাও অনেকে নীলচাষে উৎসাহী হয়েছিলেন অর্থের লোভে এবং তাঁদের সংখ্যাও নগণ্য নয়। বাংলার সর্বত্র নীলকরদের প্রসার হলেও, বশোহর, নদীয়া, চব্বিশ পরগনায় তিতুমীরের বিজ্রোহাকল ছিল নীলচাষের প্রধান এলাকা। নীলচাষীদের হাহাকার, যেমন আবদুল মতলুব বগলদের, এই অঞ্চলেই শোনা যেত সবচেয়ে বেশি : 'হা খোদা! তোরা মনে এই ছিল।

এই রকম কত করেছে। খানার দারোগা ১০০ টাকা জুরণ করিয়া নিয়েছে সকল গায় নীল বুনিয়ে বেবে, মেজেষ্ট্রের নিকট দরখাস্ত করিলে লা মজুর, মারা বছর না পেয়ে মজুরি করে আমিও গুলি চাষ করিয়া রাখিয়াছি, আশমান পানি দিলিই ধান বুনবো তাবে বালবাচ্চা সমেত পেয়ে জান বাঁচাবো। তাই নীল বুনো নোব, চুচি ডগ বলে সকলে বেচে কিনে নীল, ক্রমায় তিনচারগুণ বেশী করলো খোদার বান্দা ফাটকে মলো। আরো কত মরে তার ঠেকনা কি? আরেক্ষা ভাত পানির দগল যায়। আমা এমন করে মারিস ক্যান? তুই তো। সকলই পারিস। একদিন কেন দগ রাইয়ত গুটি সমেত মেরে কেলৈ সাহেবগারে সব ধো না।' মন্তলেব মওলদের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন তিতুমীর, গোদা-তাওয়ালার মতো।

নীলকরের সঙ্গে ইংরেজ শাসকদের সম্পর্ক ছিল প্রাণের সখার মতো। যেমন 'মফঃসলে যে সময় গোদাবল্ল ধর্ম্মানতারেরা অসংখ্য প্রজার ধন প্রাণের উপর কর্তৃত্ব করিতেছেন, এবং দ্বাহারা বিচারক নামে বিখ্যাত, তাহারা প্রায় তাবতেই নীলকরের বাধা, জিলার অবস্থা দর্শন অথবা শিকারে গমন করিলে নীলকুঠিতেই ভোজন শয়ন ও নীলকর সাহেবদিগের কক্ষাপুত্র ও প্রেয়সীর সহিত আমোদ প্রমোদ ও নীলকরের হস্তিতেই আরোহণ পূর্বক বাজ হরিণ মহিষ ও শূকরাদি হনন করিয়া থাকেন।' নীলকর সাহেব ও ইংরেজ জেলাশাসক 'সকলেই এক মানিকির ইয়ার কোন মতে ছাড়াছাড়ি হইবার স্রোতি নাই'। অতএব 'কয়েক জিলায় কয়েকজন জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইলেন, তথাচ অত্যাচারের কিছুমাত্র গর্ভতা হইল না, ইহার তাৎপর্য্য এক লাখ বর্গের সর্বনাশ করিয়াছে, সাহেবেরা মাজিষ্ট্রেট হইলে কি হইবে, ঝাঁকের পায়রা ঝাঁকে মিশিয়া ঘান। তাহার উপর আবার শাদা মুখু জাদ।' নীলকর ঈর্ষ ও ভেভিস সাহেবের সঙ্গে আলেকজান্ডার ও শ্বিথের গভীর বন্ধুত্বের কথা আমরা আগেই জেনেছি, তিতুমীরের দলের আক্রমণে একাধিকবার বারাসাত ও নদীয়ার জেলাশাসকরা নীলকরের হাতির পিঠে চড়ে পলায়ন করেন। আলেকজান্ডার, শ্বিথ, কলভিন সকলেই তাঁদের চিঠিপত্রে 'ও রিপোর্টে বড়সাহেবদের কাছে এই নীলকরের ভূয়সী প্রশংসা করেন, তিতুমীরের বিব্রোহ দমনে সহযোগিতার জন্ত। কলভিন তাঁর তদন্ত-রিপোর্টে এই নীলকরের কক্ষক্ষতির কথা উল্লেখ করে বলেন যে সরকারের উচিত ক্ষতিপূরণ করা। টমাসন অবশ্য লিখিত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ছাড়া আর্থিক ক্ষতিপূরণে সন্মত হন নি।

জমিদার নীলকরা দ্বিবার্ষিকের কথা বলা হল কিন্তু তাদের অধীন এদেশীয় মধ্যবিত্ত কর্মচারী কীটদের কথা, বধা নায়েব গোমস্তাদের কথা বলা হল না। জমিদাররা যেহেতু আমোদ প্রমোদবিলসে কলকাতা শহরে কালাতিপাত করতেন, তাঁদের নায়েব গোমস্তা-রাই ছিলেন হর্তাকর্তা। কলকাতায় জমিদারদের জীবনযাত্রার বর্ণনা স্বর্ণত 'হুতোম' কিঙ্কি দিয়েছেন, যেমন 'হুতুমবালা ফেটিং গাড়ি চড়া, পাচালি বা চতীর গানের পেলেদের মতন চেহারা, মাথায ফ্রেনের চাঁদর জড়ানো, জন দশ বারো ঘোঁসাহেব সঙ্গে,

294006

বাইজানের ডেডুয়ার মত পোশাক, গলায় মুক্তার মালা— দেখলেই চেনা যায় যে ইনি একজন বনগাঁর শেয়াল রাজা, বৃদ্ধিতে কান্দ্রীয়া গাধার বেহন্দ, বিজ্ঞান যুগ্মিতমান যা। বিসর্জন, বারোইয়ারি, খামটা নাচ আর কুমুদের প্রধান ভক্ত। মধ্যে মধ্যে খুনি মামলার প্রেরণারী ও মহাজনের ডিক্রীর দরুন গা ঢাকা দেন।' অথবা 'কেউ কান্দ্রীপুর, বোড়তা, ডাবানীপুর ও কালীঘাটে বাসা করে, চক্ৰিশ ঘণ্টা সোনাগাজীতেই কাটান, লোকের বাড়ি চড়ায়া হয়ে দাঙ্গা করেন, তার পরদিন প্রিয়তমার হাত ধরে যুগলবেশে জ্যাঠা খুড়ী বাবার সঙ্গে পুলিশে হাজির হন, ধারে হাতী কেনেন' এবং তাঁদের দালালবাবুরা 'গাড়ির যোগাড় করা, খামটা নাচের বায়না করা প্রভৃতি রকমওয়ারি কাজের তার পান ও পলিটিকেল এজেন্টের কাজ করেন।' ওদিকে গ্রামের জমিদারীতে নায়েব গোমস্তার পলিটিকাল এজেন্টের কাজ করেন, যেমন কৃষ্ণদেব রায় যখন কলকাতায় ছিলেন তখন তাঁর নায়েব রামধন সরকার তিভুমীরের দলের খবরাখবরের জ্ঞত পেছাদা পাঠান, খানার দারোগার কাছে একটার পর একটা মিথ্যা অভিযোগ ক'রে তাদের নানাভাবে নাজেহাল করতে থাকেন। এই 'ব্যাগ্রসম নিষ্ঠুর স্বভাব' 'নিত্যন্ত নির্মায়িক' জমিদারদের কর্মচারী নায়েব গোমস্তাদের চরিত্র বর্ণনা ক'রে বলা হয়েছে, 'কুশ্রামীর নিরুপিত ভাগ আত্মরপের পূর্বকই আপনাপন ভাগ গ্রহণ করে এবং স্বেচ্ছাযত্নে হস্তাচ্ছল পাইলেই প্রভার ধন হরণ করিতে থাকে। বনচর ব্যাঘ্র বরাহ তাহাদের অপেক্ষায় কত অনিষ্ট করিতে পারে?' কেবল নায়েব গোমস্তার নন, 'কুশ্রামীর সংসার সংক্রান্ত কোন ক্ষুদ্র কর্মেও যিনি নিযুক্ত থাকেন, তাহার প্রভাবের আর পরিসীমা থাকে না, ব্যাঘ্র-সরকারও রাজার তুল্য প্রভুত্ব ও পরাক্রম প্রকাশ করে।' পাইক-বরকন্দাজরাও। তাছাড়া 'দারোগা ও তৎ-সংক্রান্ত কর্মচারীদের প্রসিদ্ধ দুর্ব্যবহার শ্রমণ করিলে হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হইতে থাকে' এবং 'দারোগার দীর্ঘোদর পূরণার্থে' প্রজাদের নানারকমের নির্যাতন ভোগ করিতে হয়। মহাজনরা তো আছেই এবং 'মহাজন সংজ্ঞক বিষয় বৈজ্ঞের হস্তে পতিত হইলে নিষ্কৃতির পথ এককালে রুদ্ধ হয়।'

জমিদার নীলকর নায়েব গোমস্তা সরকার পাইক বরকন্দাজ দারোগা পুলিশ মহাজন নিয়ে গ্রামসমাজের যে সর্বগ্রাসী শোষক-উপশোষকশ্রেণী, ব্রিটিশ শাসকদের রাজ-দণ্ডপ্রাপ্ত, সেই শ্রেণীর বিরুদ্ধেই তিভুমীরের বিদ্রোহ ও সংগ্রাম। শোষক ও উপ-শোষকদের মধ্যে শতকরা পঁচানব্বইজন যদি হিন্দু হয়, এবং শোষিত কৃষক কারিগরদের মধ্যে যদি শতকরা নব্বইজন মুসলমান হয়, কোনো বিশেষ ভৌগোলিক অঞ্চলে, তাহলে অবশ্যই পরিসংখ্যানতত্ত্বের নিয়মামুসারে, সেখানকার শোষকদের বিরুদ্ধে শোষিতদের সংগ্রামকে হিন্দুর বিরুদ্ধে মুসলমানের সংগ্রাম বলা যায়, অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক হান্ধামা বলা যায়, যা অনেক পণ্ডিত বলেছেন তিভুমীরের বিদ্রোহ সম্পর্কে। যদিও তিভুমীরের বিদ্রোহ যে কৃষকবিদ্রোহ এবং তাঁর সংগ্রাম যে সেকালের শ্রেণীসংগ্রাম তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

কিন্তু তিতুমীরের 'ধর্ম' যে একটা ছিল এবং তিনি রীতিমতো গোঁড়া মুসলমান ছিলেন, তাতেও কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। যদিও সেই ধর্মগোড়ারি ছিল অন্তরকমের। যেসকলেরই হোক, নিম্নাংকার তাঁকে 'ধর্মোন্মত্ত মুসলমান' বলে বিশেষ কুল করেন নি। কিন্তু তিতুমীরের এই ধর্মীয় 'উন্মত্ততার' স্বরূপ কী? সাধারণ মোল্লামোলবীদের উন্মত্ততার সঙ্গে তার একটা পার্থক্য ছিল এবং গভীর পার্থক্য। কিসের পার্থক্য? তিতুমীর ছিলেন সৈয়দ আহমদ শহীদেবের অস্থগামো 'ওয়াহবী' আদর্শপন্থী। ওয়াহিবইজম বা ওয়াহিববাদ কী? ইসলামের মধ্যে এমন একটি ধর্মগোড়ী গারা নিজেদের মহম্মদের আদেশ ও উক্তির অকৃত্রিম ধারকবাহক মনে করতেন, ইসলামীয় আদর্শের কঠোর শুদ্ধাচারে বিশ্বাস করতেন এবং গারা তা করতেন না (মুসলমান হলেও) তাঁদের বিধর্মী কাকেরের মতো শত্রু ভাবতেন, তাঁদেরই ওয়াহবীপন্থী গলা হতো। ইসলামের ইতিহাসে এরকম উগ্র শুদ্ধাচারপন্থী ধর্মগোড়ীর উদ্ভব আরবদেশে ওয়াহবীদের আগেও হয়েছে। ইসলামের ইতিহাসের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত (সৈয়দ আমীর আলি) ওয়াহবীদের ভূমিকা সম্বন্ধে বলেছেন: 'However commendable their revolt against the anthropolatrous usages in vogue among the modern Moslems, their views of religion and divine government...are intensely morose and Calvinistic, and in absolute conflict with progress and development.'। ওয়াহবীদের সম্বন্ধে এই উক্তি একদিক থেকে মিথ্যা নয়, অন্যদিক থেকে অর্ধসত্য। খ্রীষ্টধর্মের ইতিহাসে Protestantism-এর যদি কোনো প্রগতিশীল ভূমিকা থাকে, এবং আছে বলেই পণ্ডিতেরা স্বীকার করেন, যদিও অ্যানা-ব্যাপটিস্ট কোয়েকর ব্যাপ্তিভিনিস্ট প্রভৃতি বহু গোষ্ঠিতে তা বিভক্ত ছিল, তাহলে ইসলামের ইতিহাসে প্রটেস্ট্যান্ট ওয়াহবী ও অস্বরূপ ধর্মগোড়ীরও একটা প্রগতিশীল ভূমিকা আছে। এমন কি একথা বললেও অত্যুক্তি হয় না বোধহয় যে হিন্দুধর্মের ইতিহাসে শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদের অথবা উনিশ শতকে রামমোহনের অদ্বৈতবাদী ব্রাহ্মধর্মের যদি কোনো প্রকার প্রগতিশীল ভূমিকা থাকে, তাহলে সৈয়দ আহমদ শহীদ ও তিতুমীর (রামমোহনের সমসাময়িক) অস্বরূপ ওয়াহবীবাদেরও অস্বরূপ ভূমিকা আছে ইসলামের ইতিহাসে। অন্তত আমাদের দেশ ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, অতএব সামাজিক ক্ষেত্রেও।

আগলে কিন্তু আরবদেশের আবদুল ওয়াহব নন, আমাদের দেশের শাহ ওয়ালি-আজা (১৭০৩-৬২) ইসলামের এই ধর্মসংস্কার আন্দোলনের প্রবর্তক। ওয়ালি-আজা ও ওয়াহব সমসাময়িক সংস্কারক ছিলেন এবং ওয়ালি-আজা হয়ত হিজাজে শায়াখ্যয়ন-কালে ওয়াহবের ধর্মগুরুদের কাছ থেকেই শিক্ষালাভ করেছিলেন, কিন্তু এমন কোনো সঠিক প্রমাণ নেই যে তাঁরা কেউ কারো দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। ওয়াহবের মতো ওয়ালি-আজাও প্রায় একই ধর্মমত পোষণ করতেন এবং উভয়েই ধর্মাদর্শের দিক থেকে 'fundamentalist' অর্থাৎ অকৃত্রিম মূলধর্মাবলম্বী ছিলেন। উভয়েই ইসলামধর্মের

মনোরম বাগিচা থেকে সমস্ত আগাছা পরগাছা জ্ঞাতল আবর্জনা নির্মমভাবে নির্মূল করার পক্ষপাতী ছিলেন। যেমন ওয়াহবেদর মতো ওয়ালি-আল্লা যোর একেশ্বরবাদী ছিলেন এবং 'শিবুক' বা বহুদেবতাবাদের সঙ্গে কোনোপ্রকারের সংস্পর্শ সর্বতোভাবে নিষ্পনীয় ও বর্জনীয় মনে করতেন। ঈশ্বর ও মাহুঘের মধ্যবর্তী কোনো পীরপয়গম্বরাদি কেউ নেই, যেমন হিন্দুদের বহুদেবতার সঙ্গে আছে বহু অবতার, পুরোহিত ইত্যাদি। অতএব পীরপয়গম্বর গাজী ফকির প্রভৃতি পুজা অথবা মহরম ফযত ইত্যাদি উৎসব বা ধর্ম্যাচার পালন ইসলামধর্মের পরিপন্থী। ঈশ্বর ঈশ্বর, মাহুঘ মাহুঘ, মধ্যবর্তী তুরে আর কিছু নেই। ইসলামধর্মের এইটাই মূলকথা। মোগল রাজশক্তির পতনের পর এবং ব্রিটিশ রাজত্বের প্রতিষ্ঠার পর যখন ভারতের মুসলমানসমাজের সর্বাঙ্গিক সংকট, ধর্ম রাষ্ট্র সমাজ অর্থনীতি ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে প্রকট হয়ে উঠল, যখন দেখা গেল যে মুসলমানরা কেবল পীরপয়গম্বর ফকিরগাজীর পুজা নয়, ওলাবিবি থেকে সত্যাপীর-মানিকপীরের পর্যন্ত পুজা করছে, অসংখ্য পরীস্থান দরগা ইত্যাদি গজিয়ে উঠছে, যখন দেখা গেল যে রাষ্ট্রীয় শক্তি হাতছাড়া হবার ফলে মুসলমানরা সর্বক্ষেত্রে অবহেলিত অপমানিত ও নতুন ইংরেজরাজের শত্রু বলে বিবেচিত হচ্ছে অথচ মহরম ফযত ইত্যাদি উৎসব অস্থগান চলছে তখন ভারতীয় ওয়ালি-আল্লা অথবা আরবের ওয়াহবেদর মৌল ইসলামধর্মে প্রত্যাবর্তনের আহ্বান এবং বিধর্মী কাকেরদের বিরুদ্ধে জিহাদের আওহাজ, ভারতের ঐতিহাসিক পরিবেশে অবশ্যই প্রগতিশীল ছিল, কারণ তার বাহ্য ধর্মীয় পোশাকের অন্তরালে ছিল ইংরেজরাজের বিরুদ্ধে এবং তাদের রাজত্বভাষিত উপশাসক ও শোষকদের বিরুদ্ধে (প্রধানত হিন্দু) বিদ্রোহের আহ্বান। কাজেই ওয়ালি-আল্লাবাদ অথবা ওয়াহবিবাদের যে তৎকালে একটা প্রগতিশীল ঐতিহাসিক ভূমিকা ছিল তা কোনোমতেই অস্বীকার করা যায় না। করা যায় না বলে কিছু নেই অবশ্য, সবই করা যায়, দিনকে রাত এবং রাতকে দিন, বানরকে নর এবং নরকে বানর, সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য, কিস্ত করলে তাতে ফায়দা কিছু হবে না, কেবল মিথ্যার গোলকধাঁধায় ঘুরে মরতে হবে শেষ পর্যন্ত।

ওয়ালি-আল্লার স্ত্রোযোগ্য পুত্র শাহ আজিজ পিতার ধর্মাদর্শের উত্তরাধিকারী হন এবং সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী তাঁর শিষ্য গ্রহণ করেন। সৈয়দ আহমদের ধর্মাদর্শন 'মুজাহিদীন' (ধর্মযোদ্ধা) নামে খ্যাত, কিন্তু ব্রিটিশ সরকার ভুলক্রমে এই আন্দোলনকে 'ওয়াহবী' বলে চিহ্নিত করেছেন : 'A remarkable disciple of Aziz was Sayyid Ahmad Brelwi, whose movement is generally known as that of the Mujahidin (holy warriors) and is erroneously described in the British Indian Government Records as Wahhabi.' (Aziz Ahmad)। মুখ্যত শিখদের বিরুদ্ধে এবং দ্বিতীয়ত ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে সৈয়দের ধর্মযুদ্ধ। এই আন্দোলনই হল ওয়ালি-আল্লার মৌল ইসলামধর্মে প্রত্যাবর্তনের প্রথম প্রত্যক্ষ সক্রিয় আন্দোলন এবং তাঁর ধর্মসংস্কারের আদর্শকে কর্মক্ষেত্রে বাস্তবায়িত

করার প্রথম প্রচেষ্টা। এই ধর্মযোদ্ধারা একেশ্বরবাদের আদর্শের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন। আন্দোলনের ফলে ক্রমে এঁদের মধ্যে ‘জুম্মা’ বা ধর্মীয়-রাজনৈতিক সংগঠনের (‘religio-political organization’) বিকাশ হতে থাকে এবং দেশব্যাপী প্রচারের জন্য নানাস্থানে কেন্দ্র বা ঘাটি স্থাপিত হয়। ‘গ্রাম’ হয় সংগঠনের মূলকেন্দ্র। ভারতে ইসলামধর্মের ইতিহাসে এইটাই হল প্রথম ব্যাপক গণসংগ্রামের বা গণআন্দোলনের প্রচেষ্টা। (‘It was the first agitation in the history of Indian Islam to become a popular mass movement. — Aziz Ahmad’)।

বাংলা দেশে শরিয়ৎ-আজা (১৭৬৪-১৮৪০) ও তার পুত্র দুহুর্মিকার গণআন্দোলনের সঙ্গে (ফরিদপুর জেলায়) সৈয়দ আহমদ শহীদে মুরাহিদীন আন্দোলনের কোনো সম্পর্ক নেই, বরং শরিয়ৎ বা দুহুর্মিকার আন্দোলনে খানিকটা ওয়াহাবীদের প্রভাব ছিল বলা যায়। কিন্তু তিতুমীরের আন্দোলন ছিল ওয়ালি-আজা, আজিজ ও সৈয়দ আহমদ শহীদে মুরাহিদীন আন্দোলনের ধারাহুগামী এবং সেইজন্য সেই আন্দোলন ছিল অনেক বেশি ‘militant’ বা সংগ্রামমুখী :

...Possibly bearing some influence of the Wahhabi movement of Nejd, was the Faraidi movement of Bengal led by Hajji Shari'at-Allah (1764-1840) — and his son Muhsin, known popularly as Dhudhu Miyan...

A similar fundamentalist peasant movement in Bengal, led by Titu Mir, was connected with that of the Mujahidin and not with the Faraidis. It's programme was more militant... (Aziz Ahmad).

ভারতের ওয়ালি-আজা, আজিজ, সৈয়দ আহমদ শহীদ এবং আরবের আবদুল ওয়াহবে ধর্মাদর্শের বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্যের চুলচেরা বিশ্লেষণ করা আপাতত আমাদের উদ্দেশ্য নয়। ‘Fundamentalist’ আন্দোলন হিসেবে ওয়ালি-আজার সঙ্গে ওয়াহবে ধর্মাদর্শের সামান্য স্বীকার করা যায় না। কিন্তু তিতুমীরের ধর্মআন্দোলন প্রসঙ্গে উল্লেখ্য হল এই যে তিনি সৈয়দ আহমদ শহীদে মুরাহিদীন ‘মিলিটারি’ ধর্মাদর্শের অহুগামী এবং কেবল তাই নয়, এই আন্দোলনের গ্রামভিত্তিক সংগঠন এবং তার ব্যাপক গণআন্দোলনে রূপায়ণে বিখ্যাত।

এই প্রসঙ্গে পরবর্তী প্রশ্ন হল, ইসলামের মৌল আদর্শের পুনরুদ্ধার শুধু কি কতকগুলি উৎসবআচারঅনুষ্ঠানের সংস্কারসাধনের মধ্যে সীমাবদ্ধ? অথবা ইসলামের সামাজিক আদর্শের বিকৃতি ও অবনতির বিরুদ্ধে সংগ্রামও তার লক্ষ্য! ইসলামের মৌল সামাজিক আদর্শ কী? শাসক-প্রজা ধনী-নির্ধন প্রভু-ভূতা প্রভৃতি সকল প্রকারের বিভেদবৈষম্য বর্জন করে মানুষের সঙ্গে মানুষের সামান্যত্ম্যের সম্পর্ককে শ্রেষ্ঠ সত্য বলে স্বীকার করা। যিনি তা স্বীকার করতে কুণ্ঠিত তিনি ইসলামধর্মী মুসলমান বলে অভিহিত হবার

অযোগ্য এবং মুসলমান হলেও বিধর্মী 'কাফেরের' মতো অবজ্ঞাভরে পরিচালিত :

Islam recognises no distinction of race or colour ; black or white, citizens or soldiers, rulers or subjects, they are perfectly equal, not in theory only, but in practice. In the field or in the guest-chamber, in the tent or in the palace, in the mosque or in the market, they mix without reserve or without contempt. The first Muezzin of Islam, a devoted adherent and an esteemed disciple, was a negro slave... The whole tenor of Moham-med's teaching made 'permanent chattelhood' or caste impossible ; and it is simply 'an abuse of words' to apply the word slavery, in the English sense, to any status known to the legisla-tion of Islam. — Syed Ameer Ali.

এই যদি ইসলামের আদি অকৃত্রিম আদর্শ হয় এবং তিতুমীর যদি সেই নিফলক আদর্শের প্রচারক হন, তাহলে 'ধর্মোন্মত্ত' তিতুমীরের ধর্মোন্মত্ত খুব স্বাভাবিকভাবেই সামাজিক সাম্রাজ্যের সংগ্রামের পথে পরিচালিত হতে পারে। অন্তত পরিচালিত হবার পথে কোনো বাধা নেই। কারণ নানারকমের পৌত্তলিক অথবা বহুদেবতাবিশ্বাসী আচার-অহুষ্ঠানের মতো মুসলমানসমাজে জাতিভেদ ধর্মোনির্ভেদে কুশীদহনাকালোড ইত্যাদির অহুপ্রবেশের চেয়ে চরম নিন্দনীয় কাফেরী আর কি হতে পারে তা ভাবা যায় না। যে ধনিক মুসলমান দরিদ্রদের শোষণ করেন, নির্যাতন করেন, যে মুসলমান কুশীদহনী ও নুনাকালোডী, যে মুসলমান বংশগৌরবের মহিমায় বর্ণবৈষম্যানীতির সমর্থক, তাঁরা মুসলমান হলেও ভিন্নধর্মীদের তুলনায় অনেক বেশি নিকটাত্মীয় কাফের নন কি! অন্তত ইসলামের মৌল আদর্শের দিক থেকে বিচার করলে (যে আদর্শ পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংকল্প তিতুমীর গ্রহণ করেছিলেন) তাঁরা কাফের এবং তিতুমীরে ধর্মসংস্কারসংগ্রাম তাই হিন্দুমুসলমান উভয়সম্প্রদায়ের কাফেরদের বিরুদ্ধে সামাজিক গণসংগ্রামের রূপ ধারণ করেছিল। সেই কারণে তিতুর সংগ্রামে ধর্মীয় ভাড়া প্রকাশের জন্য কোনো ধনিক মুসলমান কেউ যোগদান করেন নি, এমন কি তাঁর নিকটাত্মীয় মুনশী উমীর পর্যন্ত না। সেক্ষেত্রে কলকাতা তাঁর রিপোর্টে উল্লেখ করেছেন। এই গণসংগ্রাম যে মিলিটারি সংগ্রাম সংগ্রামে পরিণত হয়েছিল, তার পর্যাপ্ত প্রমাণ পূর্বোক্ত সরকারী দলিলপত্রে পাওয়া যায়। একথা ঠিক যে তিতুমীর একটা স্বর্ণীয় সামরাজ্য প্রতিষ্ঠার আশাস দিয়েছিলেন বিদ্রোহী সংগ্রামীদের, হয়ত তিনি বলেছিলেন যে বিদ্রোহ সফল হলে এই হিন্দুমুসলমান কাফেরদের সমাজের নরকযন্ত্রণা আর ভোগ করতে হবে না, আল্লাহ বেহেশত স্থাপিত হবে, যেখানে কোনো রকমের সামাজিক ভেদাভেদ বৈষম্য অসম্ভব শোষণ নির্যাতন ইত্যাদি থাকবে না এবং গোদার আকাঙ্ক্ষিত ধর্মরাজ্য গড়ে উঠবে। কিন্তু একথাও ঠিক এবং তা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার যে তিতুমীরের কালে,

প্রাকরাষ্ট্রনৈতিক যুগে (pre-political age), অধিকাংশ গণবিদ্রোহ ও কৃষকবিদ্রোহের এই ধরনের একটা *millenarian* রূপ ছিল, যার স্বল্প ধর্মরাজ্য স্থাপনের একটা 'জিগীর' এই সময়ত বিদ্রোহের নায়কদের কণ্ঠে ধ্বনিত হতো, এমনকি অনেকে সাক্ষ্যে ভগবানের রূপ ধারণ করতেন, যেমন ভগবান বিরশা যুগে অথবা সীওতাল বিদ্রোহে সিংহ। কানক চাঁদু ভৈরবেরা করেছিলেন। কিন্তু এই ধরনের ধর্মরাজ্যের জিগীরধ্বনিত (millenarian) গণবিদ্রোহের প্রকৃত ঐতিহাসিক চরিত্র হল 'বৈপ্লবিক' (Revolutionary), সংস্কারমুখী (Reformist) নয়। উনিশ শতকে ইয়োরোপের একাধিক কৃষকবিদ্রোহ, বিদ্রোহের নায়ক, দস্য ও দস্যবৃত্তির (banditry) ইতিহাস পর্যালোচনা করে হনসবম ও (E. J. Habsbawm) সেই কথা বলেছেন : 'The various millenarian movements with which I deal...differ from banditry and *Mafia* because they are revolutionary and not reformist...' উনিশ শতকে প্রাকরাষ্ট্রনৈতিক যুগে ভারতের কৃষকবিদ্রোহগুলির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এট ঐতিহাসিক সত্য হনসবম-এর কাছে আরো স্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হতো, কারণ ইয়োরোপ ও ভারতের সামাজিক অর্থনৈতিক পরিবেশের মধ্যে পার্থক্য অনেক।

তিতুমীরকে কেবল ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতাসংগ্রামের শহীদরূপে চিত্রিত করলে তাঁর বিদ্রোহ ও সংগ্রামের চরিত্রকে বিকৃত করা হয়। মুখ্যত এই সংগ্রাম ছিল ক্ষমিদার-নীলকর-মহাজনদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, অর্থাৎ জাতিবর্ণ নিষিদ্ধে সমাজের শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং ইংরেজ শাসকরা এই শোষকশ্রেণীর জনক ও পালক বলে স্বভাবতই তা ইংরেজ শাসকবিরোধী সংগ্রাম হতে বাধ্য। একথা যদি সত্যি হয় যে 'The history of all hitherto existing society is the history of class-struggles', তাহলে আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজে রাজনৈতিক চেতনাবদ্ধ প্রলেটারিয়েটের শ্রেণীসংগ্রামের পূর্বকার কালে শ্রেণীসংগ্রাম যে বৈশিষ্ট্য স্বতন্ত্রা দুর্বলতা ও দোষ-ত্রুটি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে পারে, আমাদের মতো অতুল্য কৃষকপ্রধান সমাজে, তিতুমীরের সংগ্রাম তারই একটি উজ্জল দৃষ্টান্ত। কলভিন তদন্ত করে তাঁর রিপোর্টে পরিবার ভাষায় লিখেছিলেন যে 'No one with anything to lose' তিতুমীরের দলভুক্ত ছিলেন। তিতুমীর যখন সংগ্রাম করেছিলেন এবং ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট কলভিন যখন তাঁর রিপোর্টে লিখেছিলেন, ১৮৩১ সালে, তার সতের বছর পরে 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো' (১৮৪৮) প্রকাশিত হয়েছিল। তা হলেও কলভিনের 'No one with anything to lose' উক্তির সঙ্গে ম্যানিফেস্টোর 'but their chains' কথাটি যোগ করে দিলে তিতুমীরের দলভুক্ত হাজার হাজার বিদ্রোহী মুজাহিদীনদের শ্রেণীরূপ সম্পষ্ট হয়ে ওঠে। তারা হল বারাসাত-শরিহাট ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সর্বস্বান্ত দরিদ্র চাষী, প্রধানত মুসলমান। ১২৭৩ সালেও, অর্থাৎ ১৪২ বছর পরেও, তাদের বাংশধরদের চেনা যায়। বাংশধরদের সংখ্যা অনেক বেড়েছে, তার সঙ্গে দারিদ্র্যও বেড়েছে। তিতুমীর নেই।

তিতুমীরের সংগ্রাম স্বল্পকালস্থায়ী হলেও, তার তাৎপর্য নানাদিক থেকে দীর্ঘস্থায়ী। সংগ্রামের নায়ক হিসেবে বিদ্রোহীদের সংগঠনের দক্ষতাও ছিল তাঁর অসাধারণ। সরকারী রিপোর্টে, নারকেলবেড়িয়ায় হুসংহত জমাজেতের বর্ণনায়, তা একাধিকবার প্রকাশ পেয়েছে। বিদ্রোহীদের সংগ্রাম-পারদর্শিতাও সরকারী দলিলপত্রে স্বীকৃত। হাতি-ঘোড়াবজরা সেপাইবরকন্দাজবন্দুক নিয়ে নীলকর ও ভেলাশাসকরা একাধিকবার তিতুমীরের মুজাহিদীদের ঘারা তাড়িত হয়ে প্রাণ নিয়ে পলায়ন করেছেন এবং সেই পলায়নের রোমাঞ্চকর কাহিনী বর্ণনাকালে বিদ্রোহীদের বীরত্ব সাহস ও রণদক্ষতার কথা উল্লেখ করেছেন। তখন বেস্টিনের শাসনকাল। সতীদাহনিবারণ আইন পাস ক'রে তিনি তখন মহাহুডব উদার শাসকের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত। সেই কথা উল্লেখ ক'রে ক্রীতামপুরের ব্যাপটিষ্ট মিশনের কেউ, মনে হয় মার্শম্যান, ছদ্মনামে (A Proprietor of East India Stock, Serampore, Nov. 1831) *India Gazette* পত্রিকায় একটি দীর্ঘ চিঠি লেখেন (২৫ নভেম্বর ১৮৩১ তারিখে প্রকাশিত 'Barraset Insurrection' নামে)। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে, নির্মম বাণবিজ্ঞপ ক'রে পাত্রি সাহেবের এই পত্রক্ষেপ করার কারণ হল, তিনি কল্পনা করতে পারেন না কেমন ক'রে 'within half an hour's ride of the country residence of the Supreme Governor of British India' একদল সশস্ত্র দুর্বৃত্ত ('armed ruffians') এত-বড় একটা সাংঘাতিক কাণ্ড ক'রে ফেলতে পারে, যার ফলে স্থানীয় শাসকদের পর্যন্ত হুঙ্কার হয় ('for some time a successful rebellion in the very heart of the empire')। ঘাই হোক, রাগের মাথায় পাত্রি সাহেব কয়েকটি অপ্রিয় সত্য প্রকাশ ক'রে ফেলেছেন তাঁর চিঠিতে। যেমন তিতুমীর ও তাঁর সহযোগীরা 'মুক্তাকলের' মতো একটা এলাকা গড়ে তুলে কিভাবে নিজেরা তার 'শাসক' হয়ে কাজকর্ম চালাজিলেন, তার উল্লেখ চিঠিতে আছে। পাত্রি সাহেব চিঠিতে লিখেছেন :

Sheik Teetoo begins by plundering a considerable portion of two districts, which he modestly calls his collection of the land revenue ; and assuming the title of Commissioner, he actually sets about organizing something of regular form of civil government. I am credibly informed Sir, that for some days Sheik Teetoo held his cuacherry with a regularity...which some of the Company's functionaries might do well to imitate.

'শেখ তিতু প্রথমে দুটি জেলা জুড়ে (নদীয়া, চব্বিশ পরগনা) সূর্যতরাঙ্ক আরম্ভ করে এবং বলে যে এটা নাকি তার রাজত্ব আদায়ের ব্যাপার। তারপর বিভাগীয় কমিশনারের মতো (অথবা 'বাদশাহ'ও বলা যেতে পারে) সে নিয়মিত 'আঞ্চলিক শাসনের কাজ-কর্মও আরম্ভ ক'রে দেয়। বিশেষতঃ জেনেছি যে এমন হৃদয়লভ্যভাবে সে তার কাছারিতে এই শাসনসংক্রান্ত কাজকর্ম করে যা কোম্পানির অধীন শাসক ও কর্মচারীরা স্বচ্ছন্দে

অস্বকরণ করতে পারেন।'

শাসনকার্যে পারদর্শিতা সত্ত্বে এই প্রশংসা জানি না তিতুমীরের এবং তাঁর সহ-কর্মীদের জ্ঞান্য প্রাপ্য কি না, তবে পানিকটা যে প্রাপ্য তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কারণ শ্রীরামপুরের ব্যাপটিষ্ঠ মিশনারিরা, এবং অজ্ঞাত মিশনারিরাও, বাংলার গ্রামাঞ্চলের ভিতরের গণরাশির অনেক ক্ষেত্রে জেলাশাসকদের চেয়ে বেশি রাখতেন। কাজেই শ্রীরামপুরের ছদ্মবেশী পত্রলেখক এখানে শুধু ইংরেজ শাসকদের অপদার্থতার বিরুদ্ধে ক্রোধ প্রকাশ করেন নি, পানিকটা সত্য ঘটনাও প্রকাশ করেছেন। তিতুমীরের প্রভাব এবং গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক গণদমণনের কথা জেলাশাসকরা অর্থাৎ আলেকজান্ডার ও হিগ উাদের চিঠিপত্রে প্রসঙ্গত ইঙ্গিত করেছেন যাত্র, কিন্তু সেটা যে গণদঃগ্রামের *base area* হিসেবে যেটে বিদ্রুত ও সংগঠিত ছিল তাতে সন্দেহ নেই। তা সবেও মারকেন-বেড়িয়ায় তিতুমীরের শস্ত্র জমাতের সংগ্রাম ব্যর্থ হল এবং বাঁশের কেলা ধূলিসাৎ হয়ে গেল।

সংগ্রাম বা প্রত্যাক নড়াইয়ের কলাকৌশল সত্ত্বে বলা যায় যে তিতুমীর নিজে একজন অত্যন্ত হৃদয় সাহসী বীর বোঝা ছিলেন, কেবল আত্মার কুদ্রং তাঁর সম্বল ছিল না অর্থাৎ কেবল ধর্মীয় মায়িকের জোরে তিনি তাঁর গণসংগ্রামে নায়কত্ব করেন নি। গোলন্দাজ ম্যাকানকে গুলি করে খতম করেন তিতুমীর নিজে এবং জেলাশাসক আলেকজান্ডারের কানের পাশ দিয়ে যে গুলিটা বিদ্যুৎবেগে বেরিয়ে যায় সেটাও তিতুমীর লক্ষ্য করে ছুঁড়েছিলেন। কেবল লাঠি সড়কি ভলোয়ার প্রভৃতি দেশীয় হাতিয়ার নয়, শস্ত্রের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া কয়েকটা কামান-বন্দকের হৃদয় ব্যবহারও তিনি নিজে শিখেছিলেন এবং তাঁর শাগরেদদেরও শিখিয়েছিলেন। নগাঁয়ার জেলাশাসক সিং বনগার মিলিটারি কম্যান্ডারকে লিখিত একটি পত্রে (ফৌজদারী আদালত, নগাঁয়া, ১৯ নভেম্বর ১৮৩১) এ বিষয়ে যা লিখেছেন তা লক্ষণীয় :

What their arms are beyond an immense long lathe (stick) and some swords, I cannot say, but report stated them to be in possession of some muskets...besides various native w. apons of offence used by Dakoyts and Robbers, and certainly they appeared very expert in the use of the arms they had. The information we gathered from spies and others...and had we not been misled by some of their party, who came in disguise, pretending to be our friends...

কেবল অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারের দক্ষতা নয় (যার জ্ঞান রীতিমতো ট্রেনিং দেওয়ার নিশ্চয় ব্যবস্থা ছিল), তিতুমীর তাঁর শস্ত্রপক্ষের গোয়েন্দাদের মতো নিজেদের গোয়েন্দার দল গঠন করেছিলেন এবং তারা ছদ্মবেশে বন্ধু সেজে একাধিকবার শত্রুদের ভুল খবরাখবর

দিয়ে ফাঁদ কেলেছে। মনে হয় না কোনোদিক থেকে তিতুমীরের গণসংগ্রামের সংগঠনের কোনো গন্ডি ছিল। নারকেলবেড়িয়ায় বাঁশের কেন্দ্রায় তিতুমীর ও তাঁর সহযোগীদের চূড়ান্ত লড়াইও অতীতপূর্ব মনে হয়। পাত্রি সাহেব তাঁর চিঠিতে লিখেছেন : 'Sheik Teetoo...fell with his arms in his hand, after having resisted for about an hour and a half a large and well-appointed military force.'। হিন্দু জমিদারদের এবং তাঁদের নায়েব গোমস্তা-দালালদের প্ররোচনায় দাড়িগুরুমসজিদ-মন্দিরমোজাপুরুতাদি ধর্মীয় প্রতীকী সংঘাতের ভিতর দিয়ে যে লড়াইয়ের স্বরূপাত, তাকে একটি ব্যাপক গণসংগ্রামে পরিণত করেছিলেন তিতুমীর এবং বীর নায়েকের মতো। শোলকেন্দ্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে শেষ পর্যন্ত নিজে লড়াই করতে করতে তিনি নিহত হয়েছিলেন। কামান-বন্দুকাদি আগ্নেয়াস্ত্রে হস্তশস্ত্রিত গোরা সৈন্যের সঙ্গে গ্রধানত দেশীয় অস্ত্রবলের উপর ভরসা করে দরিদ্র কৃষকদের পক্ষে, বাঁশঝাড় আর সাধারণ গাছপালা বেষ্টিত বাঁশের কেন্দ্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে মুখোমুখি লড়াই করা যে-কোনো সামরিক নীতির দিক থেকে বিশ্বকর মনে হয়। কিন্তু সশস্ত্র গণসংগ্রাম বা গণ-প্রতিরোধের ইতিহাসে এরকম দৃষ্টান্ত বিরল নয়, আমাদের দেশেও নয় অথবা অন্ত কোনো দেশেও নয়, সেকালের প্রাক-রাজনৈতিক যুগেও নয়, একালের রাজনৈতিক যুগেও নয়। তৎসঙ্গেও তিতুমীরের সংগ্রাম বার্ষ হয়েছে, তিনি ও তাঁর সহযোগীরা বাঁশের মতো লড়াই করেও পরাজিত হয়েছিলেন এবং নারকেলবেড়িয়ায় বাঁশের কেন্দ্র আগ্নেয়াস্ত্রের আগুন পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। কেন ?

কেন তিতুমীরের বিদ্রোহ ও গণসংগ্রাম বার্ষ হয়েছিল তাঁর বিচারবিলেপণ তাঁরাই ভাল করতে পারবেন বাঁশের এরকম সংগ্রামের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। বিভিন্ন দেশে প্রাক-রাজনৈতিক ও রাজনৈতিক যুগের কৃষকবিদ্রোহ ও গণসংগ্রামের বার্ষতা ও সাক্ষ্যের লিখিত ইতিহাসের বিখ্যাত থেকে তিতুমীরের বার্ষতার 'কারণ' কয়েকটি আমরা নির্দেশ করতে পারি মাত্র। যেমন আমাদের মনে হয়

প্রথম কারণঃ কোনো স্থানিষ্ঠ আদর্শগত 'রাজনৈতিক' চেতনার অভাব। তিতুমীরের কালে এরকম কোনো রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ হয় নি দেশের জনসাধারণের মধ্যে। বাঁশের মধ্যে হবার কথা অথবা সামান্য কিছু হয়েছিল, বাংলার নব্যধনিক ও নব্যবিত্তরা, তাঁরা তখন ইংরেজ শাসকদের কাছে নিরোদের অন্ধ রাজভক্তি ও গোলামির দাসত্ব নিয়ে দিয়ে, স্পেন বা ফ্রান্স বা অন্য কোনো দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সাক্ষ্যে উল্লাস প্রকাশ করছেন, ডোজসভায় ইংরেজদের আপ্যায়ন করে। ব্রিটিশ পাদপদে জাতীয় সত্তা ও ব্যক্তিসত্তার এরকম বিনদূশ বিনমর আমাদের 'নবজাগরণের' ইতিহাসে একটা অত্যন্ত ঘটনা। ১৮৩০-৩১ সালে তিতুমীরের বিদ্রোহ কলকাতা শহর থেকে 'half an hour's ride'-এর মধ্যে ঘটলেও এবং ব্রিটিশ শাসকদের মধ্যে যথেষ্ট কম্পন সৃষ্টি করলেও, এদেশীয় নব্যঅভিজ্ঞাত

ও নবাবশিক্ত রাজসাম্রাজ্য অথবা ভ্রলোকদের মধ্যে সামান্য ক্ষেত্ৰহলেরও উল্লেখ করে নি, শিহরন তো দূরের কথা। মহারাজারা ও বাবুরা তখন ভূগোপত্য পিতৃমাতৃস্বাক্ষে বিবাহে অগ্রপ্রাসনে ইংরেজ অভিযানের আদরআপায়নের ভক্ত বাইলীনাচ ('nautch party') ও বিদেশী বাজ পরিবেশনে বাস্তব এবং তৎসহ 'মডারেট' একত্রজ্ঞানদীরা সতীদাহনিবারণের ভক্ত বৈচিত্র্যভূতিতে গদগদ, 'কমডার-ভেটিভ' বহুদেবতাবাদীরা সনাতনধর্মরক্ষায় সংঘবদ্ধ এবং 'আলটোরেডিক্যাল' ইয়ং বেঙ্গলরা ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে গোমাংসমজ্জসহযোগে অভিযানে অবতীর্ণ। চারিদিকে কেবল বাক্যের শ্রোত, বাক্যের সংঘর্ষ, বাক্যের গর্জন এবং তৎসহ ইংরেজের পদলেহন। এমতাবস্থায় তিতুমীরের অথবা তার সহযাত্রী গ্রামের দরিদ্র কৃষকদের রাজনৈতিক চেতনার খণ্ডখণ্ড বিকাশের কথা অথবা শোষণশাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে তাঁদের সংগ্রামের সাক্ষ্যের কথা চিন্তা করা যায় না।

দ্বিতীয় কারণঃ ধর্মভিত্তিক সামাজিক সাম্যাদর্শের আবেদন শোষিতশ্রেণীর কাছে যতই জনপ্রিয় হোক না কেন, তা প্রকৃত গণমুক্তিসংগ্রামের হুরে কখনো উন্নীত হতে পারে না। সাধারণত তা ব্যক্তিকেন্দ্রিক আলোচনায় হয় এবং সেই ব্যক্তির উপর ঐশী শক্তি ও মহিমা আরোপ করা হয়। অতএব এই ধরনের গণ-বিদ্রোহের নায়করা প্রত্যেক ক্ষেত্রে থেকে অপসারিত হলে, বিদ্রোহীরা পিতৃহীন বালকদের মতো দিশাহারা হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে বিদ্রোহ ও সংগ্রাম বার্থ হওয়া স্বাভাবিক।

তৃতীয় কারণঃ রাজনীতিবদ্ধিত অর্থনৈতিক সংগ্রাম, অর্থাৎ কেবল অভাব-অভিযোগ প্রতিকারের সংগ্রাম কদাচ 'শ্রেণীসংগ্রামের' অহুশ্রয়ণার মূল উৎস হতে পারে না এবং সেই সংগ্রাম যত ব্যাপক গণসংগ্রামই হোক না কেন তা কখনো 'বৈপ্লবিক' সংগ্রাম হতে পারে না, 'সংস্কারমূলী' বা reformist সংগ্রাম হতে পারে মাত্র, এবং তা হলে পদে পদে বারংবার তার বার্থতা অবশ্যস্তাবী। অবশ্য এরকম উন্নত রাজনৈতিক চেতনা তিতুমীরের কাছে থেকে প্রত্যাশা করা যুক্তিসংগত নয়, যেহেতু তিতুমীরের বিদ্রোহের প্রায় দেড়শো বছর পরেও দেখা যায়, আধুনিক রাজনৈতিক যুগে ধারা গণসংগ্রাম গণবিদ্রোহ গণআন্দোলন গণমুক্তি শ্রেণীসংগ্রাম বিপ্লব ইত্যাদির নামে সকালসন্ধ্যায় লর্পণ করেন, স্লোগান দেন, তাঁরাও এই চেতনাবদ্ধিত। তবে তিতুমীরের সঙ্গে তাঁদের তফাৎ হল এই যে তিতুমীর 'অজ্ঞানে' এই চেতনাবদ্ধিত, এবং আধুনিক গণদরদীরা 'সজ্ঞানে' এই চেতনাবদ্ধিত। অর্থাৎ তিতুমীর অজ্ঞানদোষী, আধুনিক গণদরদীরা জ্ঞানপাণী।

চতুর্থ কারণঃ বারানসাত-বশিরহাট অঞ্চল থেকে বনগাঁ ও নলদীয়ার সীমান্তবর্তী অঞ্চলের যে ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ, তাতে কোনোপ্রকারের 'নশস্র' গণসংগ্রাম কখনো সফল হতে পারে না, যদি না সংগ্রামীদের base area পার্বত্য অঞ্চলিক জেলা জুড়ে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। কলডিন-কথিত তিনশো বর্গমাইল

কেন, হাজার বর্গমাইল এলাকায় ঘুরে বেড়ালেও দেখা যাবে কোথাও কিছু নেই, কেবল দিগন্তবিস্তৃত মাঠ ঘাস আমকাঠালাদি গাছপালা ভাল নদী বাশবাড় পাট-ক্ষেত ধানক্ষেত আর তার মধ্যে মধ্যে বিকিণ্ড ছোট ছোট গ্রাম, অতিদরিদ্র চাষীদের গ্রাম, স্বর্ণার থেকেই প্রায় নিশ্চর্য ও নিঃশব্দ এবং আকাবাকা মেঠোপথ, সামান্য বর্ষণে পিচ্ছিল ও দুর্গম। তিতুমীরের কালে যা ছিল, এখনো তাই আছে, কেবল গ্রাম ও লোকের সংখ্যা কিছু বেড়েছে আর যেকদরের মতো একটি বাধানো মোটরপথ তৈরি হয়েছে, যাতে কোনো স্থানে কোনো কিছু গড়গোল হলে এস. পি. অথবা সি. আর. পি তুরন্ত সেখানে জীপযোগে পৌছতে পারেন। এহেন অকলে ঘুরে বেড়ালে মনে হয় কিসের ভরসায় তিতুমীর এখানে 'সশস্ত্র' সংগ্রামের পরিকল্পনা করেছিলেন! না আছে কোথাও অরণ্যের চিহ্ন, না আছে পাহাড়, ইছামতী-দুর্নাদি নদীও যা আছে তাও এমন কিছু দুর্লভ্য নয় বর্ষাকালেও। এহেন ভৌগোলিক পরিবেশে 'গেরিলাকৌশলে' সংগ্রাম করার কোনো সুযোগ নেই, পশ্চাদপসরণের অথবা আত্মগোপনের কোনো সুদূর সম্ভাবনা নেই, তথাপি নারকেলবেড়িয়ায় বাণেশের কেলা তৈরি করে, শক্তিশালী শত্রুদের সঙ্গে মুখোমুখি বা সম্মুখলড়াইয়ের শিকারে অটল থাকা নিশ্চয় তিতুমীরের দিক থেকে মারাত্মক ভুল শিকার হয়েছিল। কিন্তু এই ভুলটা ভুল ছাড়া কিছু নয়, এবং একথা মনে রাখতে হবে যে তিতুমীর আধুনিক রাজনৈতিক যুগের গণবিপ্লবের শ্রেষ্ঠ নায়ক মাও-সে তুঙ মন, এমন কি লাটিন আমেরিকার গুয়েভারাও নন। চাঁদপুর-হাটহাড়পুর-নারকেলবেড়িয়ার একজন কৃষকসন্তান মাত্র, যার মধ্যে প্রকৃত 'বিপ্লবীর' চারিত্রিক গুণের একটিরও অভাব ছিল না এবং যার আন্তরিকতা সত্যতা নিষ্ঠা দৃঢ়তা সাহস ও বীরত্ব আধুনিক রাজনৈতিক যুগের বাক্যবিলানী বিপ্লববাদীদের চাইতে অন্তত শতগুণ বেশি অন্সার বোধ্য।

শ্রীরামপুরের জুক কিন্তু পাত্রি সাহেবের সেই চিঠির কথা মনে পড়ে, 'ইণ্ডিয়া গেজেট' পত্রিকায় (২৫ নভেম্বর ১৮৩১) :

...we are standing on a powder magazine. The spark may not come this year or the next ; but whether it shall rise from Barasut, or Balasore or Mysore or any other 'sore', rise, we may assure ourselves, it will, under the promising example of Sheik Teetoo — and that at no remote period.

ক্রোধরিপুর ভাঙনায় পাত্রি সাহেব 'শেখ তিতু' অর্থাৎ তিতুমীরকে বার্থ প্রকা নিবেদন করেছেন অজ্ঞাতসারে এবং তাঁর কীড়ির সঠিক মূল্যায়নও করেছেন। ১২৭৩ সালের ২৫ নভেম্বরও আমরা তা অস্বীকার করব না, যদিও ১৮৩১ আর ১২৭৩ সালের মধ্যে ১৪২ বছরের ব্যাঘাৎ।

রচনানির্দেশ

বালাকাল থেকে তিতুমীরের গল্প শুনেছি, বর্গীর হাঙ্গামার মতো তিতুমীরের হাঙ্গামার গল্প এবং সেই সমস্ত গল্প গোত্রাদে গিলেছি, শুনেতে শুনেতে ঘুমিয়ে পড়েছি। মশাবয়সের মধ্যস্থানে পৌঁছে সেই ঘুম আজ ভেঙে গিয়েছে। ঘুম নেই। বিশ্বনাথ ডাকাতের গল্প, রবিনহুদের মতো, নীলকর সাহেবদের গল্প, জঙ্গলাকীর্ণ শতশত নীলকুটির ভগ্নপুংপের চার-পাশে যে সাহেবদের প্রেতাত্মা আজও ঘোড়ার পিঠে চড়ে চাবুক হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, কুশলের মধ্যে রাতের অন্ধকারে শপাং শপাং শব্দ হয়, সকলেই শুনেতে পায়, এমন কি জোনাকির ঝিকিঝিকি আলায় মধ্যে মধ্যে অস্বাভাবিক সাহেবদেরও দেখা যায়, অনেকেই বেপেছে, এবং ম্যালেরিয়ায় উজাড় গ্রামের পর গ্রামে উলোর জ্বরের গল্প। গরিব মাহুদ সাধারণ মাহুদ সকলে মরে গিয়েছে, বেঁচে আছে কৃত হয়ে। যখনরে বনগায় বাড়ি, ছেলেবেলা থেকে এরকম রোমায়িককর গল্প কত যে শুনেছি তার হিসেব নেই।

তিতুমীর সম্বন্ধে এরকম কোনো গল্প কাঁদার চেষ্টা করি নি। যেহেতু এরকম গল্প অনেক আছে, অধিকাংশই বিকৃত ও কাল্পনিক। (যদিও গল্পেরও ঐতিহাসিক মূল্য আছে।) যেমন বিহারীলাল সরকারের 'তিতুমীর', হুসি ঝাড়নে কিছু তথ্যের দান। হয়তো পাওয়া যায়, কিন্তু লেখকের রাজভক্তি ভবিষ্যৎভক্তি হিন্দুভক্তি এত প্রবল যে ভরসা হয় না। 'বিশ্বকোষ' ও বিজ্ঞানসংকল্পের 'জীবনীকোষের' তিতুমীরও তাই। একখানি ছোট বাংলা বই 'নারকেলবেড়ের স্বপ্ন' নামে কলকাতা থেকে ১৮৫৩-৫৪ সালে প্রকাশিত হয়, লেখক মূলতঃ মান। বইখানি ভ্রান্তাপ্য। 'মাসিক মহম্মদী' পত্রিকায় আবহুল গফুর সিদ্দিকী তিতুমীর সম্পর্কে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লেখেন (১৩৬০ সন) বা ইতিহাস নয়, উপন্যাস। জেলা গেজেটায়ারে তিতুমীরের বিবরণ আছে এবং ব্রিটিশ সেনাকর্মের ইতিহাসে, কিন্তু সকলেরই প্রধান অবলম্বন হাট্টারের *The Indian Mussalmans* বই। ক্যাটগয়েল বিশ্বের *Modern Islam in India* এর ব্যক্তি-ক্রম নয়।

এই কারণে রাষ্ট্রীয় মহাফেজখানার সরকারী মলিনপত্র (Judicial Department Records, 1831-32) থেকে লেখার অধিকাংশ উপাদান সংগ্রহ করেছি। চিঠিপত্র রিপোর্ট ইত্যাদি থেকে (টাইপ-করা মূলকাপ সাইন্সের প্রায় পৌনে দুশো পৃষ্ঠা) প্রয়োজনীয় তথ্যাদি যথাযথ প্রকাশ করেছি, অনাবশ্যকবোধে মূল ইংরেজি থেকে খুব বেশি উদ্ধৃতি দিই নি। Fort William, the 22nd November 1831 এবং Fort William, the 3rd April 1832-এর মধ্যে তিতুমীরের বিব্রোহ সংক্রান্ত অধিকাংশ চিঠিপত্র রিপোর্ট লিপিবদ্ধ আছে।

সমসাময়িক পত্রিকায় তিতুমীরের বিব্রোহের সংবাদ বিশেষ প্রকাশিত হয় নি। সামান্য কিছু টুকরো খবর 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং কিছু ইংরেজিতে খবর *India Gazette* পত্রিকায় (১৪, ১৮, ২২, ২৫ নভেম্বর এবং ৭ ও ১৩ ডিসেম্বর

১৮৩১)। সরকারী দলিলপত্রের অতিরিক্ত উল্লেখ্য উপাদান এগুলির মধ্যে বিশেষ কিছু নেই, যা সামান্য আছে, যেমন শ্রীরামপুরের চিঠি, তা ব্যবহার করেছি।

গত কুড়ি বছরের মধ্যে প্রকাশিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদির মধ্যে উল্লেখ্য হল Pakistan Historical Society-র চার খণ্ড সম্পূর্ণ *A History of the Freedom Movement, 1707-1947* (Karachi 1957)। প্রথমখণ্ডে তিহুমীরের বিদ্রোহের ইতিহাস আছে (পৃষ্ঠা ৪৪২-৪৪৫), প্রধানত সরকারী দলিলপত্র অবলম্বনে লেখা, কিন্তু বিবৃত নয়। *Journal of Asiatic Society of Pakistan* চতুর্থ খণ্ডে (Dacca 1959) দুইহুদিন আহমদ খাঁ সাহেবের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, *The Struggle of Titu Mir—A Re-examination*। হান প্রবন্ধ, কিন্তু পাকিস্তান হিস্টোরিকাল সোসাইটির পূর্বোক্ত গ্রন্থের আলোচনার অতিরিক্ত নতুন তথ্য বা বিশ্লেষণ কিছু নেই।

ভিত্তিমূলের ধর্মসংস্থার সম্বন্ধে, ওয়াজি-খালা, আজিজ ও সৈয়দ আমদ শাহীন এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে এই গ্রন্থগুলি (এবং প্রবন্ধ) নির্ভরযোগ্য মনে হয় :

Aziz Ahmad : *An Intellectual History of Islam in India* (Edin 1969) ; Islamic Surveys, vol. 7.

Ghulam Rasul Mihr : *Sayyid Ahmad Shahid* (Lahore 1952).

M. Nurul Karim : 'Part played by Haji Shariat Allah and his son in the socio-political history of East Bengal' (Proceedings of the Pakistan History Conference, Karachi 1955, pp 197-208).

M. D. Ahmad Khan: *History of the Faraidi Movement in Bengal, 1818-1906* (Karachi 1965).

Ameer Ali, Syed : *The Spirit of Islam* (London 1945 ed).

Stephen Fuchs : *Rebellious Prophets* (Bombay 1965).

I. C. Jarvie : *The Revolution in Anthropology* (London 1964).

E. J. Habsbawm: *Social Bandits and Primitive Rebels*

(Illinois 1 59).

তিতুমীর সম্পর্কে অনেক 'ছড়া' আছে, প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত, কিন্তু ছড়াগুলি পরবর্তীকালে রচিত এবং সাম্প্রদায়িক উদ্বেগপ্রণোদিত। সেই কারণে একটি ছড়াও লেখাতে ব্যবহার করি নি যদিও এরকম ছড়ারও ঐতিহাসিক মূল্য কিছুটা আছে।

বাংলা উদ্ধৃতিগুলি প্রাচীন সাময়িকপত্র 'সমাচার দর্পণ' 'সংবাদ প্রভাকর' ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' থেকে গৃহীত।

মার্কসীয় শিল্পতত্ত্ব বিষয়ে কয়েকটি প্রশ্ন

মার্কসীয় শিল্পতত্ত্বের বিরুদ্ধে প্রথমেই যে-প্রশ্ন কেউ কেউ ক'রে থাকেন এবং প্রথম অবশ্যে সেই প্রশ্নটি নিরাক্তিকর বা হাত্তকর ঠেকেনেও প্রশ্নটি যে একেবারে অবাস্তব নয়, তা হল : মার্কসীয় শিল্পতত্ত্ব আবার কী বস্তু ? এই প্রশ্নের কর্তারা বলেন — মার্কসীয় অর্থ-নীতি বৃদ্ধি মার্কসীয় রাজনীতি বৃদ্ধি, মার্কসীয় সমাজতত্ত্বও বোধ হয় বৃদ্ধি, কিন্তু মার্কসীয় শিল্পতত্ত্ব কি দস্তব ? হুম্মর সব সময়েই হুম্মর — চাষার কাছেও হুম্মর, জমিদারের কাছেও হুম্মর ; পাহাড়ের উপর নীল আকাশ কারখানার মালিকের কাছেও হুম্মর, শ্রমিকের কাছেও হুম্মর । হুম্মরের বোধে শ্রেণীসত্তা কাজ করে না, অতএব মৌলধৰ্ত্বত্ব অতএব শিল্পতত্ত্ব অতএব সাহিত্যতত্ত্ব মার্কসীয়দের কাছে একরকম, অ-মার্কসীয়দের কাছে অকরকম — এটা প্রলাপ । এই প্রশ্নের কর্তারা এই বলে এসে আর এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেন : এরপর কবে শোনা যাবে মার্কসীয় বিজ্ঞান, মার্কসীয় ভাষা, মার্কসীয় রাস্তা, মার্কসীয় কোদাল ইত্যাদি !

এই সন্দেহ বা বিজ্ঞপের দুটি অংশ আছে । প্রথমটির কারণ হল, হুম্মর সব সময়েই হুম্মর এই ধারণা । এটা একেবারেই বাজে ধারণা অবশ্য । হুম্মর সব সময়ে সব বলে হুম্মর নয় । বাঙালিদের কাছে ফর্দা মেয়ে হুম্মর, সাহেবদের কাছে কালো মেয়ে হুম্মর, নিগ্রোদের কাছে মোটা টোটা হুম্মর, চীনাড়ের কাছে খাটো পায়ে পাভা হুম্মর — ইত্যাদি । দেশবিশেষে মৌলধৰ্মবোধ পালাটে যায় । আবার কালবিশেষেও । ভরাপেটে পাহাড় হুম্মর, মেঘের কোলে বকের পাতি হুম্মর, আরও কত কি হুম্মর — কিন্তু গালি পেটে নয় । জমিদারের কাছে বাইজীর উচ্চাশ নৃত্যগীত হুম্মর, চাষার কাছে তার আবেদন নেই ; মধ্যবিত্ত বাঙালির কাছে রবীন্দ্রসংগীত মনোমুগ্ধকর, শ্রমিকের কাছে তার আবেদন ক্ষীণ — ইত্যাদি অনন্ত উদাহরণ দিয়ে লাভ নেই । প্রকৃতপক্ষে, এই প্রশ্নটি নিয়ে আমরা এই নিবন্ধে বেশি বাগাড়ম্বর করতে চাই না । তার কারণ, হুম্মর কী, শিল্প কী, সাহিত্য কী তা নিয়ে যুগে যুগে তর্ক হয়ে গিয়েছে : প্লেটো, আরিস্টটল, হোরেস, লবিনাস, দাণ্ডে, বোকাচিও, মিলটন, হব্‌স, বোয়ালিও, ডাইডেন, পোপ, জনসন, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলরিজ, হগো, গ্যেটে, হুইটমান, স্না বোভ, ভাইন, ম্যাথু

আর্নল্ড, জোলা, ক্রাস, ডারউইন, টলস্টয়, বার্গস, জোচে, ব্রয়েড, রিচার্ডস, এলিয়ট প্রমুখ অনেক রকম কথা বলে গেছেন। অতএব এ বিষয়ে মার্কসের যদি কোনো বক্তব্য থাকে, তাহলে তাকে মার্কসীয় দোন্দ্ব্যর্থত্ব, শিল্পত্ব বা সাহিত্যত্ব বলতে কোনো বাধা থাকার কথা নয়।

বরং, সম্ভেদটির দ্বিতীয় অংশের কিছু বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ আছে। মার্কসীয় বিজ্ঞান, মার্কসীয় ভাষা, মার্কসীয় রাস্তা বা মার্কসীয় কোদাল হয় কি হয় না? সোজা উত্তর : হয় না। বিজ্ঞান সব সময়েই বিজ্ঞান, মার্কসীয় বিজ্ঞান বলে বিশেষ কিছু নেই। এই প্রসঙ্গে, আমরা একটি গোড়ার প্রশ্ন তুলতে চাই : মার্কসীয় দর্শনে ভিত্তি এবং উপরিসোধের প্রশ্ন। কোনটি ভিত্তি, কোনটি উপরিসোধ, এ বিষয়ে ধারণা না থাকলে নানা জটিলতার সৃষ্টি হয়। যেমন রাশিয়ান হয়েছিল স্টালিনের আমলে। অনেকের সে সময়ে ধারণা হয়েছিল — ভাষা উপরিসোধ, অতএব ভিত্তি পালটালে উপরিসোধ ভাষা ও পালটাবে, যেহেতু মার্কসীয় দর্শনে বলা হয় ভিত্তি পালটালে উপরিসোধ পালটায়। ১৯১৭ সালে রাশিয়ান সমাজের ভিত্তি পালটিয়েছিল, কিন্তু ১৯১৭ সালের আগে রাশিয়ান ভাষা বা ছিল পরেও তা ছিল, কোনো লক্ষণীয় পরিবর্তন হয় নি। অতএব?

যে কোনো সমাজের উৎপাদনের সম্পর্কের সমষ্টিকে মার্কস বলেছেন সমাজের ভিত্তি। এই সমষ্টি কতরকমের হতে পারে? ঘোঁষ মালিকানা, দাসত্ব, সামন্তত্ব, ধনত্ব, সমাজত্ব — মোটামুটি পরিষ্কার এই পাঁচটি ভিত্তির কথা মার্কস স্বীকার করেছেন।

উৎপাদনের সম্পর্ক এবং উৎপাদনের শক্তি দুটি পৃথক জিনিস। উৎপাদনের সম্পর্ক ভিত্তি, উৎপাদনের শক্তি ভিত্তি নয়।

জমি লাভস বীজ উৎপাদনের শক্তি। কারখানা রাস্তা যন্ত্রপাতি উৎপাদনের শক্তি। ভাষা উৎপাদনের শক্তি। বিজ্ঞান উৎপাদনের শক্তি। এই শক্তিকে নিয়োগ করে উৎপাদনের সম্পর্ক বা ভিত্তি রচিত হয়।

ভিত্তিকে অবলম্বন করে খড়ে ওঠে সমাজের যেসব প্রতিষ্ঠান এবং ধারণা, তাদের বলে উপরিসোধ। উপরিসোধের উদাহরণ দিতে গিয়ে মার্কস ছয়টির কথা উল্লেখ করেছেন : রাজনৈতিক, আইনসম্বন্ধীয়, নৈতিক, শিল্পসম্বন্ধীয়, ধর্মসম্বন্ধীয় এবং দার্শনিক। সামাজিক চেতনার বিভিন্ন রূপ হল এগুলো।

এখানে একটি সন্দেহের প্রশ্ন ধাক্কা আসবে। দর্শনকে মার্কস বলেছেন উপরিসোধ। বিজ্ঞান সম্পর্কে মার্কস কোনো মন্তব্য করেন নি। বিজ্ঞানকে আমরা বলেছি উৎপাদনের শক্তি। আমরা কি ঠিক বলছি? এটা আমরা জানি, বিজ্ঞানের উৎপত্তি দর্শনে। তাহলে দর্শন উপরিসোধ আর বিজ্ঞান উৎপাদনের শক্তি কেন?

এখানে, বিজ্ঞান এবং দর্শনের মধ্যে একটা ডেপ টান দরকার। বিজ্ঞান হল প্রাকৃতিক নিয়মকে জানার চেষ্টা। এই প্রাকৃতিক নিয়মে মানুষের কোনো হাত নেই, মানুষ না থাকলেও প্রকৃতির এই নিয়মগুলো কাজ করে যায়। মানুষ দেড়নো ভেনে তাকে

ব্যবহার করে মাত্র। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আছেই, মাহুদ না থাকলেও থাকত; মাহুদ মাধ্যাকর্ষণ শক্তির নিয়ম অঙ্কন কর'রে মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে অতিক্রম করার চেষ্টা করে : বেবুন, উডোজাহাজ, রকেট। দর্শন কিন্তু মাহুদের সৃষ্টি, মাহুদ না থাকলে দর্শনের সৃষ্টি হতো না।

উপরিসোধের সঙ্গে উৎপাদনের শক্তির পার্থক্য এইভাবে টানা যায় : বিজ্ঞান যখন উৎপাদনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হয় তখন বিজ্ঞান উৎপাদনের শক্তি, না হলে উপরিসোধ। যেমন technology, industrial psychology বা management science। মানবসৃষ্ট হলোই তা উপরিসোধ হবে তেমন কোনো কথা নেই। জরি প্রকৃতিদত্ত, শস্ত্র বীজ প্রকৃতিদত্ত, কিন্তু লাঙল কারখানা বিজ্ঞান মানবসৃষ্ট—কিন্তু সবই উৎপাদনের শক্তি। আবার ধর্ম শিল্প দর্শন মানবসৃষ্ট — কিন্তু এগুলো উপরিসোধ। চুরের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, একটি উৎপাদনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত, অপরটি অপ্রত্যক্ষভাবে। উৎপাদনের শক্তি সম্পর্কে মার্কসের বিশেষ কোনো বক্তব্য নেই। একে একে দুই হয়, কোদাল কোদালই, মার্কসীয়রা এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ তোলেন না। কিন্তু উপরিসোধ সম্পর্কে মার্কসের বিশেষ বক্তব্য আছে।

মার্কসীয় শিল্পতত্ত্বের অবতারণা হলোই যে সন্দেহটি হয়, যার কথা আমরা আগে উল্লেখ করেছি, সেটা যাচ্ছে সেই সন্দেহটি অদ্বন্দ্ব। অতএব আমরা এবার আসল প্রশ্নে যেতে পারি।

মার্কসীয় শিল্পতত্ত্বের সর্বপ্রধান কথা হচ্ছে, ভিত্তির সঙ্গে উপরিসোধের সম্পর্ক, অর্থাৎ অর্থনৈতিক সম্পর্কের সঙ্গে মানবচেতনার সম্বন্ধ। মার্কস বলেন, মানবচেতনা গড়ে ওঠে অর্থনৈতিক সম্পর্কের উপর।

রাজনৈতিক এবং আইনগত উপরিসোধের সঙ্গে ভিত্তির যেমন প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ, অত্যন্ত উপরিসোধের সঙ্গে তেমন নয়। ভিত্তি পালটালে সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কারভাবে পালটায় রাজনীতি এবং আইন। কিন্তু ধর্ম, দর্শন, শিল্প অত ভাড়াভাড়ি, অত পরিষ্কার, অত প্রত্যক্ষভাবে পালটায় না। তবে, এটা মনে রাখা দরকার, প্রত্যক্ষভাবে না পালটালেও ধর্ম, দর্শন, শিল্পও পালটায়। ভিত্তির চিহ্ন শিল্পের উপর পড়বেই, যত অপ্রত্যক্ষই হোক।

মানবচেতনার একটি অংশ, শিল্প, নিয়ে আমরা আলোচনা করছি। অতএব, এখন থেকে আমাদের পরিধি সামান্য সংকীর্ণ হয়ে আসবে।

শিল্পের সঙ্গে ভিত্তির সম্পর্ক কী?

মার্কস বলেছেন, শিল্পের সঙ্গে ভিত্তির সম্পর্ক অপ্রত্যক্ষ হলেও আছেই। কিন্তু তিনি বিশদভাবে উদাহরণ দিয়ে এই সম্পর্কের ব্যাখ্যা করেন নি। সেই দায়িত্ব তাঁর উত্তরসূরীর।

একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। রবীন্দ্রসাহিত্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ভিত্তির কী সম্বন্ধ?

রবীন্দ্রনাথ জমিদার ছিলেন। তাঁর অর্থ নৈতিক ভিত্তি ছিল সামন্ততান্ত্রিক। এবিষয়ে কোনো বিষম থাকলেও আমরা তা গ্রাহ্য করছি না।

এখন, রবীন্দ্রসাহিত্যের সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক ভিত্তির কী যোগাযোগ? রবীন্দ্রনাথ যখন লেখেন, 'ওই আসে ওই অতি ভৈরব হরষে', তখন কি তিনি বগার আগমনে সন্তোষলন এবং চাষাকে বঞ্চিত করে বেশি অর্থপ্রাপ্তির আশায় উল্লসিত হয়ে কবিতা লেখেন? অবশ্যই নয়। তাহলে?

ভিত্তি সম্পর্কে আমরা ভিত্তির আর একটি লক্ষণ উল্লেখ করতে চাই এবার।

মার্কসীয় মতে, ভিত্তি পাঁচরকম : যোধ মালিকানা, দাসত্ব, সামন্ততন্ত্র, ধনত্ব এবং সমাজতন্ত্র। প্রথম এবং শেষটি বাদ দিলে বাকি ভিত্তিগুলো শ্রেণীবিন্যাস। শ্রেণীবিন্যাস সমাজে দু'রকম ভিত্তি থাকে, একটি শাসকশ্রেণীর আর একটি শাসিতশ্রেণীর। হুতরাং শ্রেণীবিন্যাস সমাজে উপরিসম্বোধ ও ছুঁরকম — শাসকশ্রেণীর এবং শাসিতশ্রেণীর।

অর্থাৎ শ্রেণীবিন্যাস সমাজে মাহুয আর সমভাতীয় মাহুয থাকে না, মাহুযের চেতনা খণ্ডিত হয়ে যায় — শাসকশ্রেণীর এবং শাসিতশ্রেণীর চেতনায়।

মানবচেতনার মধ্যে একমাত্র শিল্পই মাহুযকে দেখে অগণ্ড মাহুয হিসেবে। শ্রেণীবিন্যাস সমাজেও শিল্প মাহুযকে দেখে অগণ্ড মাহুযরূপে। তাই শিল্পী শ্রেণীসত্তার উর্ধ্বে।

এই কথাটি অত্যন্ত অর্গাচীন ঠেকতে পারে। কিন্তু এটো কথাটি স্বীকার না করলে এক অনতিক্রম্য ধোঁয়ার মধ্যে প্রবেশ করতে আমরা বাধ্য।

শেক্সপিয়র পড়তে পড়তে কখনো তাঁকে মনে হয় সামন্ততান্ত্রিক, কখনো বুর্জোয়া, কখনো সমাজতান্ত্রিক, কখনো আদিম জীর্ণীয় সমাজতান্ত্রিক, এবং আরো কত কি? রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলিতে সামন্ততান্ত্রিক, বলাকা-তে ধনতান্ত্রিক, খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তনে সমাজতান্ত্রিক। ভিত্তি এক, অথচ উপরিসম্বোধ নানা প্রকারের — এটা কী করে হল?

এটা হয়তো সত্য, অনেক শিল্প শ্রেণীচিহ্নিত, শ্রেণীবদ্ধ। কিন্তু সব শিল্প নয়। যে শিল্প মহৎ, তা শ্রেণীর উর্ধ্বে। রবীন্দ্রনাথ বা শেক্সপিয়র সব চেতনার সমন্বয় করতে পেরেছিলেন বলেই তাঁরা রবীন্দ্রনাথ, শেক্সপিয়র।

একথা মনে রাখলে আমাদের রবীন্দ্রনাথকে ইতিহাসের আন্তর্ভুক্ত থেকে তুলে এনে দেয়ালে টাঙিয়ে আবার ভাবতে হতো না তাঁকে আবার আন্তর্ভুক্তে ফেলতে হবে কি না!

ভিত্তির তৃতীয় লক্ষণ হচ্ছে, একটা ভিত্তি পালটে গেলেও সেটা সমূল উৎপাটিত হয় না, তার কিছু কিছু চিহ্ন পরবর্তী ভিত্তিতে থেকে যায়। একই কথা প্রযোজ্য উপরিসম্বোধ সম্পর্কে। বরং বেশি করেই প্রযোজ্য, কেন না, ভিত্তি যত তাড়াতাড়ি পালটায়, উপরিসম্বোধ তত তাড়াতাড়ি পালটায় না। ধনতন্ত্রে ধনতান্ত্রিক উপরিসম্বোধ যেমন আছে, তেমনই আছে পূর্ববর্তী সামন্ততন্ত্র, দাসতন্ত্র, যোধ মালিকানার চিহ্ন। জীবনের ধন কিছুই যায় না ফেলা। শেক্সপিয়র যেমন নতুন ধনতান্ত্রিক চেতনার বাহন হয়েছিলেন,

তেমনই পুরনো সামন্ততান্ত্রিক চেতনারও বাহন হয়েছিলেন, দাসত্বের চেতনারও বাহন হয়েছিলেন, আদিম সমাজতান্ত্রিক চেতনারও বাহন হয়েছিলেন।

রনীশ্রুনাথ কখনো কৃষকবিষয়ী, কখনো কৃষকদরদী, কখনো স্বদেশপ্রেমিক, কখনো ইংরেজভক্ত, কখনো বাঙালি, কখনো আন্তর্জাতিক — রনীশ্রুনাথকে একটি স্বত্রে বাঁধার চেষ্টা দার্ব হতে বাধ্য। ইতিহাসের এক একটি মুহুর্তে তিনি এক এক ভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন।

তবে কি একজন সাহিত্যিক সম্পর্কে এ-কথা বলা সম্ভব নয় যে ইনি বুর্জোয়া, ইনি সমাজতান্ত্রিক, ইনি কিউডাল ? না। সাধারণ শিল্পী সম্পর্কে বলা গেলেও, বড়ো শিল্পী সম্বন্ধে বলা যায় না। মহৎ শিল্পী মাত্রকে মাহুয়ভাবেই চিত্রিত করেন, পণ্ডিতভাবে, কিউডাল বা বুর্জোয়াভাবে দেখেন না।

এই জন্মই ঘোটে সম্পর্কে এঙ্গেলস বলেছিলেন : He felt himself at home only in the human and it was this humanity, this emancipation of art from the fetters of religion that determined Goethe's greatness. In this respect neither the great writers of antiquity nor even Shakespeare measure up to him.

এই জন্মই ঘোটে সম্পর্কে এঙ্গেলস বলেছিলেন : The close of the feudal Middle Ages, the threshold of the modern capitalist era, was marked by a gigantic, colossal figure. It was an Italian, Dante, who was both the last poet of the Middle Ages and the first poet of the modern times.

শিল্পী যদি সর্ব শ্রেণীর চেতনার বাহক হন, তাহলে শিল্পীকে কি প্রগতিশীল বা প্রতিক্রিয়াশীল বলা যাবে না ? যাবে।

শ্রেণীবিভক্ত সমাজের দুই উপরিসোধের মধ্যে সর্ব সময়ে লড়াই চলে। একটি উপরিসোধ প্রতিক্রিয়াশীল ভিত্তির বাহক, আর একটি প্রগতিশীল ভিত্তির। শিল্পী যদি প্রধানত প্রগতিশীল উপরিসোধের বাহন হন, তাহলে তিনি প্রগতিশীল।

এইক্ষেত্রে একটি স্বল্প ব্যাপারটাকে চূর্বোধ্য করে তুলতে পারে। শিল্পীর শিল্পীসত্তা আর ব্যক্তিসত্তা দুয়কম হতে পারে। ব্যক্তিগত জীবনে হয়তো কেউ প্রতিক্রিয়াশীল, কিন্তু শিল্পক্ষেত্রে প্রগতিশীল। যেমন হাইনে সম্পর্কে এঙ্গেলস লিখেছিলেন : The old Horace reminds me of places in Heine, who learned a great deal from him and like Horace he too was at bottom a cur in a political sense. Just think of the old boy who challenged the threatening glance of the angry tyrant and then crawled at Augustus' feet. Yet in other respects the old wretch is very lovable....

Henry Heine, the most eminent of all living German poets, has joined our ranks and published a volume of political poetry, which contains also some pieces preaching Socialism.

এবিষয়ে বালজাক সম্পর্কে এঙ্গেলসের দৃষ্টি ব্যতীত।

এ তো গেল শিল্পীর ব্যক্তিসত্তা আর শিল্পীসত্তার ধর্ম। এড়াতে, শিল্পীসত্তাও প্রগতিশীল বা প্রতিক্রিয়াশীল হতে পারে।

এই প্রসঙ্গে দৃষ্টবিষয়ে একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। সমাজের ইতিহাসে মানুষকে দুইরকম প্রধান ঘন্থের মুখোমুখি হতে হয় — একটি প্রকৃতির সঙ্গে ধর্ম, অপরটি মানুষের সঙ্গে মানুষের ধর্ম, যার আর এক রূপ জৈবীধর্ম।

মানুষের সমাজ যতদিন জৈবীতে বিভক্ত হয় নি, অথবা যদি কখনো জৈবীতন সমাজে উত্তীর্ণ হতে পারে, তখন মানুষের ধর্ম ছিল বা হবে প্রকৃতির সঙ্গে। আর জৈবীতন মানুষের ধর্ম, একাধারে প্রকৃতির সঙ্গে এবং জৈবীর সঙ্গে।

অনেক শিল্পীই দেখা যায় জৈবীধর্ম সম্পর্কে উদাসীন, প্রকৃতির সঙ্গে ধর্ম নিয়ে নয়। যেমন রবীন্দ্রনাথ। ভারতবর্ষের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের আনির্ভাব এমনই মুকুটে যখন সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে ভারতবর্ষের ধর্ম তীব্র এবং মূঢ় হয়ে উঠেছিল। সেই সময় রবীন্দ্রনাথ অনেক সময়েই সেই ধর্মের সম্মুখীন হতে না পেরে নিজেকে প্রকৃতির মুখোমুখি করে রেখেছিলেন। দেশের পরিপ্রেক্ষিতে হুতরাং রবীন্দ্রনাথকে প্রতিক্রিয়াশীল বলতে আমরা বাধ্য। অনেক সময়ে অবশ্য রবীন্দ্রনাথ আপনাকে এই প্রতিক্রিয়ার হাত থেকে বের করে এনেছিলেন, অনেক সময়ে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের সবচেয়ে বড়ো লক্ষণ যদি বলতে হয় আধ্যাত্মিকতা তাহলে বলতে হবে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিক্রিয়াশীল। সাবেক সামন্তযুগীয় মোহাজির ধর্মের আধ্যাত্মিকতা এটা নয়, এই আধ্যাত্মিকতা প্রাকৃতিক ঘন্থের আধ্যাত্মিকতা। কিন্তু সেই মুখে প্রাকৃতিক ঘন্থের চাইতেও তীব্র ছিল ইংরেজদের সঙ্গে নড়াই। ভ্রমবশত রবীন্দ্রনাথ কখনো কখনো ইংরেজদের সমর্থন করেছেন, সেটা বড়ো কথা নয়। বড়ো কথা, জৈবীধর্মের প্রত্যক্ষ তীক্ষ্ণতা সহ্য করতে না পেরে তিনি আশ্রয় নিয়েছেন তখনকার দিনে কম তীক্ষ্ণ প্রাকৃতিক ঘন্থ — তিনি ভাবিত হয়েছেন মৃত্যু নিয়ে, মানুষের অন্তর্ভুক্ত বৃদ্ধি নিয়ে, দৃষ্টির অনির্ব্যক্ত গতির রহস্য নিয়ে। চাষী যখন উদ্ভাস্ত হয়ে যায়, তখন প্রকৃতির নির্ভরতার চাইতে মানুষের নির্ভরতাই তার কাছে জীবন্ত, প্রত্যক্ষ, অধিকতর সত্য।

মার্কসের একটি উক্তি অমার্কসীয়দের কাছে খুব আনন্দের কারণ। এই উক্তি, তাঁরা মনে করেন, প্রমাণ করে যে ভিত্তির সঙ্গে শিল্পের কোনো সংঘর্ষ নেই। *A Contribution to the Critique of Political Economy*-তে মার্কস বলেছেন: It is well-known that certain periods of highest development of art stand in no direct connection with the general development of society, nor

with the basis and the skeleton structure of its organization. Witness the example of the Greeks as compared with the modern nations or even Shakespeare.

এই পর্বন্ত পড়ে যদি আমার পড়া পানিয়ে দিই, তাহলে মনে হতেই পারে মার্কস তাঁর মূল বক্তব্য — ভিত্তি ও উপরিসৌধের পারস্পরিক সম্পর্ক — অস্বীকার করছেন।

আসলে পরবর্তী অংশটুকু পড়লে বোঝা যায়, মার্কস এখানে তাঁর তত্ত্বনিরোধী সম্ভাব্য একটি প্রশ্নের অবতারণা করে একটি পরেই উত্তর দিচ্ছেন। উত্তরটি হচ্ছে এই : The difficulty lies only in the general formulation of these contradictions. No sooner are they specified than they are explained.

বাখা করে তিনি দেখিয়েছেন গ্রীকসাহিত্য তদানীন্তন গ্রীসের পুরাণ ছাড়া লেখা যেতে পারত না এবং সেই পুরাণের জন্য তদানীন্তন ভিত্তি ছাড়া হতে পারত না। ভিত্তি যদি পালটে যেত তাহলে গ্রীকসাহিত্যও পালটে যেত। মার্কস বলেছেন : Is Achilles possible side by side with powder and lead ? Or is the Iliad at all compatible with the printing press and steam press ? Do not singing and reciting and the muses necessarily go out of existence with the appearance of the printer's bar and do not, therefore, disappear the prerequisites of epic poetry ?

মার্কস এখানে উৎপাদনকে খুব মোটা কথায় বলেছেন, তাই উৎপাদন শক্তি এবং সম্পর্কের মধ্যে পার্থক্য গ্রাহ্য করেন নি। ছাপাখানা অবজ্ঞাই ভিত্তি নয়, উৎপাদন শক্তি। পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভিত্তির পরিবর্তন হয়।

এই পর্বন্ত কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু এর পরই মার্কস যে কথা বলেছেন তা নানা অস্বচ্ছতার কারণ হয়েছে।

ধরে নেওয়া যাক ভিত্তির সঙ্গে শিল্পের যোগ আছে। তাহলে কি এটাও ধরতে হবে, ভিত্তি উন্নত হলে শিল্পও উন্নত হবে ?

গ্রীকসমাজের ভিত্তি ছিল দাসত্ব। পরবর্তী ইতিহাসে মানুষের সমাজের ভিত্তি অনেক উন্নত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে কি পরবর্তী শিল্প গ্রীকশিল্প থেকে উন্নত হয়েছে ? মার্কসের ধারণা ছিল, মানুষের ইতিহাসে গ্রীকশিল্প থেকে উন্নত শিল্প আর হবে না। অনুরূপ ভিত্তি উন্নত শিল্পের জন্য দেয় কী করে ?

দ্বিতীয় প্রশ্ন। যে কোনো সমাজে উপরিসৌধ তৈরি হয় ভিত্তির উপর। আমাদের শিল্পবোধ তৈরি হয়েছে আমাদের ভিত্তি অর্থাৎ উৎপাদন-সম্পর্কের উপর। আমাদের ভিত্তির সঙ্গে দাসত্বের কোনো সংঘর্ষ নেই। তথাপি, গ্রীকভিত্তির উপর প্রস্তুত গ্রীক-শিল্প আমাদের আজও আঁধারে করে কীভাবে ?

প্রথম প্রশ্নটির জবাব হচ্ছে এই। অর্থনৈতিক সম্পর্কের সঙ্গে শিল্পের সংঘর্ষ প্রত্যক্ষ নয়, একরেখও নয়। এই দুইয়ের সংঘর্ষ বহুস্তরবিশিষ্ট। ভিত্তি উন্নত হলে শিল্পও উন্নত

হবে, এমন কোনো কথা নেই। শিল্পের উপকরণ মাহুকের মন। মাহুকের মন শুধু উৎপাদনের সম্পর্কের উপরই নির্ভর করে না। যদিও, শেবপর্ষন্ত দেখা যায়, ফলে আছে উৎপাদনের সম্পর্ক।

একটা ভালো তুলনা, যে কোনো বাড়ি। ভূমিটুকু না থাকলে বাড়িটা হতে পারত না। কিন্তু ঘরের সাজসজ্জা জমির উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল নয়। ঘরের সাজ-সজ্জায় ভূমি ছাড়াও অত্যন্ত অনেককিছু কাজ করেছে। শিল্পের ব্যাপারেও তাই। উৎপাদন-সম্পর্ক ছাড়া সেই শিল্প গড়ে উঠত না, কিন্তু শিল্পের উন্নতি-অবনতি সবটুকু উৎপাদন-সম্পর্কের উপর নির্ভর করে না।

যেমন, একই অর্থনৈতিক সম্পর্কের উপর তৈরি রবীন্দ্রনাথ আর দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। কিন্তু রবীন্দ্রসাহিত্য ও দ্বিজেন্দ্রসাহিত্য সমজাতীয় নয়। রবীন্দ্রসাহিত্য ও দ্বিজেন্দ্র-সাহিত্যের একেবারে ফলে আছে একই অর্থনৈতিক সম্পর্ক, কিন্তু তাঁদের শিল্পদোশ তৈরি হওয়ার সময় আরো কাজ করেছে তাঁদের ভিন্ন শিক্ষাদীক্ষা।

তাই একথা বলা যায় না, ভিত্তি উন্নত হলেই শিল্প উন্নত হবে। সামন্তযুগীয় শিল্প উন্নত ছিল, ধনতয়ে শিল্পের অবশ্যই ঘটে, যদিও উৎপাদনের শক্তিতে এবং সম্পর্কে সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্র উন্নত।

দ্বিতীয় প্রশ্ন সম্পর্কে মার্কস যে-উত্তর দিয়েছেন, সেটা মন্তোবল্লনক নয়। তিনি বলে-ছেন গ্রীকসাহিত্যের চাইতে উন্নত সাহিত্য আর হবে না, গ্রীকসাহিত্য মানবসাহিত্যের মানদণ্ড। গ্রীকসাহিত্য সম্পর্কে মার্কসের এটা নিত্যান্ত উচ্ছ্বাস। কোনো সাহিত্যই অন্য সাহিত্যের মানদণ্ড হতে পারে না। এবং একটা সাহিত্যের সঙ্গে আর একটা সাহিত্যের কোনো তুলনাও হতে পারে না। কালিদাস বড়ো না রবীন্দ্রনাথ, টলস্টয় না বালজাক, এটা সাহিত্যের প্রশ্ন নয়।

দ্বিতীয়ত, গ্রীক সমাজ সম্পর্কে মার্কসের বর্ণনা ইতিহাসসম্মত নয়। The Greeks were normal children বলেছেন তিনি এই প্রসঙ্গে। এটা মোটেই বাস্তব নয়। থেয়ুগে ইন্ডাইলাস, সোফোক্লিস বা অ্যারিস্টোফিনিস সাহিত্য রচনা করেছেন সেথুগে গ্রীক শাসকশ্রেণীর বর্বরতা বা নিকৃতি বিখ্যাত রোমক বর্বরতা ও নিকৃতিরই সমপোত্রীয়।

তৃতীয়ত, গ্রীক সাহিত্য আমাদের ভালো লাগে স্বতি রোমকদের ক্ষুদ্র, যত্নেছেন মার্কস। একই কারণে, যে-কোনো অতীত সাহিত্য আমাদের ভালো লাগতে পারত। কিন্তু লাগে না।

অর্থাৎ আমরা এপর্বন্ত মার্কসীয় দর্শনের শিল্পবিষয়ে প্রযোজ্য যে সূত্রগুলোর উল্লেখ করেছি, তা থেকে শিল্প আমাদের কেন ভালো লাগে তার কোনো সূত্রই আমরা পাই নি।

রবীন্দ্রনাথ বা লিখেছেন তা তাঁর ভিত্তি ছাড়া হতে পারত না, এটা বোঝা যায়। কিন্তু সেই ভিত্তিতে রবীন্দ্রনাথ অবধারিত কি না, তা বোঝা যায় না। রবীন্দ্রনাথ কিসের তাগিদে লিখেছিলেন এবং কী কারণে তা লোকের ভালো লাগে?

অর্থাৎ বিষয়বস্তুর আলোচনায় মার্কসীয় দর্শনের বিশেষ বক্তব্য আছে — অর্থাৎ বিষয়ের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্কের বনিষ্ট সম্পর্ক। কিন্তু কর্ম অর্থাৎ কীভাবে বিষয়টি লেগে হল, এবং কেনই-বা তা লোকের ভালো লাগে, সেবিষয়ে মার্কসীয় বিশেষ বক্তব্য নেই। সেটা psycho-physiology-র ব্যাপার বা genetics-এর ব্যাপার। এইসব বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হয়, যেমন একে একে চুই হয়, এবিষয়ে মার্কসের কোনো ঘিমত নেই।

শিল্পতত্ত্বের অগ্রগতি দিক আছে। শিল্পের উৎস, উদ্ভব, বিকাশ, উদ্দেশ্য, প্রভাব — এই তত্ত্বের যেমন প্রধান প্রধান শাখা, তেমনি প্রত্যেক শাখায় আছে অজস্র উপশাখা।

মার্কসীয় শিল্পতত্ত্ব বিষয়ে আলোচনার স্বরূপাত এই প্রবন্ধ, ছুয়েকটি প্রশ্নের অবতারণা মাত্র করা হয়েছে এখানে। কোনো সংস্কার নিয়ে লেগা হয় নি। আজ পর্যন্ত যতদূরকম শিল্পতত্ত্বের প্রচার হয়েছে, তার কোনোটাই শিল্পতত্ত্বের প্রশ্নের সচুস্তর দিতে পারে নি, হুতরাঃ মার্কসীয় দর্শন অসুখায়ী সেই তত্ত্বের বিকাশ সম্ভব কি না তার আলোচনার শুরু এই প্রবন্ধ। বলা বাহুল্য, এই প্রবন্ধের অনেক বক্তব্যই প্রচলিত মার্কসীয় দৃষ্টি-বিরোধী। হুতরাঃ এ-বিষয়ে আরো আলোচনা মার্কসীয় শিল্পতত্ত্বের বিকাশে সহায়তা করবে।

প্রবন্ধে যে-সব উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে, সেসব ইংরেজিতেই রাখা হয়েছে, কেননা মার্কস-এঙ্গেলস আমরা বাংলাদেশে মূলত ইংরেজিতেই পড়ি। বাংলা অসুবাদ হয় নেই, অথবা অপরিচিতি অথবা ভুল। সবগুলো উদ্ধৃতি নেওয়া হয়েছে ১৯৭২ সালে বোম্বাইয়ের কার্টে বুক হাউস প্রকাশিত ‘লিটারেচার অ্যাণ্ড আর্ট’ বই থেকে।*

গণনাট্য আন্দোলন ও লোকসংগীত

আমেরিকার বিশিষ্ট সংগীত সমালোচক ব্রুনো নেটেল (Bruno Nettl) তাঁর 'লোক অ্যাণ্ড ট্যাডিশনাল মিউজিক অব দি ওয়েস্টার্ন কন্টিনেন্ট' বইতে লোকসংগীতের অপব্যবহারের দৃষ্টান্ত দিচ্ছে গিয়ে হিটলার-জার্মানি এবং স্টালিন-রাশিয়াকে একই নিখাসে উচ্চারণ করেছেন। তিনি অবশ্য কোনো খানের উদ্ধৃতি দেন নি। তবু তিনি যে লোকসংগীতের প্রবাহের দুটি ধারাকে গুলিয়ে ফেলেছেন, সেটা তাঁর লেখা থেকেই হুস্পট। একটি ধারা গণস্বার্থবিরোধী শাসকশক্তির 'জাবধারায়' প্রবাহিত, অন্যটি গণচেতনায় অর্থাৎ শ্রেণীচেতনায় উদ্ভূত গণমানসের সরজাত ধারা।

শোষকশ্রেণীর উগ্রজাত্যভিমান জাতিবিদ্বেষ এবং ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা সাধারণ মানুষের জীবনকে, তাদের চিন্তাধারাকে বারে বারে দূষিত করেছে। তাঁদের লোকসংগীতিতেও তার বহু চিহ্ন পাওয়া যায়। অর্থাৎ লোকসংগীতের জীবনবিমুখী লোকায়ত ধারায় পাশাপাশি একটি প্রচ্ছন্ন, কোনো সময় স্পষ্ট দূষিত জীবনবিমুখী ধারাও আছে। তাই লোকসংস্কৃতির অগ্রগতির ধারাটা শুধু গ্রহণের নয়, বর্জনেরও। এবিষয়ে লেনিনের বিখ্যাত উক্তি ('There are two nations in every modern nation... The one are two national cultures in every national culture') দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার করতে হবে।

অক্টোবর বিপ্লবের অরোরার খোলাবর্ণে রাশিয়ায় বিশেষত সোভিয়েত মধ্য এশিয়ার স্বাধীন দেশগুলিতে প্রাচীন সামন্তীয় মোল্লাতন্ত্রের অচলায়তনের প্রাচীরগুলি যখন ভেঙে পড়ল—অল্প লোকসংগীতে তা ধ্বনিত হয়ে উঠল, বার মতো বিপ্লব ও লেনিন এক হয়ে গেল। পরলোকগত স্মরণীয় সাংবাদিক সত্যেন মজুমদার সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'অরবিন্দে', (১৯৪২, সোভিয়েট সংখ্যা) 'লোকসংগীতে লেনিন' নামে একটি প্রবন্ধে সোভিয়েট প্রাচ্যের কিছু দেশের লোকসংগীতের অন্বেষণ প্রকাশ করা হয়েছিল। তাত্ত্বিকহানের তাত্ত্বিকরা গান রচনা করেছেন—

তুমি ফুল আর হারেমের অনয়ন।

চাইনাকো চাই না।

তায় চেয়ে মুক্তির গান কেন গাই না,

সবচেয়ে হুমধুর লেনিনের গান।

উন্নয়নের গান আছে—

লেনিনের গান ডাই লেনিনের গান
সে গান তো গান নয়, আমাদেরি প্রাণ।
আমরা বাদীন ডাই, আমরা নবীন
হুনিয়াতে এলো মুক্তি মুক্তির দিন।
মুক্তির গান আর মৈত্রীর গান
সবচেয়ে সুমধুর লেনিনের গান।

কিংবা—

যেদে ঢাকা আকাশ থেকে লেনিন নেমে আসে নি
পাতালপুরীর আড়াল থেকে লেনিন আসে নি
এই দেশেতেই জন্ম তার
শক্তির হুনিবার
লোকস্বার্থে দেবলে জগৎ, সেই তো লেনিন
সবার প্রিয়পথার চেয়ে বড়।

একটি আর্মেনিয়ান লোকসংগীতে আছে—

লোকসংগীত বারা ছিনিয়ে নিয়ে তাদের রত্ন তুমি
নিঃস্বদেরই মৃত্যু মাত্র ভরে দিলে তুমি।
বসন তাদের ছিল নাকো ছিল পশুর মতো
বেশ দিয়েছ তাদের তুমি চাষীমজুর যত।
মান দিয়েছ তাদের তুমি, অজ্ঞানেদের জ্ঞান
তোমার ময়ে তাদের দীক্ষা জীবনেরে সম্মান।

এমনিভাবে লেনিন হলেন নতুন যুগের লৌকিক ব্যালাডের মহানায়ক। লেনিনের পথে অবিচলিত থেকে ধিনি প্রথম সমাজতন্ত্র গড়ে তুলেছিলেন—পৃথিবী আগ্রাসী দুর্গম ক্যাপিটাল বাহিনীকে পরাজিত করে পৃথিবীর মুক্তিকার। মানুষকে রক্ষা করেছিল যে লালকোজ তার সর্বাধিনায়ক স্টালিন যে রাশিয়ার তথা পৃথিবীর অমজৌর্য গণমনে ব্যালাড, গীতি-গাথা বা কাহিনীকাব্যের নায়কের মতো তাদের গানে চিত্রিত হবেন দেটাই স্বাভাবিক। অষ্টোত্তর বিপ্লবের অনেকে মনে করতেন এই বৈপ্লবিক বাস্তবতার যুগে রূপকথা বা উপকথা ইত্যাদির আর বিকাশ ঘটতে পারে না, তাদের বিরুদ্ধে মত পোষণ করতেন নতুন বিষয়বস্তুতে উপকথা-রচয়িতা বিখ্যাত কবি ডেমিয়ান বেড্‌নি (Demyan Bedny)। তিনি সেদিন কবিতায় তাঁর মত প্রকাশ করেছিলেন :

Now, how can fables ever die ?
To folklore they are nearest kinsmen
And that's exactly what I thought
in nineteen twelve, for then I sought

the shortest road to reach the masses.
In fables then I taught them
how to hate the hostile classes.

ঘটনা যখন যুগান্তরী, লোককবির হাতে ঘটনা ও ঘটনা মিলে তা হয় কাহিনী, বাস্তব সত্যের সঙ্গে কল্পনা মিশে হয় কিংবদন্তী। স্টালিনও তেমনই হন লোককাব্যের মহানায়ক। ভারতের গণনাট্য আন্দোলনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতিকার বোধের হরিজন শ্রমিক আন্দোলন ও শাঠের গীতি-গাথা 'স্টালিনগ্রাদ পোয়াডা' একটি এপিক-ধর্মী বাল্লাড। সেখানে তিনি স্টালিনগ্রাদের যুদ্ধের বর্ণনায় স্টালিনকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বীর পার্শ্বদারগির মতো বর্ণনা করেছেন। এটাই লোককবির ধর্ম, বিচ্ছিন্ন বুদ্ধিজীবীরা যা-ই ভাবুন না কেন।

তেমনি চীনের লোকসংগীতের প্রাচীন ভাণ্ডারে বেশি নতুন সংযোজন। ছয় হাজার মাইল লংমার্চের রক্তাক্ত পদক্ষেপে শত শতাব্দীর দামদ্রযুক্ত সেলি প্রদেশের নিরাকর কুমিদাসের কণ্ঠ থেকে সেই অকালের নৌকিক হুর ও ডাবায় প্রথম বের হয়ে এসেছিল :

তুংফাং হোং, থাইয়াং স্বাং...

পূর্বদিক লাল, স্বর্ঘের আভাষ...

সেই স্বর্ঘের নাম মাও সে তুং...

নবজাগ্রত চীনের কোটি কোটি মুক্ত মানুষের কাছে মাও সে তুং তাদের লোককাব্যে ও গীতিকায় এমনি এক প্রাচীন মহাকাব্যের নায়কের মতো। শুধু চীনের কেন, আমাদের গণনাট্য আন্দোলনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লোককবি ও গীতিকার মহারাষ্ট্রের আন্দোলন ও শাঠের ধর্মী 'নানকিং পোয়াডা'য় পাই তার প্রতিধ্বনি। ১৯৪৭ সন। নানকিং-এর দ্বারে মুক্তিসেনা এসে পৌঁছেছে। সেই সংবাদে বোধের শ্রমিক কবি আন্দোলন-এর কণ্ঠ মুখর হয়ে উঠল—

চীনা জনাংচী মুক্তি সেনা মুক্তিসংগর আন্ত লড়ে

নানকিং নগরাপুরে ; নানকিং নগরাপুরে ॥

জ্যানিং ধেতলে অনেক জন্মা ক্রুৎ কুকেচ্যা অগ্রীত...

ক্ষণা সারপি যুগে যোজিলী নির্বন বৈহুনি বংধাত।...

দুডলী তী নদী ইয়াংসী মার্গ মোকরা করাওইয়া।

পর্বত কুকবী মান আপুলী বরণ ভবানী তী জায়া।...

যুগযুগে ছুনাঠ খোড়ে আন্ত লাগলে হুদরায়া।

হিমালয়ানে দৃষ্টি রাখিলী মাও চ্যা বিজয়া কড়ে ॥

নানকিং নগরাপুরে ॥

‘চীনের মুক্তিসেনা নানকিং নগরদ্বারে হানা দিয়েছে। দারাদ্বারে ছুদায়, মরেছে ছুদায় ; দারাদ্বারের ঝড় দৃষ্টিক প্লাবন যুগে যুগে ভাণ্ডার লিগন বলেই চোপ বন্ধ করে

মেনে নিয়েছে, — যাদের কাছে প্রতি মুহূর্ত ছিল শতাব্দীর মতো, আর তারা হানা দিয়েছে নানকিং নগরের দ্বারে।...

‘মুক্তিবাহিনীর পথ ক’রে দিতে ইয়াসী নিম্নে কে ভাগে ভাগে বিভক্ত ক’রে দিয়েছে — উত্তর পর্বত মাথানত ক’রে দিয়েছে; হিমালয় তাকিয়ে আছে মাও বাহিনীর বিজয় অভিযানের দিকে। নতুন এশিয়ার মুক্তির দ্বার উন্মুক্ত করেছে মুক্তিবাহিনী...’

রচনার গাঙ্কীর্ণে, ভাবসম্পদে, কাব্যগুণে ও শোয়াভা হরের উন্নত পুকারে পরলোকগত আম্রাভাও শাঠের এট গীতি-গাথাটি গণনাটা সংগীতভাণ্ডারে অমর হয়ে আছে। মহারাষ্ট্রে লোকসংগীতের ধারাটিতে ‘স্টালিনগ্রাদ শোয়াভা’ ও ‘নানকিং শোয়াভা’ যে যুগান্তকারী সংঘর্ষের, লোকসংগীতের কিছু পণ্ডিত গবেষক তা না মানলেও জনতা তা মেনে নিয়েছে।

কিছুদিন আগে ভিয়েতনামের কিছু লোকসংগীতের ইংরাজি অহুবাদ দেখেছিলাম। সেখানেও হো চি মিন হয়েছেন লোককাব্যের মহানায়ক। অন্যে নেটল হয়তো এখানেও দেখবেন লোকসংগীতের অপব্যবহার।

কিন্তু আমাদের দেশেও তাঁর অহুগামী অনেক আছেন। আকাশবাণী কর্তৃপক্ষের নির্দেশে কিংবা কায়েরীস্বার্থকে খুশি করার জন্য যখন ১৫ আগস্টে কেউ ‘তেরঙা নিশানে পাল উড়াইয়া দে — কিবাণ ভাই রে’ বলে ‘প্রাচীন পল্লীগীতি’ উপস্থিত করেন, তখন তাতে যারা কোনো আপত্তি তোলেন না — তাঁরাই নাক কুঁচকাবেন যখন দাজিলিং ছেলার সংগ্রামী ওরাও রুম্বকের দুপ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত বেরিয়ে আসে :

সবু সবু সবু সবু হাউয়া আয়ী
লাল কাঙা উড়ী ফরফরকা
লড়াই কি ময়দান ...

আম্র চলো কিবাণ চলো মজুর
নিকালিলা যব কিরে লড়াইকি ময়দান ॥

কিংবা বিহারের দেহাতী ভাষা ও হর যখন কলকাতার টায়-মজুর গেয়ে ওঠেন :
লাল কাঙা তুঝসে কহতা হায়া পুকার ভৈয়া মজুরো...

॥ গণ আন্দোলন ও লোকসংগীত ॥

এটা কেবল আম্রকেরই কথা নয়। অতীতেও গণমানসে যখন কোনো আন্দোলন চেটে তুলেছে সে-আন্দোলন সামাজিক বা ধর্মীয় যাই হোক, তখন তা অসংখ্য লোকসংগীতে রূপ পেয়েছে। যেমন বিভাসাগরের বিদ্রোহ বিবাহ আন্দোলনে। সেসময়ে তাঁর পক্ষে ও বিপক্ষে অনেক গান রচিত হয়েছিল। কিংবা বাউল আন্দোলনে যেমন থানের প্রবাহ সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু সেই গানের প্রবাহের পলিমাটিটুই সমষ্টি-স্বীকৃতির ইঙ্গিতভে দেশের হাটির সঙ্গে মিশে যায়, অন্তিম অতিরিক্ত অব্যাহিত বস্তু ভেঙ্গে চলে যায়।

সমাজপ্রগতির বিরোধী কোনো ধারা বেশিদিন স্থায়ী হয় না। তাছাড়া রচনাগুণে ও ছুরে অসার্থক হলেও সমষ্টি-স্বীকৃতিতে তা স্থায়ী হয় না। এক আন্দোলনে যে গান জনগণ সৃষ্টি করে, আর-এক আন্দোলনে সেই গানই প্রত্যাখ্যাত হতে পারে। এই প্রক্রিয়াটির সঙ্গে জটিলভাবে জড়িয়ে আছে সমাজের শ্রেণীসংঘাতের প্রক্রিয়াটি। 'একশতাব্দীর পূর্ববর্তী' এক প্রবন্ধে বুদ্ধসহজিয়াদের লোকায়ত জীবনদর্শনের সঙ্গে উচ্চবর্ণের হিন্দুদর্শনের অধ্যাত্মগানের সংঘাতের রূপ দেখাতে চেষ্টা করেছি। পরবর্তী সময়ে বিজয়ী হিন্দুদর্শনের প্রভাবে সহজিয়ারা কিভাবে বৈষ্ণব বাড়লে পরিণত হল তা-ও আলোচনা করেছি। রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রভাবেও সেভাবে জনসাধারণের মধ্যে সংঘাতময় সৃষ্টিপ্রেরণা দিয়েছে। গান্ধী-আন্দোলনে প্রভাবিত হয়ে লেখা হয়েছে —

চরকা আমার সোয়ামী পুত

চরকা আমার নাতি

চরকার দৌলতে আমার

দুয়ারে বাজা হাতি

কিঃবা :

জয়গান্ধী বল ডাই

আর কোনো দুঃখ নাই

দেশের দুঃখ হবে অবসান ;

হয়ে হবে একমন

কর ননকোপারেশন

দেশের যত হিন্দু মুসলমান ॥

কিন্তু তারই পাশাপাশি দেখছি অনেক বেশি দরদ দিয়ে রচিত, অনেক বেশি স্থায়ী হয়ে লোকমানসে প্রতিষ্ঠিত সত্যিকারের লোকিক গীতিকাব্যের নায়ক, হুদিরাম। গান্ধী যার বিরুদ্ধতা করেছিলেন, গান্ধীপন্থার যে যুক্তপ্রতিবাদ, সেই বীর ভগৎ সিং পাঞ্জাবের অসংখ্য লোকসংগীতে অমর হয়ে আছেন আজও।

আবার দেখি চম্পারান সত্যায়ত্রে যে গান্ধী-দর্শন বিহারী কৃষকদের মধ্যে তাদের বহু গানে ব্যক্ত হয়েছিল সেই বিহারে লাল ঝাঙার নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ কৃষক আন্দোলন যখন 'লাভল যার মাটি তার' এই দাবিতে গান্ধীর শ্রেণী সমন্বয়কে প্রত্যাখ্যান করল, তখন তাদের প্রিয়তম গান হয়ে উঠল খাটি দেহাতী সুর ও রচনায়, কিন্তু নতুন জীবনদর্শনে উদ্দীপ্ত :

কেকুরা, কেকুরা নাম বাতাউ, ইস্ জগমে বড়া লুটেরোয়াহো

সামাবান্ বিন্ কাম ন চলিহে সুনো কিবাণ মজহুরোয়া হো।

মালিক ঔর মহাজন লুটে ঔর লুটে দুখ খোরোয়া হো ;

মিল্ ওয়ালা লুটে জমিদার লুটে মর গয়া কিবাণ মজহুরোয়া হো।

পা জা লুটে ঔর পুরোহিত লুটে, সাধু লুটে ঔর চোরোয়া হো।...ইত্যাদি ॥

অনেক লোকসংগীত-বিশেষজ্ঞ লোকজীবনের এই সংঘাতটা দেখতে চান না। তাঁরা 'ছায়াছবিবিড়, শাস্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি' ভাবতেই অভ্যস্ত। সেখানে শাসন, শোষণ, অত্যাচার, বিক্ষোভ, প্রতিরোধ এসব ভাবতে তাঁরা অভ্যস্ত নন — কিংবা এই সত্যকে চোখবুজে অস্বীকার করতেই তাঁরা অভ্যস্ত এবং অতীতকালে অভ্যস্ত করতে সচেষ্ট। তাঁদের মত হল : '...হামি যে জনতার কথা বলিগাহি, তাহা বিস্ময় কিংবা বিশৃঙ্খল জনতানহে; বিস্ময় কিংবা বিশৃঙ্খল জনতা প্রত্যক্ষভাবে কিছু সৃষ্টি করিতে পারে না, বরং ভবিষ্যতে নতুন করিয়া সৃষ্টি করিবার আশায় প্রত্যক্ষ বস্তুকে বিনাশ বা ধ্বংস করে। হুতরাং ইহার নিকট প্রত্যক্ষভাবে কোন কিছু সৃষ্টি করার প্রত্যাশাও করা যায় না। যে জনতার কথা হইতে লোকসাহিত্য সৃষ্টি এবং বিকাশ লাভ করে, তাহাকে শাস্ত-জনতা বলা যায়, ইংরেজিতে ইহাকে Common interest crowd বলা হইয়াছে; তবে জনতা মাত্রেরই একটি অভিন্ন লক্ষ্য থাকে, তথাপি এই লক্ষ্যের দুইটি দিক — একটি স্বপ্ননশীল আর একটি ধ্বংসনশীল। জনতার স্বপ্ননশীল লক্ষ্য হইতেই সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব, ধ্বংসনশীল লক্ষ্য হইতে নহে।...বর্তমান পর্য্যন্ত জনতা তদগতচিত্ত হইয়া লোকসাহিত্যের এই বিষয়বস্তু অগ্রসরণ করে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার শাস্ত এবং বির প্রকৃতি অব্যাহত থাকে।...' (আশুতোষ ভট্টাচার্য—'মানবমন,' অক্টোবর ১৯৭১)।

আশুতোষ ভট্টাচার্য মনাই জনতা 'বিস্ময়' হওয়া ও 'বিশৃঙ্খল' হওয়া একই ব্যাপার বলে ভাবেন। অজ্ঞায় অবিচারের বিরুদ্ধে বিস্ময় জনতাই সৃষ্টিশীল। বিস্ময় না হলে কোনো কবির দুঃখে, ধ্বংসগতে পারে না এবং সমষ্টি-চেতনার তাঁর স্পন্দন তুলতে পারে না — নতুন সমাজ গড়ার প্রেরণা আসতে পারে না। সামন্ত সমাজের অজ্ঞায়, অবিচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে যে প্রতিবাদ পরোক্ষভাবে রূপকে, প্রতীকে, কিংবা প্রত্যক্ষভাবে ধ্বংসিত হয়েছে সেটাই আমাদের লোকসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ধারা। গণনাট্য আন্দোলনের গান বিক্ষেপেরই গান। বিস্ময় জনতার সামূহিক সৃষ্টি তা; কোনো ব্যক্তিবিশেষের খেয়াল নয়।

জনতার মধ্যে বিশৃঙ্খলা আনে শাসক ও শোষক জেগী, যখন সাম্রাজ্যিক দাঙ্গা বা ভাণ্ডা দাঙ্গা বাধে। সেই অমন্য সৃষ্টিশীল হতে পারে না। কিন্তু শুধু তা নয়, আজকের গণআন্দোলনের প্রতি বিমূখ হয়ে জনতার কবির পক্ষে নতুন সৃষ্টি সম্ভব নয়। অধ্যাত্ম-বাদীরা যেভাবে 'তদগতচিত্ত' কথাটা ব্যবহার করে থাকেন, নৃত্য গীত বা বাস্তবমুখিত দৃষ্ট বা একক লোকসংগীত (যেখানে সমষ্টি নীরব অংশীদার) কখনো 'তদগতভাবে ভাবিত' নয়। আদিম কমলকামনা, সৃষ্টিকামনা থেকে এককগীতে বকনা বা বেহনা বা আনন্দবোধ — এসব সমাজচেতনা-বিচ্ছিন্ন নয়। যখন তা 'তদগতভাবে ভাবিত' তখনই সে সমষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন এবং লোকসংগীত হিমায়ে স্বধ্বংসপ্রাপ্ত। সমাজচেতনা যেখানে শ্রেণীচেতনায় উন্নীত সেখানেই লোকসংগীতের নতুন ধারা প্রবাহিত। সেই ধারাতেই গণনাট্য আন্দোলনের জন্ম। 'অশান্ত' জনতাই সৃষ্টিশীল।

১। গণনাট্য আন্দোলনের ধারায় লোকসংগীত ।

গণনাট্য সংঘ ও গণনাট্য আন্দোলন এক কথা নয়। ১৯৩৪-৩৬ সনে আনুষ্ঠানিক-ভাবে ধনতান্ত্রিক সংকটে সাম্রাজ্যবাদ ফাসিদের উৎকট স্বরূপে আবিস্কৃত — স্পেনের ময়দানে প্রগতিশীল বিশ্ব-গণশক্তির সাথে তার প্রথম যোঝাবিলা। স্বদেশে আনুষ্ঠানিকতার আদর্শে সংঘবদ্ধ শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণীর সংগ্রাম, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের আপদপঙ্খী ধারাকে বাতিল করে আত্মত্যাগের স্বদেশমুক্তির স্বপ্নকে শোষণমুক্তির চিত্রায় উন্নীত ও উদ্দীপিত করল। এই নতুন শ্রেণীচেতনায় ভারতের শোষিত জনসাধারণের লোককাব্য ও লোকসংগীত এক নতুন জীবনবর্ধনে উদ্ভবিত হল। ভারতবর্ষের সর্বত্র নতুন জীবনবোধের তরক লোককাব্য, লোকনাট্য ও লোকসংগীতের যে ফসল সত্তার নিয়ে এল — তাকে সংগঠিত করার চেষ্টাই প্রগতি লেখকশিল্পী সংঘ ও পরবর্তী সময়ে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের জন্ম হয়। কিন্তু নাগরিক শিক্ত মধ্যবিত্তের নেতৃত্বে গঠিত এই সংগঠন এই নতুন সংস্কৃতির আন্দোলনকে শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারলে ও শ্রমিক ও কৃষকের শিল্প ও সংগীত প্রচেষ্টা যুক্ত নিজ নিজ টেডইউনিয়ন ও কৃষকসভার পরিধি ও পরিচালনার মধ্যে থেকেই নিস্তার লাভ করেছে। অবশ্য প্রগতিসংস্কৃতির এ দুধারার মধ্যে যোগাযোগ আদানপ্রদান সবদময়ই হয়েছে। এই সমস্ত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গণনাট্য আন্দোলন নামে জনসাধারণের কাছে পরিচয় লাভ করেছে। গণনাট্য সংঘের চেয়েও তা অনেক ব্যাপক। শিল্পী সাহিত্যিক ও বুদ্ধিবীরা যখন প্রগতি লেখক সংঘ বা গণনাট্য সংঘের ইতিহাস লিখতে বসেন — তখন তাঁরা এদেশের শ্রেণীসংগ্রাম ও গণসংস্কৃতি আন্দোলনের গোড়াকার কথা বলে যান। যেহেতু তাঁদের লেখা পড়ে মনে হয় তাঁদের মস্তিষ্ক থেকেই এই সব আন্দোলনের উৎপত্তি। লোকসংগীতের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতেও এই কথাটি মনে রাখতে হবে। সমষ্টি-চেতনা, সমষ্টি-বীজ, জ্বরের আঞ্চলিকতা, ভাষা ও অভিব্যক্তির বৈশিষ্ট্যকে বাদ দিয়ে ব্যক্তিগত কোনো রচনা লোকসংগীত হয়ে ওঠে না।

আর একটি বিষয় এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে। আমাদের কৃষিপ্রধান অর্ধউপনিবেশিক দেশে কলে-কারখানায় ধীরে ধীরে ক্রমশঃ সেই শ্রমিকদের সঙ্গে গ্রামের সম্পর্ক এগনো যুব গনিত। কাজেই শ্রমিকদের সৃষ্টিশীল আত্মপ্রকাশের প্রধান মাধ্যম হল তার ঐতিহ্য-বাহী লোকিক আঙ্গিক। দারাতার শ্রমিক কবির ও গীতিকারের ও নাট্যকারের আনুষ্ঠানিক চেতনা প্রকাশ পেয়েছে 'লাউনি', 'পোয়াডা' কিংবা 'তামাশা' প্রভৃতি লোকিক মাধ্যমে, ঠিক তেমনি বিহার ও উত্তরপ্রদেশ থেকে আসা কলকাতার শ্রমিক-শ্রেণীতে আনুষ্ঠানিক চেতনা আত্মপ্রকাশ করেছে ভোজপুরী, মগ্‌দী বা মৈথিলীর আঞ্চলিক আঙ্গিকে, কাছুরী, চৈতী, রসিয়া ইত্যাদির মাধ্যমে। কাজেই লোকসংগীত কেবল গ্রাম্য কৃষকের সৃষ্টি নয় — গনিত, চা-বাগিচায়, কিংবা কলে-কারখানায় কাজ-কর। শ্রমিকের ও সৃষ্টি।

২ কৃষক কবিদ্বয় রমেশ শীল ও শ্রমিক কবিদ্বয় গুরুদাস পাল

গোড়লা চুই, রথু কর্মকার বা কেটানুচি থেকে আরম্ভ করে ভোলা ময়রা বা অ্যাটোনি গিরিসির ঐতিহাসিক রবীন্দ্রনাথ নিকরুণভাণে কথাতাত করেছেন। 'নষ্ট পরমাণু কবির দল' বলে এঁদের বিজ্ঞপ করেছেন। বাংলাসাহিত্যের কোনো কোনো ইতিহাসকার কবিগানকে অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত করেছেন। কলকাতার মুংহুদি ও নবাব বাবু-সম্প্রদায় একসময় ছিল কবিদের দুল আশ্রয়দাতা। বিক্রতরুচি মুংহুদি বাবুসম্প্রদায়ের তরল পরিবেশের উত্তেজনা ঘোণাঘার ভক্তই কবিদ্বয়দের স্রস্রমায়েই পাটতে হতো। রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই: 'উঃরাজের নৃতন স্টে রাজধানীতে পুরাতন রাজসভা ছিল না, পুরাতন আদর্শ ছিল না। তখন কবির আশ্রয়দাতা রাজা হইল সর্বসাধারণ নামক এক অপরিণত বৃদ্ধায়তন ব্যক্তি এবং সেই হঠাৎ-রাজার সভার উপযুক্ত গান হইল কবিদের গান। তখন বথার্থ সাহিত্যরস-আলোচনার অবসর ঘোণাতা এবং ইচ্ছা করতলের ছিল ? তখন নৃতন রাজধানীর নৃতন সমুদ্ভাসী কর্মপ্রাপ্ত বণিক-সম্প্রদায় সন্ধ্যাবেলায় বৈঠকে বসিয়া চুই দণ্ড আমোদের উত্তেজনা চাহিত, তাহার। সাহিত্যরস চাহিত না।'

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ রাজধানীর নৃতন ধনিকশ্রেণীর সঙ্গে কবি-ওয়ালাদের এক করে কেলেছেন। তিনি দেখলেন না সমাজের তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর নিরক্ষর ও অর্থশিকিৎ অতিদরিদ্র স্তর থেকেই এই সব সহজ-কবির। বের হয়ে এসেছিলেন। তাদের রচনার যে 'ভল্লীয়তা', 'অহুপ্রাণের ছটা' 'ইতরভাষা' ও 'শিখিলছন্দ' রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন তা লোককবিদের অপরিমার্জিত স্বভাবজাত নয়, তা ছিল নবাব ধনিক বণিক বাবুদের বিকৃতরুচির খোরাক, যার ঘোণান দিয়ে কবিওয়ালাদের জীবিকা নির্বাহ হতো। পুণ্যপ সাহিত্য সংকলনের লোকসাহিত্য-শাখার সভাপতির ভাষণে প্রায় ১৯১৭ বৎসর আগে গণনাট্য আন্দোলনের অগ্রণী লোককবি পরলোকগত রমেশ শীল বলেছিলেন: 'গ্রামের চাষী গরীব চইল, ফুলিয়া ঝাণিয়া উঠিল ভমিদার মহাজনের দল, চানীরা আর গ্রাম্য কবি ও লোকশিল্পীদের অরসংগঠন করিতে পারে না। গ্রাম্য কবিগণ পেটের দ্বায়ে লাং মোটা অর্থের প্রলোভনে ভমিদার মহাজনদের উৎসব মণ্ডপে আসিয়া ডিডু জমাইল। বাউড়লে ঈয়ারদোণ্ড পরিবৃত্ত ধনী ভমিদার বাবুদের মনোরঞ্জন করিতে গিয়া গামাকবিগণ অশ্লীল ভবীতে নাচিল, গান গাহিল। নারীভাঙির হুংসা রটনা করিয়া তথাকথিত পুণ্ড্রপুত্রবকে পরিচুপ্ত করিল। আমার বক্তৃগত কবিজীবনে অসংখ্যবার এই ভাবে নাচিয়াছি। অশ্লীল গান গাতিয়াছি।...'

রমেশ শীলের দুজিই লোককবিদের মূল্যায়নের ঐতিহাসিক দৃষ্টি। রমেশ শীলের ভাণন গণনাট্য আন্দোলনে লোককবিদের রূপাধরের শ্রেষ্ঠ সাক্ষ্য। প্রথম যুগোত্তর কাল থেকে গণভাগরণের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার কবিগানে, স্বস্থ বৈশিষ্ট্যবোধের চেতনা বেশা যায়। পূর্ববঙ্গে হরি আচাধ্যের মতো কবিদ্বয়রা কিংবা মনোমোহিনী, শেখ সবলার মতো গায়িকারা, স্ববল (মুসলমান ভেলে), গোবিন্দ শাহ প্রমুখ গায়করা তাঁদের রাণাক্ষ

দ্বিধরক ইত্যাদি গানের পাশাপাশি স্বদেশাত্মক গান গেয়ে আমাদের শৈশবে স্বদেশ-চেতনায় উদ্দীপিত করেছেন। এঁদের শ্রোতা রবীন্দ্রনাথ বণিত 'সর্বসাধারণ নামক এক অপরিণত স্কুলায়তন ব্যক্তি' ছিল না। গ্রামের ধনিকশ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতা তাঁরা পেলেও তাঁদের প্রধান শ্রোতা ছিল গ্রামের গরিব জনসাধারণ। জনসাধারণের আন্দোলনের আবেগ তাই তাঁদের গানে স্পন্দিত হতো। বাগ্ম্যুচ্চ থাকলেও জনসাধারণের চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিকে তা উদ্দীপিত করত। রবীন্দ্রনাথ যেখানে দেখেছিলেন টোল কাদির কোলাহল, আমরা সেখানে দেখছি কবির আসরে বাংলা। টোলের রাসিক্যাল উৎসর্গ। রচনায় সবসময় নৈপুণ্য না থাকলেও তাতে 'জনীয়তা' বা কেবল 'অহুগ্রাশের ছটা' ছিল না। কাব্য এবং ভাবের গাভীও তাতে পেয়েছি। পূর্ববঙ্গে সর্বোপরি আমরা পেয়েছি কবিগানের হরের সমৃদ্ধি বা পূর্ববঙ্গের লোকসংগীতকে ঐশ্বর্যশালী করেছে। কিন্তু গ্রাম্য অর্থনীতির সংকটের স্ফূর্তিতে কবিগানের এই ধারাটিও শীর্ণ হয়ে এসেছে। গণনাট্য আন্দোলন 'নটেপরমায় কবিরূপের গানে' আনল এক নতুন জীবন। চট্টগ্রামের পরলোকগত কবিদ্বয় রমেশ শীল ছিলেন তাঁদের অগ্রণী। এই কবিদ্বয়রা স্বাদেশিককতার সঙ্গে এনে যোগালেন শ্রমিকশ্রেণীর স্বত্বজ্ঞাতিকতা।

এখানে আমি শুধু দুজনের বিষয়ে সামান্য আলোচনা করব। এই দুই কবিদ্বয়ের মধ্যে আগেও কিছু আলোচনা হয়েছে। কিন্তু আলোচনার আগে একটা কথা মনে রাখতে হবে। বিশেষ অহুগ্রাশের আবেগ ও উত্তেজনা মুহূর্তে কবিদ্বয় জনসমাবেশে গাড়িয়ে যে স্বতঃস্ফূর্ত কবিতা মুখে মুখে রচনা করেন, পরে স্বাভাবিক অবস্থায় তা সব মনে করতে পারেন না। আগের দিন কবির আসরের কোনো কবিদ্বয়ের কোনো উত্তেজিত মুহূর্তের মৌখিক রচনার ছ-তিন লাইন মনে নিয়ে পরের দিন তাঁরা কাছ থেকে বাকিটা লিখে নিতে গিয়ে আমার এ অভিজ্ঞতা হয়েছে। বিশেষ করে শুকদাস পালের কোনো অহুগ্রাশের কাব্যরচনায় মুগ্ধ হয়ে ও পরে তাঁরা কাছ থেকে লিখে নিতে গিয়ে অনেক ভ্রমিসই পাই নি। লৌকিক কাব্যের আদিকথা। মথুর্জা টমসন বেকথা বলেছিলেন 'They are improvised...on the inspiration of the moment.' — এই প্রায়-নিরঙ্কর গ্রাম্য কবিদ্বয়দের মধ্যে ও তা অংশত প্রযোজ্য। তাই শাস্ত্রভাবে যেমন কবিতা বা গান তাঁরা লিখে গেছেন, বা তাঁদের গান বলে যা সংগৃহীত হয়েছে, সেটা তাঁদের কাব্যশক্তির সম্পূর্ণ পরিচয় বলে মনে নিলে ভুল হবে।

মাইলভাটারের স্বকীবানী কপি যিনি একদিন 'লাহুতে'র ঘাটে যাবার জন্য গান রচনা করতেন :

ক্রিবেগীর ঘাটেতে মাঝি ছোয়ার ধরি যাইও
ভাগ্যীর বর্জকে তরী ধীরে ধীরে বাইও ॥

সেই কবি রমেশ শীল কৃষক-আন্দোলনের নতুন শ্রেণীচেতনায় রচনা করলেন :

আমার খুনে বোটের গাড়ি
তেতাল চৌতাল বাড়ি —

আমার খুনে রেডিও আর বিজলি বাতি জ্বল।

আমি কৃষক, ভূমি মজুর দিনে রাতে পাটি

ভূই শক্তি এক হইলে তারা পিছু যাবে হটি।

এক সঙ্গে নিঃশাস ছাড়ি

পর্বত উড়াতে পারি

হুশমন চক্রে চাওনা ফিরি, কী আড়ে তার মূলে ?

সংগ্রামী কৃষকের কবি কৃষককে শোনায়েন নতুন যুগের বাণী :

বাংলার কৃষক ভাইগণ হওরে চেতন।...

পোষণকারী ভূমিদার, ভূমিদার নয় বম-হুয়ার

লাঙল বার ভরি ভার, কৃষকের এই পণ।

স্বাধীনতানে প্রথমসরীবে অস্থপ্রাণিত কবি রমেশ শীল মাইজডাওয়ারের কল্পলোকের
তুরে হুনিয়া ফুলনাগের আশিক হয়ে স্ববাসের সন্ধানী হয়ে গেয়েছিলেন :

মেখে ঘারে মাইজডাওয়ারের আত্মব রঙে মূল

শাঁকে কাঁকে উড়ে পড়ে আশোক অলিফুল।

ফুলের রং দেখেছে বারা, হয়ে গেছে মাতোয়ারা

হুনিয়ার স্থ চায় না তার। চায় না জাতিফুল ॥

মে ফুলের স্ববাসে, দিল খোলে আর আধার নাশে

নিভ রমে চিত্ত ভাসে প্রেমবাণে মূলমূল ॥

মেই কবি সর্বহারার আন্তর্জাতিকতার আলোতে দেখলেন এক লাল হুনিয়া — বার
জন্ম তিনি মুশিদের মোকাম ছেড়ে নেমে এলেন লড়াইএর ময়দানে। তাই এই লোক-
কবি বুদ্ধবয়সে নিগৃহীত, কারাকুদ্ধ হলেও, তাঁর গানের ধারাকে কেউ রুদ্ধ করতে
পারে নি। শেষবয়সেও তাঁর গানে মেই কামনাই অনিবার্ণ :

অত্যাচারের প্রতিশোধ আমার নেওয়া নাইবা হবে

আমার পরে আসবে বারা বোধ করি তারাই নেবে।

সারাজীবন ধরে আমি তারই চেষ্টা করে যাব।

মনের কোনে হয় উঠিবে, কলম দিয়ে তাল বাদ্যব।

লাল মেখেতে করবে খেলা আকাশভরা ছোছনা রাতে

দোল খেয়ে জ্বলবে ব্যতি প্রতিঘরে লাল শিশাতে।

তার আলোতে স্বপ্ন সফল করবে মুক্তি পূজারীর।

সেদিন হবে জানাজানি দোস্ত কারা, হুশমন কারা।...

হিংস্র জন্তুর ডাক খামিবে, পথের বাধা হবে শেষ।

বুক ফুলিয়ে বলে উঠব, এই ত আমার দেশ।

মেটিয়াবুজের শ্রমিক-কবি গুরুদাস পালের রূপান্তর আমাদের গণসংস্কৃতি আন্দোলনের

আর একটি নাম। পিতা মনোহর পাল ছিলেন সংশ্লিষ্ট। কুমোরের কুটারশিল্পে দিন-
ওররান অসম্ভব হয়ে উঠলে, মেট্রিয়ানকালের চটকলে মজুর হন। পিতা জীবিত থাকতে
যথা টংরাঙ্গি ফুলে তাঁর সামান্য শিকার লাভ ঘটে। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন তাঁর চিন্তায়
প্রথম দোল দেয়। সেই সময়ই তিনি গান লিখতে শুরু করেন। তিনি রামপ্রসাদী ও
মুকুন্দদাসী হয়েই লিখতেন ও শ্রমিকদের গেয়ে শোনাতে। সে সময়ও তিনি প্রাচীন
অধ্যাত্মবাদী ধারা থেকে মুক্ত হন নি। শ্রেণীচেতনা ও অধ্যাত্মতত্ত্বের মিশ্রণ ঘটত
তাঁর গানে। মুকুন্দদাসী হয়ে তিনি গাইলেন :

মুক্তি যদি হয় প্রয়োজন
শক্তিপূজার কর আয়োজন
প্রাণের শক্তি আত্মশক্তি
তারেই সবাই সজাগ কর।
মহাশক্তি জাগক প্রাণে
অনুক অনল ত্রিভুবনে
জাগক মজুর জাগক চাষী
কাপুক বিশ্ব চরাচর।

১৯৩২-৪০এ শ্রমিক আন্দোলনে একজন অগ্রণী কর্মী হিসাবে তিনি নেমে পড়েন। সে
সময়ে তাঁর শ্রেণীচেতনা সর্বহারার বিশ্বচেতনায় উদ্দীপিত হয়, সে সময়কার গানে তাঁর
পরিচয় পাই—

জাগো নিপীড়িত, জাগো সর্বহার।
সময় থাকিতে সবে হও ডাই হ'দিয়ার...
রক্ত পতাকা লয়ে যতক মজুর দল
বিশ্ব ভ্রমণব্যাপী জ্বলেছে প্রলয়ানল
ধনিক বণিকদল বাক চলে রসাতল
আজি এই ধরাতল হয়ে যাবে একাকার।

১৯৪৫ সনে কলকাতায় প্রগতি লেখক ও শিল্পীসংঘের আয়োজিত সংস্কৃতি সম্মেলনে
কবিদ্যাল রমেশ শীল ও শেখ ওমানির কবির পালা শোনার পর গুরুদাস পাল পশ্চিম-
বঙ্গের তরঙ্গার লৌকিক পদ্ধতিতেই তাঁর ভাবপ্রকাশের যোগা মাধ্যম বলে বেছে নিলেন।
সেইসময় রমেশ শীল তাঁর গুরু বলে তিনি সব সময় বলতেন। শ্রমিকশ্রেণীর তরঙ্গার
আদরে বিরোধী পক্ষকে ঘায়েল করতে যখন গাইলেন :

হায়রে হায় মান বাঁচানোর কি করি উপায়।
যুরে কিরে পড়েছি এক জোড়োয়ারে পালায়।
পুথলে পরে কাকের ছান।
কা' ছাড়া কেউ বলে না।
যতই বলি শিখাও না ডাই তার

ছুঁচোর পাটের গন্ধ কি আর গোলাপ ভলে যায়।
এবং তার চেয়েও কড়া ভাসায় যখন মালিকের পক্ষ-নেত্রীদের তিনি কবাবাত করেন :
যেমন ভলের স্বভাব নিরগতি
আঙুরের স্বভাব পোড়া
বিড়ালের স্বভাব হাঁড়ি পাওয়া
পাপির স্বভাব ওড়া,
শেকড় স্বভাব যেমন ধারা
চার আনাতে স্বামী

এদের স্বভাব তেমনিধারা ধনিকের গোলামী।
তখনই বুঝতে পারি তরকারি আদিককে তিনি কেমন রপ্ত করেছেন। ভুলনামূলক আলোচনা না করে বলতে পারি, তরকারি তীক্ষ্ণ বাস্তবিকপক্ষে নেবে, উপমা ও উৎপ্রেক্ষার শোষক, শাসক ও তাদের অশুচরদের ঘায়েল করতে গুরুদাস পাল ছিলেন অদ্বিতীয় গণশিল্পী। এ ব্যাপারে তাঁর গুরু রমেশ শীলকে তিনি পিছনে ফেলেছেন। শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রদূত চেতনা ও মালিকের সাপে জঙ্গী সংঘাতেই তাঁর রচনা ও রচনাকে এমন ধারালো করেছিল। নাগরিক মধ্যবিত্ত কবিত্বগীতিকারদের রচনাপারিপাট্য ও হরের কারিগরী খুবই থাক, জনসমাবেশে দাঁড়ালে গুরুদাস পালকে মনে হতো সত্যিকারের গণমনের কারিগর। শাসকের বরুণ উদ্‌ঘাটনের কাজে তাঁর ছুঁড়ি কেউ ছিল না —

আমি কড়া-ডকার দলে

বাইরেতে বোইবী আমি, ভেতরে দুর্নীতি চলে।...
বাস্তবতার ক্যাম্পে গিয়ে ভাসি চোপের মলে
যদি কচে-বারো করতে পারি ইলেকশনটায় তলে তলে।
আমি হিংসার ওপর বজ্র চট। মাঝে মাঝে ক'রে ঘটা
বাক্যচ্ছটায় পটিয়ে লোককে ভেড়াই নিষেধ দলে ;
গরিব-ভবরোর ওপর ঐ যে লাঠিগুলি চলে,
দেটা তোমরা বুঝলে কিনা, মেয়েফ তাদের কর্মফলে।
আমি দ্বিধা করে বলতে পারি, ঐ যে পুলিশ-মিলিটারী
ওরা শাস্তিরক্ষের ক্ষমাদারী, জাঘা পথে চলে।
মাঝে মাঝে ছুইলোকের কেলেকারীর দলে
যত হাড়হাবাতের হড় খামাতে, খামখা গোছার গুলি চলে।
লোকের মশাই এঁড়ে বায়না, তারা নাকি খেতে পায় না
না পেলে কি বাঁচা যায় না ? বলুক তো সকলে ;
চোখ বজ্রের তুলিয়ে লক্ষ্যের কি করে চলে ?
এ তো আমার কথা নয়রে বাপু, রাসায়নের নেকার বলে।...
আমি নাম ভাঙানোর গুরুমশাই, চতুর্ভুজ জানের গোঁসাই

বুদ্ধশিষ্যের অহি ভাসাই বারণসীর জলে,
ইতরজনের সাইকোলজি বুঝতে পাবার ফলে
আমার হোকনা গাড়ির চাকা ডাঙা, হট্টেরে হট্টেরে তনু চলে :
ঘণন ফুটপাতে লোক টেঁসে থাকে গিদের ধকলে
পথের ধুলো উড়িয়ে আমার স্টুডিবেকার গাড়ি চলে
আমি একজন বদেশভক্ত, আমার ছুটি হাতে নারী রক্ত
একটু শক্ত না হলে কি তপ্ত রাগা চলে :...

রবীন্দ্রনাথ 'কলকাতায়' সেই আসরে উপস্থিত থাকলে দেখতেন তাঁর বণিত 'নষ্টপরিমার্গ
কবির দল' গণসংস্কৃতির সংস্পর্শে 'চিরায়ু' হয়ে উঠেছে এবং তাদের 'অহুপ্রাণের ছটা'য়
জল করে না, ঝরে আঙুল ।

গুরুদাস পাল কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন । পরে অসহ্যতার স্রষ্টা মুক্তি পান । প্রেসিডেন্সি
জেলগেট হামলায় অভিযুক্ত বলে আবার ধৃত হন । আলিপুর ভেলে অনশন ধর্মঘট করেন ।
জামিনে তিনি ছাড়া পেয়ে আত্মগোপন করেন । তাঁর নামে পরোয়ানা বের হলে নাম
বদলিয়ে হন সনাতন মণ্ডল । কিন্তু সে সময় তিনি জনতা থেকে আত্মগোপন করেন নি
— প্রায়ই তাদের আসরে হাজির হতেন । তাঁর মতো কর্মীদের সেই সময়কার অবস্থার
সঙ্গে বিরাট-রাজত্ববনে পাণ্ডবদের আত্মগোপন ক'রে থাকার সময় কোরব গুপ্তচরদের
গোপন হানার তুলনা ক'রে গাইতেন :

এমনি মোদের পরে নানিল দমন
পিছু পিছু গোয়েন্দারা করে বিচরণ—
(মোর) বিরাট জনতা কোলে করিছু ভ্রমণ ।

শুধু উল্কাটনে নয়, এম্বিটেশনেও তিনি ছিলেন সমান দক্ষ সে সময় (১৯৬৮-৬৯)
তাঁর অগ্রিকল্পী 'কোলকাতার খবর' কবিতাটি বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিল :

অনেক কি কোলকাতার খবর
বুদ্ধদেবের শিষ্য বারা
অহিংসাতে মাতোয়ারা
ধরলে পেশা মাহুঘমার।
বদ্ধ করে খরের দোর :...

নিষিদ্ধারে নয়নারী ছাত্রছাত্রী হত্যা,
এ যদি হয় শিকারাত্তের আইন নিরাপত্তা
তাহলে আজ সভার মাঝে উচ্চকণ্ঠে কহি
পাঁচশো হাজার অসংখ্যবার আমি রাজত্বোহী ।

গুরুদাস পালের পথ ধরে অগন্ধদের শ্রমিকদের মধ্যে কবি দুলালচন্দ্র রায় তরঙ্গা গেয়ে
শ্রমিকদের উদ্বোধিত করেছিলেন । সে সময় পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গে লোকসংগীতের
ধারাটিতে নতুন তরঙ্গ সৃষ্টি করেছিলেন ছোট বড় অনেক পল্লীকবি । যেমন মালদহে

গম্ভীরায় বিস্তৃত পণ্ডিত ও আবদুল হকিম, ময়মনসিংহে নিবারণ পণ্ডিত প্রমুখ। তরঙ্গা, গম্ভীরা প্রভৃতির প্রাণ হল বিষয়বস্তুর সমসাময়িকতা। স্বভাবতই সে সময় সেগুলির বিকাশলাভ ঘটেছিল বেশি। কিন্তু অস্বাভাবিক ধারাও সঙ্গে সঙ্গে নতুন ভাবে ও বিষয়বস্তুতে উজ্জীবিত হয়েছে। ময়মনসিংহের লোককবি নিবারণ পণ্ডিত এ বিষয়ে একটি শ্রবণীয় ন্যায়। তিনি ময়মনসিংহের পুণিপড়া, দোমাপটের গান প্রভৃতি লৌকিক ধারাকে সজীব করে তোলেন। তাঁর আর একটি অবদান — জারীগানে নতুন বিষয়বস্তু। তাঁর জারীগানে অনেক বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছিল। তাঁরা যখন নেচে নেচে গাইতেন জারীগান :

কপালের ভূষণ ঘুচে কত দিনে রে

হায় ভূষণ নয় না প্রাণে রে ॥

মুখ চিনিয়া বিলি হইল কনটোলার সুইনাইন

টাক্স নাই বার কার্ড পাইতা না শাহীদারের আইন ;

রিলিফের কাপড়ে হইল বালিশের উসার

(হায়রে বালিশের উসার)

কেউ পায় না ছিঁড়া তেনা, কেউ করে বাহার — রে ॥

তখন যেন কারবালার অজ্ঞারের বর্ণনার সঙ্গে দ্রুতিক্রমীভূত বাংলার চাষীর অবস্থার বর্ণনা মিশে যেত। গত যুদ্ধে যখন কটেলা বা কালোবাছার সবটা গায়ে প্রথম এল এবং এখন চাষীর অতি প্রয়োজনীয় জিনিস — এমনকি লবণও পাওয়া যাচ্ছিল না, তখনকার নিখুঁত বর্ণনা নিবারণবাবুর বহু গানে আছে। তীক্ষ্ণ স্নেহে তিনি ঘোষার ঘরে লেপেন :

আমার মজুর মায়ে ত কনটোল বুঝ না।

রান্তে গেলে কান্তে বসে লবণ ছাড়া রান্ধে না ॥

(আহা রে) কার্ড লইয়া কত খুলায়

কত বাবুর পায়ে ধরলাম

ঠেলা ধাক্কা কত খাইলাম রে—

ও আহা রে — আমার ডাড়া ঘরে নেড়ার ছানি

মেঘ না হইতে পড়ে পানি

টেপ্‌টেপানি গেল না রে

আমার টেপ্‌টেপানি গেল না ॥...

ময়মনসিংহের টক প্রখার বিরুদ্ধে হাঙ্গ বিদ্রোহের উপর নিবারণ পণ্ডিত একটি দীর্ঘ গাথা রচনা করেছিলেন। হাঙ্গ আন্দোলনের এই গানটি সে সময় ময়মনসিংহের চাষীদের সংগ্রামী চেতনায় উজ্জীবিত করেছিল।

রুবক কবি নিবারণ পণ্ডিত কারারুদ্ধ হয়ে দিনের পর দিন নির্মম অত্যাচারে মরণাপন্ন হয়েছিলেন। জামিনে মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ নিঃশব্দ অবস্থায় আত্মপোষন করে ভারতে চলে আসেন। — এখানে এসে যে স্বাধীনতার স্বাদ পেলেন তাতে তাঁর সমস্ত আশা চূর্ণ হয়ে গেল — গান লিখলেন :

ছিল বুকভরা অশ্রু।

‘স্বাধীনতা’র দম্ভকা হাওয়ায় ভাঙলো অশ্রুর বাসা রে
ভাঙলো অশ্রুর বাসা।...

কইলে বহু কথা, মনের বাখা কটবার ভায়াগা নাই

হইল বাস্তবহারার নৈরাশ্য বাস্তবতার ভাট।

কথা সত্য কিনা আজও পাই না মাথা গুল্মপার ঠাই

আবার সরকারী সাহায্য পাইল পাইকারের জামাই।...

কিন্তু এত অভাব দারিদ্র্যেও নিবারণ পড়িত বাংলার দুঃখবাদী লোককবিদের পথ
অগ্রসর করেন নি। কারণ তাঁর শ্রেণীচেতনা ও সংগ্রামী চেতনা ছিল অরাজ। তাই সে
সময়ও তিনি গাইলেন :

জোরজুল্মে ডাঙার ভরা ছিল বাদ্যের নীতিধারা

সে নীতি আজ মোড় ঘুরেছে শোষিত দিয়েছে সাড়া ;

জীবনমরণ প্রশ্ন এবার হিসাবনিকাশ জগৎজোড়া।

কোচবিহারে ভূখমিছিলে পুলিশের গুলিতে শিশু বকুল-বন্দনা সহ সাতজনকে
মৃত্যুতে বিহ্বল লোককবির কণ্ঠে জন্ম নিল ‘খাঞ্চার বদলে গুলি’ নামক গীতি-পাখাটি।
নে সময় তা উত্তরবঙ্গের গায়ে গায়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি নিজের চারণ কবি হয়ে
হাটে গড়ে গেয়ে গেয়ে ঘুরেছিলেন :

৭ই শনিবারে—

৭ই শনিবারে, দ্বিপ্রহরে তুখা ভারতে রে

খাঞ্চার বদলে গুলি দিল সাগরদীঘির পারে ॥

শিশু সাত বৎসরের—

শিশু সাত বৎসরের বকুলের হইল মরণ—

ভ্রাতার সাখী হইল ভগ্নী বন্দনা তখন ॥

ইহা পকাশ সন নয়—

ইহা পকাশ সন নয়, তার পরিচয় দিয়াছেন জনতা।

ভুলেন নাই পঞ্চাশহীদ ভাই ভগিনীর কথা।

সভা মিছিল করে—

সভা মিছিল করে, স্পষ্ট করে করেছেন ঘোষণা।

তুখা কণ্ঠে বুলেট দিয়া মরানো যাবে না ॥...ইত্যাদি

এই লোককবিদের পাশাপাশি, গণআন্দোলনের তাগিদে অনেক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত
ঋতবির লোকগীতির সুরে ও ঢঙে বহু গান তখন রচনা করেন যা আন্দোলনের ডেউকা
লোকসংগীতের ধারার সাথে মিশে গিয়েছিল। যেখানে সারিগানে শুনা যেত :

সাংবাদনে গুরুজীর নাম লইও রে সাধুডাই

সাংবাদনে গুরুজীর নাম লইও।

মেঘানে শোনা গেল :

কাহ্নেটারে দিও তোরে শান কিমান ডাই রে

কাহ্নেটারে দিও তোরে শান ॥

ফসল কাটার সময় এলে কাটবে সোনার ধান

দহ্য যদি লুটে আসে কাটবে তাহার জান রে । ...

কিংবা ডাটওয়ালীতে শোনা গেল :

ফিরিয়া দে, দে, দে মোদের কায়র বন্ধুদেরে—

মালাবারের কৃষকসম্মান

তার কৃষকসম্মান ছিল প্রাণ

অমর হইয়া রহিলে দেশের দেশের অস্থরে ॥

কৃষকসম্মান রাখতে ইচ্ছুকমান

তার ফাসীকাটে দিল প্রাণ

ফিরিয়া পাবনা রে মোদের কায়র বন্ধুদেরে ॥ ...

আকস্মিক বিভিন্ন উৎসে ও হুঁরে সেসময় সারা বাংলায় বহু গান কৃষকদের দ্বারা গায় হুঁড়ে পড়েছিল। এসব রচয়িতা অধিকাংশই শহরবাদী হলেও কৃষকজীবনের বহু পরিচিতি তাঁদের ছিল এবং আন্দোলনের মাধ্যমে সংগ্রামী কৃষকদের সঙ্গে তাঁদের অস্থরের আত্মীয়তা গড়ে উঠেছিল। তাঁদের কোনো অর্থকরী বা আনন্দপ্রচারের তাগিদ তাতে ছিল না। গণমনের রূপান্তরের আবেগই ছিল তাঁদের গান, নৃত্য বা কবিতা সৃষ্টির তাগিদ। আত্মকের অধিকাংশ শহুরে লোকসংগীত-রচয়িতাদের সঙ্গে তাঁদের এখানেই মৌলিক পার্থক্য। সে সময়কার বহু রচনা থেকে মাত্র দুটি অন্ত্য জনপ্রিয় রচনার অংশমাত্র দৃষ্টান্তরূপ দিলাম। তা না হলে সে সময়কার পাত অগাধ, এবং অজ্ঞাত রচয়িতাদের রচনার সামান্য পরিচয় দিতে গেলেও একটি প্রবন্ধের পরিধিতে তা সম্ভব নয়। প্রবন্ধ শেষ করার আগে একটা বিষয়ে সামান্য আলোচনার দরকার আছে।

২ গণসংগীত ও লোকসংগীত ॥

অনেকেই ‘গণসংগীত’ ও ‘লোকসংগীত’ এই দুটি কথা গুলিয়ে ফেলেন। গণসংগ্রামের চেতনায় উৎসৃষ্ট লোকসংগীতের ধারাটি গণসংগীতেরই অন্তর্গত, কিন্তু গণসংগীত মাত্রই লোকসংগীত নয়। গণসংগীত কথাটা অনেক বেশি ব্যাপক। স্বদেশী সংগীত বা দেশাত্মবোধক গীত বলতে আমরা যা বুঝি, তার সাথে ভাবে ও ভঙ্গিতে একটা পার্থক্য ব্যাখ্যার অজুহাদ গণসংগীত বা গণসংগীত শব্দটার উৎপত্তি। বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম স্বদেশ-চেতনা এবং পরাধীনতার বেদনাবোধে যে গীতের স্রস, তাকে আমরা স্বদেশী সংগীত কিংবা দেশাত্মবোধক সংগীত বলে থাকি। সেই স্বদেশী সংগীতের একটা বড় অংশ ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনবাদের প্রভাবে আচ্ছন্ন ছিল, অনেকসময় আবার জাতীয় চেতনা

সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের আদর্শে প্রভাবান্বিত ছিল। দেশের গানে দেশাত্মবোধের আবেগ ও বেদনা থাকলেও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গণবিশ্রোহের চেতনা ছিল না। দেশের মুক্তির সঙ্গে শোষণমুক্তির চিন্তার মিলন ঘটে নি। অমরীষী জনতাই দেশ, তাদের মুক্তি ছাড়া দেশের মুক্তি অর্থহীন, একথা সেদিনের গানে ব্যক্ত হয় নি। স্বদেশচেতনা যেখানে গণচেতনায় মিলিত হয়ে শ্রমিকশ্রেণীর আত্মজাতিকতার ভাবাদর্শের সাগরে মিশলো সেই মোহনাতেরই গণসংগীতের জন্ম।

ভাব বা বক্তব্যে এক হলেও, ভঙ্গিতে বা আঙ্গিকে গণসংগীতেরও বিভিন্ন ধারা আছে। প্রমজীষী জনতার ভাবপ্রকাশের প্রধান মাধ্যমটি লোকসংস্কৃতি। স্বভাবতই লোকসংগীতের প্রণয়মান ধারা নতুন গণচেতনায় নতুন জীবনবোধে উজ্জীবিত হল। এই বিষয়ে প্রথমে আলোচনা করছি। গণসংগীত অস্বাভাবিক অলঙ্কারে অবলম্বন করেও নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। রবীন্দ্রনাথ, বিজয়লাল রায়, অতুলপ্রসাদ, কাজী নজরুল প্রমুখ সৃষ্টিকারদের দেশাত্মবোধক ভঙ্গি অমূল্য করে বহু সার্থক গণসংগীত রচিত হয়েছে। তোছাড়া পাশ্চাত্য বৃন্দগীতের বা স্বর-সঙ্গতির আঙ্গিকেও গণনাট্য আন্দোলন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় গণসংগীতকে সমৃদ্ধ করেছে। শ্রমিকদের হরতাল বা কৃষকের তেড়াগা আন্দোলনের বিষয়বস্তু নিয়ে—

টেউ উঠছে, কারা টুটছে, আলো ফুটছে, প্রাণ জাগছে—

লাগে লাগ করতাল হরতাল ঠেকেছে—

হরতাল — হরতাল — হরতাল —

আজ হরতাল, আজ চাঞ্চাল্য

গুরু গুরু গুরু গুরু ডবল শিনাকীর বেজেছে বেজেছে বেজেছে

মরাবন্দরে আজ জোয়ার জাগানো টেউ

তরগী ভাসানো টেউ উঠছে...

গানের মতো অনেক সার্থক বিপ্লবী গণগীত রচিত হয়েছে। এগুলির স্রষ্টার বিশ্বাস 'অধুনিক সৃষ্টিশীল (modern creative) পরীক্ষামূলক। এসব গণসংগীত কোনো অবস্থাতেই লোকসংগীতের শ্রেণীতে পড়ে না (একজন বিশিষ্ট সংগীত সমালোচক এই গণসংগীতকে লোকসংগীত বলে মারাত্মক ভুল করেছেন)।

লোকসংগীত স্রষ্টা ভঙ্গিতে ও বাক্যবিজ্ঞানে আকলিকতার বৈশিষ্ট্যে দীর্ঘাবধি। অমরীষী জনতার মধ্যে কোনো গান জনপ্রিয় হলেই তা লোকসংগীত হয়ে ওঠে না।

১. উপসংহার :

উভয় বন্ধে গণনাট্য আন্দোলনে তথা নবসংস্কৃতির আন্দোলনে লোকসংগীতের রূপান্তরের দ্বারা অতি সামান্য পরিচয়মাত্র এখানে দিলাম। বঙ্গদেশের তুলনায় মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, অন্ধ্র, কেরালা বা পাঞ্জাবে লোকসংগীতের ক্ষেত্রে এই রূপান্তরের ধারাটি

ছিল আরো অনেক বেগবান ও কণ্ঠশীল। তার বড় কারণ, বঙ্গদেশের নাগরিক সংস্কৃতি ও লোকসংস্কৃতির মধ্যকার বিরাট বিভেদ ও ব্যবধান। এখানে গণনাট্য আন্দোলনে নেতৃত্ব করেছেন কলকাতাবাসী মধ্যবিত্ত শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীরা, গানের আসরে লোকসংস্কৃতি এবং লোককবির। কোনোদিনই বিশেষ মর্যাদা পান নি।

যাহোক, লোকসংগীতের রূপান্তরের রূপরেখাটিই মাত্র তুলে ধরতে চেয়েছি এত আলোচনায়। ইহানীঃ কিছু শিল্পী ও পণ্ডিতব্যক্তি লোকসংগীতকে 'যুগোপযোগী' করার চেষ্টা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন। যুগ জনসাধারণেই পান্টায়, গবেষকরা নয়। গ্রামে বিজলী তার গেলেই রুশক যুগোপযোগী হয় না— হাতে সংগ্রামের হাতিয়ার নিলেই রুশক যুগোপযোগী হয়। লোকসংস্কৃতির যুগোপযোগী পরিবর্তনের প্রক্রিয়াটা ও তার অসুগম।

উপরে লোকসংগীতের মূল্যায়নে গ্রহণ বর্জনের যে জটিল প্রক্রিয়ার কথা বলেছি— গণনাট্য-আন্দোলনদ্বারা লোকসংগীতের খেলায় ও তা সমভাবে প্রযোজ্য। রমেশ শীল গুরুদাস পাল বা নিহারণ পণ্ডিতের। এমন অনেক গান লিখেছেন যা সংগ্রামী জনসাধারণ এগিয়ে যাবার পথে বর্জন করে বাবে।

কবিবিপ্লবের প্রথম পদক্ষেপেই সামন্তীয় ধ্যানধারণায় আবদ্ধ এইসব লোককবির নতুন যুগের বাণী নিয়ে বেগ হয়ে এসেছিলেন মাঠে-ময়দানে। কিন্তু রুশকসভা বা মজুর সংগঠন অর্থনীতিবাদ ও রাজনৈতিক সংস্কারবাদে আচ্ছন্ন হয়ে আন্দোলনের বৈপ্লবিক প্রবাহকে চোরাবালিতে বন্দী করল। তার স্বপ্নেই প্রভাব দেখি এই শ্রেণ্য লোককবিরে বড় গানে। শেষদীবনে কেবল ছোট বৈতরণী পারাপারের খেয়ামাকির গান লিপ্তেই তাঁদের উৎসাহিত করেছেন গণসংস্কৃতির আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ। তাই দেখি যে আশা? কবিয়াল গুরুদাস পাল রোগগ্রিষ্ট শরীরে আসরে গাড়িয়ে বন্দন্য করেছেন :

পথে পথে শতে শতে গেয়ে চলি গান
বতদিন বাংলার এ মহাশ্মশান
না জাগিবে, না ফুটিবে নব কিশনয়।
অত্যাচারীর মানিমাথা পরাজয়
না উড়াবে জনতার বিদ্রোহ নিশান
ততদিন শান্ত মোর হবে না তো গান...

সেই কবিয়ালকেই দেখি 'ডোন্টের বাক্সে সমাধান'-এর আত্মন জানাচ্ছেন।

দ্বিতীয়বার যখন কলকাতায় রমেশ শীল এসেছিলেন তখন সেই শ্রেণ্য কবিয়ালদের সঙ্গে গণনাট্য-আন্দোলন সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেছিলাম। তাঁকে একটা মন্তব্য করেছিলাম এবং তিনি তা সহজমনে স্বীকার করেছিলেন। আমি বলেছিলাম আপনার 'মাইলদাগারী' মরসীমা গানগুলিতে যে কাবোয় মাদুর্য পাই আপনার গণসংগীত-গুলিতে তা এত কম পাই কেন? তিনি উত্তরে যা বলেছিলেন তারা মর্যাদা হল— একটা আসছে 'স্বস্তরের ডাগিদে' আর একটা 'বাহিরের আন্দোলনের ডাগিদে'। অর্থাৎ যে মরসীমা ভাবে রমেশ শীল আউলিয়া হয়ে গেয়েছিলেন :

আমার ভাবের ঘরে আগুন দিল করে

সদাই প্রাণ খুঁজে বেড়াই তারে।...

ঐতিহাসিকের বিশ্ব-দর্শন, শোষণের মুক্তি, তথা বিশ্বমানবের মুক্তির দর্শন সেভাবে ভাবের ঘরে আগুন জ্বালাতে পারে নি। উপলব্ধির গভীরতা থেকেই আসে কাব্যের মাহুর্য। 'বাহিরের তাগিদ' যখন ভিতরেরও তাগিদ হবে, তখনই লোককাব্য লোকসংস্কৃতির সার্থক রূপান্তর ঘটবে। এটা দুই জীবনদর্শনের বিষয়। প্রত্যেকে গণকবি ও গণশিল্পীর এ বিষয় চিরদিন চিনবে। বৈপ্লবিক গণআন্দোলনের শরিকদার হয়ে ঐতিহাসিকের বিশ্বদর্শনের আলোকিত পথে চলেই তার সমাধান সম্ভব। সমস্ত সৃষ্টির আজ সেটাই উৎস। অন্য সব বন্ধা।

একটি প্রেমের গল্প

প্রিয়বরেন্দ্র নির্মালাবাসী, মলিন দিনগুলি মলিনতর হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ আসলে অসুস্থ অবস্থায় ছিলেন, রেগে না উঠ মনে নয়, রেগে না আশা মনে। এখনো এখানে-ওখানে সমাজবিপ্লবের আসন্নতা নিয়ে স্বেচ্ছাশ্রমে পেলেনই বক্তৃতা, ফাঁসি, প্রবন্ধ মন্তব্য করি, কিন্তু সে-সব তো এক ধরনের বক্তৃৎকা। সমাজবিপ্লব মানে আমাদের শ্রেণীর লোকদের সমূল উৎপাদন, আগাগোড়া চোঁড়ে-পুড়ে নতুন করে অর্থব্যবহার বিজ্ঞাস। বহুদিনের মধ্যেও তা হবার নয়। মানিকবাসী 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র কুমুদকে দিয়েই বোধ হয় বলিয়েছিলেন, বেগানে কোনোক্রমে খেয়ে-পেরেই বেঁচে থাকে না, কবিতা লিপিতে উল্লেখ-হওয়াটা তো দেখানে মত্ত অসুস্থের ব্যাপার। আমরা দু'কান কাটা, তাই এখনো দ্বিগুণ গা এলিয়ে আছি। দেখুন, কী তোকা বাবু, যাদের আদৌ কিছু নেই তাদের আরো হৃদে-পিবে যাদের অটল আছে তাদের আরো অটল অর্পণ করার কী মিহিন আয়োজন, অথচ সমস্ত কিছুই ঘটেছে সমাজতন্ত্র-প্রতিষ্ঠার ভণিতায় ভর করে। সমাজের দরিদ্রতর শ্রেণী প্রতি মুহূর্তে চরম গিরতর দিকে আরো একটু নামছে। চাল-গম-তেল-মাজ-কেরোসিন-ছনের অধিমূল্য, পরিবর্তমান জরাজীর্ণতা। এরই মধ্যে, আমরা যারা দু'কান কাটা, অথবা যারা ফাঁসি না, মোটাগুটি আরামেই টিকে আছি; শখের বিশেকের বালাই যাদের নেই, তারা উপরন্তু বদিস্ সাজলোর মুখ দেখছে। এমন অবস্থায় আপনাদের-আমাদের নির্মল চস্ত্রের মতো লোকদের সমাজবিপ্লব নিয়ে বাগাডুহর কুকচির্পণ কাবাচটারই সামিল। আমরা বই পড়ে শ্রেণীভাগ প্রসঙ্গ মথছে ওয়াকিবহাল হয়েছি, কিন্তু তা-ও তো বিভ্রান্ত রসিকতা। অমিকরুশকনির্মম্যবিত্তদের আলোচনে আমাদের ভূমিকা শূন্যের কোঠায়। এমনকি হয়তো 'হারো-একটু বলা চলে। আমাদের পূর্ণাঙ্গের কেউ-কেউ বেশি বুদ্ধির পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে দেশে, বিশেষ করে এই পশ্চিমবঙ্গে, নামসম্বলী আলোচনের যে-সর্বনাশ ঘটিয়েছেন মাত্র কয়েক বছর আগে, সাম্প্রতিক ইতিহাসে তার ভুলনা মেলা ভার। সেই ক্ষতির এখনো তো মাসুল গোনা হচ্ছে। অতএব নির্দীত হতে শেখা ছাড়া আমাদের উপস্থিত অন্ত-কোনো ভূমিকা নেই। যদি অমিকরুশকদের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে না-পারি, তাহলে যেন সরে গিয়ে একপাশে নিচু হয়ে

মিছিলের জ্ঞান পথ ক'রে দিই। যদি মিছিলে যোগ দেওয়ার মতো সাহস না থাকে, তাহলে অন্তত যেন মিছিলে যিশে যাওয়া কেন অস্বাভাবিক, তা নিয়ে তত্ত্ব না-কাদি। স্থানীতি-দ্রনীতির প্রবল নয় এটা, সাধুতা-অসাধুতার প্রবল। কেউ যেন আমাদের বিবেকের কান ধরে সরত হতে শেখায়, অহংবাদ ভুলতে শেখায়, কী ক'রে নয়তা বানান করতে হয় তা শেখায়।

শৈশব-বৈকশ্যের-যৌবনের আকাশস্থলমণ্ডলিকে মধ্যবয়সে এভাবে দলিত হতে দেখে কারো-কারো হয়তো চিত্তবৈধি খলিত হয়ে পড়ে। তারা আত্মমানি ভুলতে চায়, কোনে! অতীতপূর্ব মাদকতায় ডুবতে চায়। তাই কি ইদানীং শুঁড়িখানায় এত ভিড়? দে-রাষ্ট্রনৈতিক দাণ। রোদে পুড়ে, অলে ভিঃ, দিনের পর দিন অধিক বেলা খেয়ে মাঠে-ঘাটে জাহাঙ্গীর ছেটিতে কারখানার কালিমায় একদা আমোলন-সংগঠনে তরুণ থাকতেন, যিনি ছিলেন আমাদের আদর্শ, চিন্তার-ভাবনার লক্ষ্যবিন্দু, তাঁকে পর্যন্ত দেখি ধূসর সঙ্কায় পালানিটোলার ভিড়ে একাকার হয়ে যেতে। মলিন দিনগুলি মলিনতর হচ্ছে। এম-টিক সে-কারণেই বোধ হয়, স্মৃতিতে প্রচুর হয়ে, স্মৃতিতে ইচ্ছে করে তিরিশ' বছর আগের কলকাতায়, আমার মতো গেয়ো মফস্বল থেকে সন্ত-মাগত তরুণের কাছে যে কলকাতা প্রতিভাত হয়েছিল তার আকর্ষণ হ্রাস। নিয়ে। কলকাতা, উনিশশো! তেভাগিনী-চুম্বাশ্রিত সাল, দুঃস্বপ্নের-মহামারীর কড় সেটা, কিন্তু কলক-ঠাসা সেই মহাস্বপ্নবাদের শরীর ভেদ করেও জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করার নিটোল অকীকার ইতস্তত ছড়ানো সে-কলকাতায়। সংগঠন, সংগঠন, ইংরেপে হিটলার শিছু চটছে, নানা প্রতিকূলতা সবও বাংলার গ্রাম-গঞ্জে কৃষক-সভা মনোচ্চারণের মতো তেভাগার বাণী ছড়িয়ে দিচ্ছে, কলকাতার টেমের মজহুর বারাকপুরের চটকলের কর্মী হাওড়া কুলটির লোহা-পেটানো শ্রমিক সংঘবদ্ধতার জাহ্নবী শিখছে, মানিকবাবু সন্ত-সন্ত কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়ে তাঁর নিরাসক্ত গন্তের মধ্য দিয়ে আগুনের ভুল্কি ছড়াচ্ছেন, সমর সেন দিল্লি থেকে স্বীকারোক্তি পাঠাচ্ছেন ছু দেয় বে-গয়লা বে-খাঙড় সরায় ময়ল: তাদের দোস্তিই একমাত্র পরমা গতি, হুডাব মুখোপাধ্যায় ভীকৃতার মুখে লাগি মেরে লাল ঝাণ্ডা ওঠাবার জ্ঞান পাড়ার ছেলেরের ঠেলছেন, জ্যোতিবাবু কাঁধে একটা ছাডারস্বাক কুলিয়ে বাংলা-আসান-বিহারের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত ছুটে বেড়াচ্ছেন বাহগঠনের উদ্বোধনায়, মুজাফফর আহমেদ বস্তির মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশাবলি মানবার জ্ঞান কী কাতারকাতার ভিড়, মধ্যমশ্রেণীর মহারাজকুমার রেহাংগুলাত আচাৰ্যচৌধুরী আমাদের সবাইকে চমকিত ক'রে বিষয়মাশয় পার্টিকে লিখে দিয়ে জনতার দিকে হাত বাড়িয়ে পাড়াচ্ছেন, দৌরীশ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের তিন কন্যা মহিলা আত্মরক্ষা: সমিতিতে প্রাণচকন ক'রে ভুলছেন, হাজার-হাজার ছেলেমেয়ে আমোলনে জড়ো হচ্ছে, ছড়িয়ে পড়ছে পল্লীতে-প্রান্তরে, পার্টির নির্দেশ অহুযায়ী ডেরা বাঁধছে শ্রমিক-পার্টিতে। স্বাধিবিস্ত, নিরববাবিস্ত ঘরের ছেলেমেয়ে, সরকারি-সদাগরি দপ্তরের কেরানিফুল, সাধারণ গৃহস্থবধু, সবাই আন্তে-আন্তে যেন বুঝতে শিখছে জীবন আর বপ্ন দুটো আলাদা ব্যাপার

নয়, স্বপ্নকে সফল করতে হলে জীবনের জটিলতাকে বিশ্লেষণ করতে হবে, আমার জীবনের সমস্যা তোমার ও অত্যাচ পড়শীর সমস্যার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে, সে-সেখার উপলব্ধির আলোয় বুঝে নিতে হবে যে আমার-তোমার-পড়শীর সমস্যা আসলে একই সমস্যা, হুতরাং ছোট বাঁধতে হবে, জীবনকে যদি বৃহত্তর, মহত্তর, সমৃদ্ধতর, সম্পূর্ণতর কোনো হুমায় নিয়ে যেতে চাই, ছোট বাঁধতে হবে, যেদিন ছোট বেঁধে পরস্পরের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাঁধ মিলিয়ে তাৎক্ষণিকের দুঃস্বপ্নবাধাবেদনা ভাণ্ডাভাগি করে নিয়ে এগোতে শিখবো, সেদিন থেকে আমাদের স্বপ্ন আমাদের জীবনের সঙ্গে একীভূত হতে সক্ষম হবে; আপাত-রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা পেয়েই আরো-অনেকদূর আমাদের এগোতে হবে; যদি এগোতে পারি, সমাজব্যবহার গোলনলুচে বদলে যাবে, বদলে যাবে আমরা সবাই, আমি-তুমি-পড়শী, আমরা পৌছে যাবো আমাদের সম্মিলিত স্বপ্নের জীবনে। এঃই মধ্যে, ঝাঁকে-ঝাঁকে হয়তো গবর বাসছে চীন থেকে, লাল কোঁজ অপ্রতিহত এগোচ্ছে নদী-পাহাড় ভিত্তি, চিয়া: কাইশেকের তরঙ্গদল লেঙ্গ গুটিয়ে কর্মমোজা-মুণো, সাংহাই আমাদের, উত্তরনায় আমরা খরখর কাঁপছি, চীনের স্বপ্নের নীলে আমাদের নীলিমা মিশে যাচ্ছে।

ভাবুন, কী ছোরগার আন্দোলন তখন, আবেগের কী উত্তাল ছোয়ার। সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে, পেপারদার নাটককে কলা দেখিয়ে, 'নবাবের' অভিনয় চলছে, লোক ভেঙে পড়ছে। 'নবাবের' পর 'হেঁড়া তার'। সেই সঙ্গে বটুকদা — ভূমিদারের ছরছাড়া। পেয়ালি ছেলে বটুকদা, বেহিশেবী বটুকদা, আত্র-পর্বন্ত-আদর্শের-কাছে-বিকিয়ে-বাক। বটুকদা — 'নবজীবনের গানে' হুঁর দিচ্ছেন, 'মধুকামীর গলি'-তে কী মস্ত মস্তার সন্ধান পেয়েছেন। এদিকে প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ, ওদিকে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, তেউয়ের পরে তেউ, আমরা অভিকৃত, কুটোর মতো ছেস বাচ্ছি, সেই সঙ্গে অঞ্চ মনে প্রত্যয়, আমাদের স্বপ্নের কাছাকাছিই কোথাও বাচ্ছি।

ভাবুন, জর্জ বিশ্বাস, হুচিয়া মিত্রের কণ্ঠে কী ঐশ্বর্য ছিল তখন, কী দার্ঢ্য ছিল। জর্জ বিশ্বাস একটা মোটর সাইকেল চেপে সারা শহরে ঘুরে বেড়াতেন তখন, দুপুরের কোনো-একটা নির্দিষ্ট সময়ে ধর্মতলায় মোটর সাইকেল থেকে নেমে, একটি বিশেষ পান-সিগারেটের দোকান থেকে পান কিনে খেতেন, আমরা মুগ্ধ বিশ্বাসে তাকিয়ে থাকতাম, কারণ হয়তো আগের দিন সন্ধ্যাতেই কোনো সভার তাঁর গান শুনেছি, সেই আশ্রয় স্তম্ভবৈভব, গানের দামাল তেউ রবীন্দ্রনাথের গান, রবীন্দ্রনাথের গান ছাড়িয়ে গণনাটোর গান, তেউয়ের পর তেউ। এবং ক্রান্তিহীন! হুচিয়া মিত্র — বখন-বে-অবস্থার আছেন, অস্থুরোধ-মাত্র বে-কাউকে গান শোনাচ্ছেন, এক অনির্বচনীয় লাভি করে-করে পড়ছে। সম্ভবত সেটা ১৯৪৮ সাল, ফেব্রুয়ারি মাস, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া যুবসম্মেলনের শেষ দিনে সন্ধ্যায় ময়দানে শোভাযাত্রার শেষে সভা, হুচিয়া মিত্র প্রারম্ভসংগীতের অন্ত উঃ পাড়িয়েছেন, কী কারণে হঠাৎ মাইক্রোফোন বিকল, কিন্তু হুচিয়া মিত্র বেশরোজা-অনমনীয়া, একা নিরাতরণ কণ্ঠে গেয়ে চলছেন 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায়

‘ভালোবাসি’, ইশ্রুহর শ্রবকের মতো, সেই গানের রেশ ময়দানের আকাশকে সোভাগ্য-বতী ক’রে তুলছে, গোলা আকাশের নিচে, অদূরে চৌরঙ্গীর মস্ত জলে-চাঁ। আলোর দীপাবলি, আমরা শুক, আমরা মুহম্মান।

কী আশ্চর্য সময় গেছে তখন, ‘মিছিলে বেখেছিলাম একটি মূখ’, এই পঙ্ক্তির পাশা-পাশি হঠাৎ কলকাতার রাস্তার মিছিলে, একেবারে পুরোভাগে, কাধে তেরডাক’রে মুলোবো কাপড়ের খলি, গীতা মূখোপাধ্যায়, ছুঁচোপে আগুনের ঝলক, প্রোগান দিতে দিতে এগোচ্ছেন, প্রোগানের ক্ষণিতরপের উচ্চাচতার সঙ্গে ডান হাত বুড়ায় ডকিতে উপরে উঠছে, নামছে, হাতের সন্মুখ কব্জির অক্ষাশন দীর্ঘ ক’রে প্রতিপাৎ বেরিয়ে আসতে চাইছে, মোহিত হয়ে ডাকিয়ে আছেন আপনি। একটু আগেই তরতে। গীতা মূখোপাধ্যায়কে কমনালয়ে শিষ্ট ডকিতে বসে চা খেতে দেখেছেন, নিহিত এত আগুনের নামাঙ্কতম অভ্যাসও অথচ তখন আপনি পান নি।

মহম্মদ ইসমাইলের চুলগুলি এখন সম্পূর্ণ শাদা হয়ে গেছে, উনিশশো চুয়াল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ সালে কিন্তু অনেক কালের খিলিক ছিল, তাঁকে এসময়ান্বেষের ণমটি থেকে পার্কশার্কাসের ঘাঁটি পর্যন্ত অশিপ্রান্ত ঘুরতে দেখা যেত, লড়াই ট্রামকর্মীদের জোট আরো যাতে দৃঢ় করা যায়। এক সকালের কথা মনে পড়ছে, মে মাস, হাওয়ায় প্রথম ঐষের ঝলক, আগের দিন জর্মানির পতন ঘটেছে, বালিন সোভিয়েট সেনাদলের কুক্কিগত, হিটলার বিবপানে আত্মহত্যা করেছে, সকালের রোদ্দুরে রূপালি ট্রামগুলি উদ্ভাসিত, লাল ঝাণ্ডায়-ঝাণ্ডায় প্রতি ট্রামের অবয়ব একাকার, এমনি-একটি ট্রামের ড্রাইভারের পাশে পাড়িয়ে পরিচ্ছন্ন হিম্মাহানী জবানে ইসমাইল বক্তৃতা দিচ্ছেন, ইন-কিলাব জিন্দাবাদ, লাল ঝাণ্ডা জিন্দাবাদ, কমরেড স্টালিন জিন্দাবাদ। ঠিক যেখানে ট্রামটি পাড়িয়েছিল, কয়েক মাস বাধে ঠিক সেখানেই গুলি চলে, রশীদ আলি দিবস, সারা দুপুরবিকেলসন্ধ্যারাত্রি ছাত্রমুদ্রকরখিকের সম্মিলিত শক্তির প্রহরা, হাওয়াতে কিসের প্রতিক্রিতি, বিপ্লব অভ্যাস, বিপ্লব ঘটছে, এই আমাদের নিয়েই ঘটছে, আমরাই, ঠিক এই মুহূর্তে, ইতিহাস রচনা করছি, দয়া ক’রে অহিংস নেতারা তাদের শাস্তির ললিত বাণী পকেটে গুরে ফিরে যান।

সেই আমার প্রথম পরিচয়ের কলকাতা, প্রথম প্রেমের কলকাতা, ত্যাগের অগ্নন-মাথা কলকাতা, আদর্শের-গহনভায়-ভূবে-ধাক। কলকাতা, বিপ্লবকে-একাই-ছু’হাত-দিয়ে-তুলে-নিয়ে-আসতে সক্ষম কলকাতা। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের বীর খোকারা মুক্তি পেলেন, গণেশ ঘোষ অধিকা চক্রবর্তী অনন্ত সিং, কমিউনিস্ট পার্টিতে নিয়োজিত করেছেন নিম্নেদের তাঁরা, আমরা জেলপানার দ্বারপ্রান্ত থেকে প্রভুদগমন ক’রে নিয়ে এলাম তাঁদের। বিশ্ববিদ্যালয়ের চব্বরে কফিহাউসে, একলক্ষে ও-কলক্ষে উচ্ছ্বাসের জোয়ার। চৌরঙ্গী পাড়ার কোন্ সিনেমাঘরে কী এক ঈষৎ সোভিয়েট-বিরোধী ছবি এসেছে, আমরা দম্ভল বেঁধে প্রতিবাদ জানাতে গেছি, মধ্য কলকাতার যানবাহন শুক হয়ে গেছে। কলকাতা যেন কখনোই দমে পাকবার নয়, ব্যাহত হবার নয়। মাঝে-মাঝে

এই রূপময়ী-স্বপ্নময়ী কলকাতা থেকে দূরে চলে গেছি, কিন্তু কিছুত-কেন-যে-মন লাগে না, ছুটে এসে আবার কলকাতায় প্রবেশ করেছি, স্থিত হয়ে বসবাস করেছি, ভিটকে পেরিয়ে গেছি আবার কবে একদিন, ফের নিশ্চিন্ত অভ্যাগমে ফিরে এসেছি, কলকাতা পরিচিত সখার মতো পুনরালিঙ্গন করেছে। বছর যতই গড়িয়ে গেছে, আমাদের ভাবনায় যুক্তির দায়ভাগ কল্পনাকে একটু-একটু ক'রে কোণঠাসা করেছে, কিন্তু স্বপ্ন তাহলেও নিটোলই থেকেছে। আন্দোলন ক্রমশ ব্যাপ্তি পেয়েছে, শাখা প্রশাখায় দেশের অভ্যন্তরে অনেকদূর নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছে, কেউ-কেউ, প্রথম দিকে গারো তল্লাহতাবে যুক্ত ছিলেন আন্দোলনের সঙ্গে, তারা স্তিমিত হয়ে গেছেন, কেউ-কেউ চারিগো গেছেন-মিলিয়ে গেছেন, কিন্তু অঙ্কে তাহলেও তুল হবার নয়, বিবাহে তাহলেও তল মাঝবার নয়, নতুন নৃপ এসেছে, নতুন ক'রে গড়া হয়েছে স্বপ্নের পরিধি, অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে খেতে-খেতে আন্দোলন এক দুর্ধর রূপ পেয়েছে, ইতিহাস আমাদের দিকে, একটু শুধু ধৈর্য শেখো, অবৈকল্য শেখো। এত ভাগ বার হবার নয়, পৃষ্ঠীভূত নিষ্ঠার প্রতিফলন নলবেই, ইতিহাসের নিয়ম কখনো উটকো পাতে বয়ে যেতে পারে না।

মাত্র কয়েক বছর আগে পর্যন্তও, মনে-মনে, কিংবা দৃঢ় প্রকাশ উচ্চারণে খুশি-খুশি এই আশা নিয়ে সময় কেশণ করা সম্ভব ছিল। কলকাতা, পশ্চিম বাংলা, চাই কি এক-দিন সম্পূর্ণ ভারতবর্ষ কলোনিয়া তিলোত্তমা হবে, আমরা কলকাতায় যারা অধিষ্ঠিত তারা, এবং পশ্চিম বাংলার খেটে-খাওয়া মজুর-কৃষক-করমিক, আমরা পথ দেখাচ্ছি, আমরাই নিয়ামক, অস্ত্র সবাই, আজ হোক দু'দিন বাবে হোক, আমাদের অস্ত্রধারণ করবে, সম্বন্ধে সবাই নবজীবনের গান উচ্চারণ করবে, মরুভিত্তির কেতন তুলন উৎসাহে আকাশে উড়বে। এখানে-ওখানে ব্যক্তিগত খলন-পতন অবশ্যস্বাদী, কারো সাহস অস্ত্র-অনেকের সাহসের চেয়ে কম কিংবা বেশি, কারো কতব্যবোধ সজ্ঞান অনেকের কতব্যবোধের তুলনায় তীক্ষ্ণ অথবা ভৌতা, কারো আন্তরিকতা সজ্ঞা কারো-কারো আন্তরিকতা থেকে উন্নততর অথবা নিষ্কটতর, কিন্তু এ-সমস্তই ডুচ্ছ, যা মূল্যের ব্যাপার তা আন্দোলনের সামগ্রিক ঝোঁক। যদি প্রধান লক্ষ্য ঠিক থাকে, আত্মশাসনিক নিগড়ে বিচ্যুতি না আসে, সংগঠন সব-মিলিয়ে নিটোল প্রবাহে এগোয়, তাহলে ইতিহাস আমাদের প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না। কলকাতা আপাতবিচারে মলিন থেকে মলিনতর হচ্ছে, পশ্চিম বাংলা নানা সমস্যায় জর্জরিত, লড়াই ক'রে-ক'রে জীবিক। নির্বাহের দৈনন্দিন পীড়নে দীর্ঘ হতে-হতে জনসাধারণ বিক্ষারিতজিহ্বা, ইতস্তত একজন-দু'জনের বিভ্রান্তিবোধ, কিন্তু বিপ্লবের বীজাণু এরই মধ্যে জড়ো হয়ে আছে, কিছুই কেলাসাবে না, এই আপাতবিভ্রান্তি থেকেই, হঠাৎ দমকা হাওয়ায়, মুক্তি।

যখন বহুতা মিতে ঘাই, একে-ওকে-তাকে কুটতর্কে পরাভূত করতে বহুপরিকল্পনা হয়, এরনের কপাবর্তী তখন অবশ্যই বলতে হয়, এখনো বলতে হয়। কিন্তু তেমন-যেন ভরসা পাই না আর, মনে হয় যেন নিজের সঙ্গেই প্রতারণা করছি, মনকে স্রেফ ভোগ ঠারছি কারণ মধ্যবয়সী আমাদের আর-কোনো করণীয় নেই, এতদিনের আকাশ-

কৃষ্ণচরন বার্থ, বার্থ, এই কবুলতি করতে হলে এই আসন্নসন্ধ্যাকে কোথায় এখন আশ্রয়
 ভিক্ষা করতে যাবো? আমাদের বড়ো দেরি হয়ে গেছে, সময় শেষ, তাই পুরোনো
 খুঁটিটাকেই শক্ত করে জড়িয়ে ধরি, অথচ ভিতর থেকে যেন আর তেমন উৎসাহের
 সমর্থন নেই, বিবাসের সমাপ্তি নেই, আত্মহতাবোধ কে যেন হুমড়ে-মুচড়ে চলে গেছে।
 এবং যেহেতু আমরা ধর্মচ্যুত, অতএব আমাদের দিয়ে আর-কিছু হবার নয়; যাদের
 এখনো ইতিহাসে আস্থা আছে, আসলে ইতিহাসে আস্থা রাখা ছাড়া যাদের গতি নেই,
 সেই অমর্ত্যবীজেরা তাদের হাতে দায়িত্ব-নির্ভর অর্পণ করে আমাদের বিনীত হয়ে
 বাওয়া উচিত, অস্বস্ত ইতিহাসের কাছে একদা-সমর্পিত এই সামান্য অঙ্গীকারটুকু যেন
 আমরা এখন পালন করি, আমাদের দিয়ে যেনে আর-কিছু হবার নয়।

এই উপলক্ষি, আমার কাছে অস্বস্ত, গেল কয়েক বছরের অভিজ্ঞতাগ্রন্থত। নিরংকর,
 দরিদ্র, পতাকীর শেষে নিভাঁই জনতার দেশ : রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চার করতে হলে
 অস্ত্রতর, উচ্চতর শ্রেণী থেকে বিবেকসম্পন্ন কেউ-কেউকে এগিয়ে এসে আলোচনা শুরু
 করতেই হয়, এটাও ইতিহাসেরই বিধান, সে-বিধানাহুযায়ী জাহ্নু ঘটেছে সোভিয়েট
 ইউনিয়নে, চীনে, ভিয়েতনামে, কিউবা। সুতরাং মধ্যবিত্তপর্যায়ভুক্তদের নেতৃত্বে
 আমাদের নিজেদের দেশে আলোচনা কেন প্রতিহত হবে চট করে তার উত্তর খুঁজে
 পাওয়া মুশিল। হয়তো, যে-দৈর্ঘ্যের অব্যবসায় প্রয়োজন, আমাদের তা পরাহত : ধৈর্য,
 তিতিক্ষা, নানা অবস্থায় অবিচল থাকা, অহমিকাকে ক্ষুরধার তরবার দিয়ে শতভিন্ন
 করে বিসর্জন দেওয়া, ধোঁকার টাটিতে মজে না-বাওয়া, কিংবদন্তীর সংকীর্ণ প্রণালীর
 মোহিনীমায়ায় আচ্ছন্ন হওয়া, এই ঝুটিগুলি আমাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে দে-পরিমাণে
 বর্তেছে, তা হয়তো প্রলয়ংকর। তাই এ-দেশের গরিবদের, বিত্তহীনদের থেকে শিখতে
 হবে, আলোচনার প্রকৃতি-পরিভাষা খোল-নলুচে বদলে নিতে হবে, সংগঠনের চেহারা
 কেন্দ্রে চেনে সাজতে হবে, তিরিশবছরের মধ্যবিত্ততামসির আলোচনাদের পাপকালণ করে
 ফের নতুন করে সব-কিছু গড়তে হবে। সে-গড়ার কাহিনীতে আমরা উহ।

একবার তাকিয়ে দেখুন চারিদিকে, এত জল ঘেঁটে, এত পথ হেঁটে কোথায় আমরা
 পৌঁছেছি, আশাহীন এ কোন উষ্ম বহু। ভূমিতে। দু'তিন দশক আগে যে-উৎসাহের
 উত্তরাধিকার আমাদের গর্ব ছিল, তা এখন নিভাঁই খোলাস হয়ে পড়ে আছে। যদি
 ভিক্ষেস করেন প্রথম ধোঁবন থেকে এই পরিণত মধ্যবয়স পর্যন্ত সময় ক্ষেপণের কী
 নলজ্বতি, এক বিশাল নিষিদ্ধ স্বভাৱ। ছাড়া আমাদের অস্ত-কিছু দাবি করবার থাকে
 না। একদা আমরা স্বপ্ন দেখেছিলাম, কিন্তু প্রথম বয়সে যে কেউই তো স্বপ্ন দেখে;
 আমাদের স্বপ্ন কোনো পাপ ছিল না, পাপ ছিল না, কিন্তু প্রথম বয়সে যে-কারো স্বপ্নেই
 শাধারণত পাপহীনতা ব্যাপ্তি অধিকার করে থাকে। আমাদের পুরুষপ্রীতি-স্নাতপুরুষ-
 স্নাতপুরুষের ভিক্ষেস করত। আমাদের স্বপ্নের সঙ্গে তাদের স্বপ্নের কোনো সাযুজ্য নেই,
 তাদের দ্যানধারণা এরাহুরের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ, শ্রেণীচ্যুতির প্রসঙ্গ পর্যন্ত হয়তো তাদের
 কাছে উপহাস বলে মনে হয়। আমাদের উত্তরাধিকারের সংকীর্ণতার আশ্রিত এই

সংক্ষীর্ণ বিন্দুতে স্থিত হয়েছে।

কনিষ্ঠদের সঙ্গে কথা বলে দেখুন, সমাজবিপ্লব নিয়ে তাদের মাথাব্যথা নেই, নিজেদের নিয়ে নিমগ্ন তারা, পৃথিবী ছোটো হয়ে এসেছে, পৃথিবীর সংজ্ঞা-বিশেষণ-বিশেষণ-ব্যাকরণপ্রয়োগ আত্মন পরিবর্তিত। মিছিলে বেরিয়ে আপনি-আমি সময় নষ্ট করেছি, কনিষ্ঠেরা আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়েছে। মিছিল নয়, তারা ভিড় করতে তিনি মিনেয়ার বাটরে। সমাজচেতনা জড়িয়ে আমাদের আকাংক্ষামরোপণ বিপ্লবকে আদর্শে ভরাবিত করে নি, হুতরাং আর কেন, কনিষ্ঠেরা, চমকে ছেপেচিহ্নেই, নিজেদের স্বপ্নভাবনা আশাআকাঙ্ক্ষাব্যাপ্তাবিলম্বতার প্রতিভাস খুঁজছে শমিতা ঠাকুর-রাজেশ গান্ধার নর্তনকূর্ণনে। আপনার আমার পুত্রকঙ্কাত্তাপ্পুত্রহাতুপুত্রীরা আমাদের লেগে লুপ্ত নিয়েছে, আদর্শ ঠাকা বুলি, কয়েক দশকের টানাশোড়নের উপান্তে আদর্শ ও আদর্শ-চীনতা এক হয়ে যায়, তার চেয়ে হিনি মিনেমা শ্রেয়, আদর্শের প্রত্যক্ষ জর্জর নেই তাতে। সেখানে, দু'বটা-তিনগণ্টার জ্বর যদি রঙিন স্বপ্নের দেশে, দারিদ্র্যহীন, ভেসে বেড়তে চাও, এসো; যদি প্রাত্যহিকতার বুক-ঠেলে-উপলে-ওঠা নিরাশা কয়েক প্রচণ্ডের জ্বর তুলতে চাও, এসো; যদি গোষ্ঠিকে তুলে নিজের একাকিত্বে উচ্ছ্বাস হতে চাও, এসো। তাকিয়ে দেখুন, তিরিশ বছর আমরা লোপানে গলা নাটিয়েছি, প্তোকে শাস্ত রাখতে চেষ্টা করেছি নিজেদের—গার। আমাদের উপর আঁখা আরোপ করেছে তাদের, আর এখন, আমাদের সম্মানসম্মতিরা কীরকম স্বতঃসিদ্ধতার সঙ্গে বিপ্লবের প্রতীপ হাওয়ার ভেসে যেতে উদ্বীণ; তাকিয়ে দেখুন। যা হারিয়ে যাওয়ার তা আগলে বস আর কতকাল প্রতীকায় রইবেন, অস্বস্ত আমাদের সম্মানসম্মতিরা তাতে আর রাজি নয়, কী গভীর উপেক্ষার, কত অস্বস্তিগতিতে দেখুন তারা অস্বস্তচারী।

জানিদের অতএব, মেনে নেওয়া ভালো, অবসিতকৃত্তিকা, আমাদের প্রবেশ-প্রস্থান নিয়ে কাউকে আর মাথা ঘামাতে হবে না। গাছেরটাও পাড়বো তলারটাও বুড়োবো তা হয় না, হতে পারে না। যখন বিশ্বাস রেপেছি, অথচ প্রতীকার ব্রত কখনো শিগি নি, তিতিকায় নিঃসঙ্গের শত্রু করি নি, প্রতিনিয়ত মনে হয়েছে লাঠির সঙ্গে লটকে নিয়ে এই গুলতেই বৃষ্টি আমাদের তুললিত স্বপ্নটিকে নামিয়ে আনা যায়। যায় না। ইতিহাসের কোনো গোষ্ঠামিত সম্ভব নয়। এই সত্যটা শিখতে এই এতগুলি দিন লেগে গেল বলেই আমাদের উপস্থিত আশাভঙ্গ, এবং সম্মানসম্মতিরা আমাদের আয়ত্তের বাইরে। এক-ভাগ্যগায় পাড়িয়ে পা তুলছি, পা নামাচ্ছি; অজাস, তাই এখনো মিছিলে খাচ্ছি, প্রবন্ধ যন্ত্রে করছি, কিন্তু ঘুরে-ফিরে একই ধূয়ো, নিয়তি কেন বাধ্যত। যাদের গবে একদা আমরা পরীক্ষান হয়ে উঠতাম, এমনকি তাঁদের উদ্বাহরণেও আর সম্ভাবনীর সম্মান নেই, রোগশোকতিক্রান্তায় জর্জ বিশ্বাস, নিঃশেষিত-স্মরণ যেন, ধর্মতলায় মোটরসাইকেল থেকে নেমে ছুটপাতের সেই দোকানে তাঁকে আর কোনোদিন পান কিনতে দেখা যাবে না। হুচিয়া মিত্রকে এখনো দেখা যায়, সভায়, সমিতিতে, কিন্তু ঘোষাই আমার উত্তিতে অপরাধ নেবেন না তিনি, যে-কারো সভায়, সমিতিতে,

হয়তো বা সমাজবিপ্লবের সম্ভাবনাকে গলা টিপে রোধ করবার জন্য আয়োজিত যে-সভা, তাতেও, কিন্তু এই ষাটিক গড়াহুগতিকতায় কোনো বিদ্রোহই আর চমক দিবে যায় না, আমরা। বৎসর্ষস্ব স্বতি নিয়ে এককোণে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকি।

আজ থেকে তিন দশক আগে, ভয়চকিত মন্বন্তরের ছেলে, কলকাতায় এসেছিলাম, একই সঙ্গে কলকাতার, এবং সমাজবিপ্লবের স্বপ্ন দেখার, প্রেমে পড়েছিলাম। এতদিন বাদে সন্দেহ হচ্ছে, না, ঠিক প্রেমশেষের ক্ষতু এটা নয়, কিন্তু আশাশেষের ক্ষতু। কলকাতা কোনোদিনই আর কলোলিনী তিলোত্তমা হবে না; সমাজের কাঠামো নিশ্চেষ্ট অচিরভবিষ্যতে বদলাবে, ইতিহাসের অমোঘ নিয়ম মেনে নিজেই বদলাবে; কিন্তু আমাদের কল্পিত বিভদে তা বদলাবে না, সেই ক্রান্তির মুহূর্তে আমাদের দিকে কেউ তাকিয়েও দেখবে না, আমরা ইতিহাসের উচ্ছিষ্ট। এক বন্ধু সেই তিরিশ বছর আগে আমাকে কলকাতার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন, আমরা দু'জন উপাল-পাতাল ক'রে এক সময় কলকাতাকে খুঁজে ফিরেছি, তার অলিতে-গলিতে নাড়িতে-নকড়ে ভীবনের স্পন্দন আবিষ্কার ক'রে বিশ্বয়ে বিলীন হয়ে এসেছি। আমার সেই কলকাতা-চেনানো বন্ধু, ব্রহ্মরাজ সরকার, আজ হারিয়ে গেছেন কোথায়, বর্ষার বিষণ্ণ সমুদ্রায় বহুপরিচিত মুখও যেমন হারিয়ে যায়, তেমনি। লোকপ্রবাদ, অন্ধকার বখন আরো গভীর হয়, তখন শহরের কোনো নিভৃততর গুঁড়িখানায় এখনো ব্রহ্মরাজ সরকারকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব। নির্মালাবাবু, ভয়ে সিঁটিয়ে আঁসি, তবে কি, এই এত গুলি বছরের সেতু পেরিয়ে, সবার উপরে গুঁড়িখানা সত্য, তার উপরে নেই ?

ন দী তী রে

তারপর আমি ইন্দিরা গান্ধীকে জিজ্ঞেস করলুম, আপনি বই পড়তে ভালোবাসেন ?

উনি একটু হেসে বললেন, ছেনেবেল্য আমি বইয়ের পোকা! হিন্দুম।

— এখন বই টাই পড়ার সময় পান না বোধ হয় !

— সেরকম সময় পাই না, তা ঠিকই। তবে, যেটুকু সময় বাচানো যায়...সেমন ধরো, যখন এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে হয় — এরকম প্রায়ই যেতে হয়, বিমানে বসে আমি কান্নার সঙ্গে কথা বলি না, শুধু বই পড়ি। একবার আমাকে যাবার সময় আত্রে মল্লরোর ‘অ্যাণ্টি মেমোর্যার্স’ বইখানা পড়ছিলাম, মাত্র আটচল্লিশ পাতা পড়া হলো, সেখানে পেত্র-মার্ক দিয়ে রাখলাম, আর সুযোগই পাই নি, তারপর লুসেমবার্গ যাবার পথে আবার উনপকাশ পূর্ঠা থেকে

— এ বইটাতে আপনার বাবার সম্পর্কে চমৎকার লিখেছেন

— হুঁ

কণা থামিয়ে তিনি পাশ থেকে একটা কাগজের কামাল তুলে নিলেন। সেটাতে স্তম্ভ রয়েছে। বিমানযাত্রার সময় এরকম কাগজের কামাল দেয়, আমি ঘেঁষেছি, একটু ভিক্ষে ভিক্ষে থাকে — মুখ ঘুছে নিলে পরিকারও হয়, আবার গন্ধের জন্ত মন ভালো হয়। এয়ার হস্টেল যখন ট্রে-টা বাড়িয়ে দিয়েছিল, তখন আমি একটার বদলে তিনটে তুলে নিয়েছিলাম। এরকম নিয়ম নয়, তবে আপত্তি করে না।

উনি কি একটার বদলে তিনটে তুলে নেন কখনো ? তারপর মনে পড়লো, ওর দরকার হয় না। ঠেকে এরকম বিধায় পড়তে হয় না।

উনি পায়ে গর পা তুললেন। উকর কাছে শাড়ী পেন করলেন এক হাত দিয়ে, শিশুর মতন চিবুকটি উচু ক’রে একপলক চিন্তা ক’রে নিলেন অতকিছু।

তারপর উদাসীনভাবে বললেন, সবাই আমার কাছে এসে নানারকম প্রশ্ন করে। আমি কাউকে কোনো প্রশ্ন করি না। আমার কাজ শুধু উত্তর দেওয়া।

— এং অধিকাংশই অবাস্তর প্রশ্ন।

— প্রায়

— তাহার আর একটাই প্রশ্ন আছে । কিরকম লাগে জীবনট? এর নাম কি স্বপ্ন ?

— স্বপ্ন ?

— ঠাঃ ।

— তাহের কথা চিন্তা করি নি । জীবনে যখনই কোনো সংকট এসেছে, তখনই ফেবেছি, আশায় যেন বেউ হারাতে না পারে । কখনো তো হারি নি আমি । অনেকবিছুট অসম্পূর্ণ আছে । কিন্তু হেরে যাই নি ।

আপনি বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের ‘গাফারীর আবেদন’ পড়েন নি । সেখানে তিনি এট কথাই দুর্গোধনের মূখে বলিয়েছেন :

‘স্বপ্ন চাহি নাই মহারাজ—

জয় ! জয় জেয়েছিছ, জয়ী আমি আত ।

কুত্র স্বপ্নে ডরে নাকো ক্ষত্রিয়ের কৃপা —’

— তুমি আমার সঙ্গে দুর্গোধনের তুলনা করলে ?

— এনার আপনি প্রশ্ন করছেন ।

— এটা পাল্টা প্রশ্ন । উত্তরটাকেই পরিষ্কার করে নেবার জন্য

— না, তুলনা করি নি । কাব্যের সঙ্গে জীবনের তুলনা চলে না । তা ছাড়া, মহাভারতের দুর্গোধন আর রবীন্দ্রনাথের দুর্গোধন এক নয় । আমি বলতে চাইছিলাম, ষাধের হাতে শাসনভার থাকে, তাহের কাছে জয়টাই প্রধান । ‘স্বাভাব্যে আতুর্ধর্ম বন্ধুধর্ম নাই, শুধু জয়ধর্ম আছে —’

— আমি ওটা আমার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে বলছিলাম ।

— আপনার কোনো ব্যক্তিগত জীবন-নেই । আপনি কতদিন একা কোথাও যান নি, কতদিন কোনো নদী দেখেন নি ।

— নদী দেখি নি ?

— সেতু উদ্বোধন করার সময় দেখে থাকতে পারেন বটে ।

তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, চলো !

আমি মনে করলাম, সময় হয়ে গেছে, তাই উনি আমাকে বেতে বলছেন । কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী আগার বললেন, চলো, তোমার সঙ্গে কোনো নদী দেখে আসি ।

আমি বললাম, আপনার ধয়েসী কোনো নারীর সঙ্গে কোথাও বেড়াতে যাবার জন্য আমার প্রলুব্ধ হবার কথা নয় । তবে, আপনার একটা আলাদা আকর্ষণ আছেই । শুধু রাষ্ট্রপ্রধান বলেই নয় । বয়েস হওয়া সত্ত্বেও আপনি এখনো যেন যৌবনের প্রতীক । আপনার হাবভাব, চলাফেরা ও পোষাকের মধ্যে এখনো যৌবনহলুৎ ব্যাপার আছে । স্নেহি আপনি খুব নির্ভুর, কিন্তু আপনার মূখে তার কোনো রেখা পড়ে নি ।

— আমরা নদী সম্পর্কে কথা বলছিলাম । বাবে ?

— সঙ্গে আপনার সাতারজন দেহরকীও বাবে নিচ্চাই !

উনি একটু হেসে বললেন, সাতারজন ! তুমি গুনেছো নাকি ? আমি তো জানি না ।

— একবার রবীন্দ্রসদনে একটা উৎসবে আপনাকে দেখেছিলাম, তখনই শুনছিলাম, সর্বসম্মত সাতাশজন ব্যক্তি আপনাকে পাহারা দিচ্ছে। বাইরে জল পেতে পেতি, দেখানেও দেখি কলের কাছে একজন লোক দাঁড়িয়ে। দেখলেই নোকা যায়, প্রহরী। তিনি আমাকে বলেছিলেন, আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি বলে কেউ জল পেতে আসছে না। অথচ, আমার এখানেই দাঁড়াবার কথা।

— এইরকম চয় বুঝি? যাই হোক, চলো, আজ আমি একাই গঙ্গার ধারে যাবো। একথা ঠিক, আমি পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র গেছি, করতলের মতনই পৃথিবীটা চিনি। তবে অনেকদিন কোনো নির্জন নদীতীরে দাঁড়াই নি। কলকাতার গঙ্গার ধার খুব হৃন্দর?

পৃথিবীর বিখ্যাত দৃষ্টান্তের একটি। কিন্তু আপনি সেখানে যেতে পারবেন না। আপনি নিষেধ করলেও রক্ষীরা শুনবে না। একটু দূরে থেকে অহুসরণ করবে। তাছাড়া—

— তাছাড়া কি?

— বলতে আমার বিধা হচ্ছে। রত্নর পোলে বলতে পারি।

— বলা।

— গঙ্গার ধারের সেই আততায়ী যে রয়েছে!

— তার মানে?

— পৃথিবীর প্রত্যেকটি জায়গাতেই কি আপনার ক্ষত্র একজন আততায়ী অপেক্ষা করে বসে নেই? নইলে এত রক্ষী কেন?

উনি একটা নিশাস ফেলে বললেন, তা আছে। এটা তো অস্বাভাবিক কিছু নয়। আমাকে সরিয়ে দেওয়া ব্যাপারে অনেকেরই স্বার্থ আছে! পৃথিবীর সব রাষ্ট্রপ্রধানের ক্ষেত্রেই এরকম হয়।

— জানি। কিন্তু সব সময়েরই আমাকে একজন কেউ হত্যা করতে চায়, এই চিন্তাটা কেমন লাগে?

— সবসময় মনে থাকে না।

— সবসময়ে রক্ষী থাকার মানেই চেতনে হোক অবচেতনে হোক, এটা মেনে নেওয়া।

— অভ্যাস হয়ে যায়। এটাও পার্ট অব দা গেম।

— রবীন্দ্রসদনের বাইরে জনগণের জায়গায় যে লোকটি একা দাঁড়িয়েছিল, তার সেই দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গির মধ্যে অদ্ভুত একটা কিছু ছিল। সেইজন্য আমি সতর্ক চোখে তাকিয়ে ছিলাম। তার ভঙ্গি অলস অথচ সতর্ক। অন্তরমনস্থের ভান অথচ নভর তীক্ষ্ণ। নিশ্চয়ই ওর কাছে কোনো অস্ত্র ছিল। ঐ লোকটিকেও আমি আততায়ী ভাবতে পারতাম। কিন্তু ও ছিল প্রহরী। ভেবে দেখতে গেলে, আততায়ী ও প্রহরীর মধ্যে বেশ মিল আছে।

উনি আমার কথা শুনে একটু বিরক্ত হলেন মনে হলো। বিখ্যাত ভঙ্গিতে হুক কুঁচকে তাকিয়ে রইলেন একটুক্ষণ। তারপর বললেন, কথার কথা বাড়ে। আমি নদীর কাছে

যেতে চাইছিলাম। একা।

— এক।

— ঠা। এবং তুমি আমার রাস্তা চিনিয়ে নিয়ে যাবে। জানো বোধহয়, আমি কোনো শহরেরই রাস্তা চিনি না। হঠাৎ ভিড়ের কলকাতা শহরের মাঝখানে আমাকে ছেড়ে দিলে আমি বাচ্চা মেয়ের মতন হারিয়ে যাবো।

— কিন্তু তার আগে গন্ধার ধারের সেই আততায়ীর ব্যাপারটা নিশ্চিন্তি হওয়া দরকার নয় কি?

— মনে হয়, সেখানে কোনো আততায়ী নেই। তুমিই তো বললে, সেটা খুব অসম্ভব জায়গা।

— আব্রাহাম লিঙ্কন যখন মৃত্যু হয়ে নাটক দেখছিলেন, তখন মকের ওপর থেকেই লাফিয়ে এলেন আততায়ী। খুনের দৌলখবো নেই।

— কিন্তু আমাকে মারতে চাইবে কেন? আমি কি এই দেশটাকে বাঁচাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছি না?

— দেশটাকে বাঁচানো বড় কথা নয়। কথা হচ্ছে, কে তাকে বাঁচাবে। সবকিছুর থেকেই বড় হচ্ছে সেই 'আমি'। মৃত্যু না হলে কিংবা নিহত না হলে কেউ তো দেশের পরিব্রাতার ছুরিকা ছাড়তে চায় না।

— আমরা কথা বলছিলাম নদী সম্পর্কে।

— নদী নয়, নদীর তীরে একা গড়ানো সম্পর্কে।

— ঠিক। তুমি হঠাৎ এ কথাটা বলেছিলে কেন? আমি কতদিন কোনো নদী দেখি নি।

আপনি বলছিলেন আপনার ব্যক্তিগত জীবনের সম্পর্কে কিছু একটা — আমি বলছিলাম, আপনার কোনো ব্যক্তিগত জীবন নেই। সেই জন্তই নদীর কথা আসে। আপনার এরোগেন আছে, হৃদয় আছে, সেতু উদ্বোধনের তারিখ আছে, কিন্তু আপনার কোনো নদী নেই।

— তাতে কিছু যায় আসে?

— না।

— তাহলে?

— তবু হঠাৎ আপনি নদী দেখতে চাইলেন।

— চেনা। আমাকে কেউ চিনতে পারবে না। কেউ বিবাসযোগ্য মনে করবে না আমার চেহারা। বড় জোর বলাবলি করবে, একে ঠিক ইন্দিরা গান্ধীর মতন দেখতে : স্বয়ং ইন্দিরা গান্ধী হতেই পারে না।

— এ রকম বিভ্রম কোনো চিত্রতারক সম্পর্কে হতে পারে, কিন্তু আপনার সম্পর্কে সন্দেহের কোনো কারণই নেই — প্রতিদিন বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আপনার অসংখ্য ছবি ছাপা হয়।

— কথায় কথা বাড়ে ।

— চলুন তা হলে দেখা বাক পরীক্ষা করে ।

রাজভবনের গেটের বাইরে আমি অপেক্ষা করছিলাম, উনি একটা সাফা শাল ছড়িয়ে বেরিয়ে এলেন । সঙ্গে হয়ে গেছে অনেকক্ষণ । আমাকে ছুটে দিগারেট পোডাতে হয়েছিল ।

উনি এসে বসলেন, কোনোদিন আমি এখানে পায়ে হেঁটে ঢুকি নি কিংবা বেরোট নি — তাই আমাকে কেউ লক্ষ করে নি । সবাই আমার গাড়িটা পাহারা দিচ্ছে ।

— নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে প্রতি পাঁচমিনিট অন্তর আরও অসংখ্য লোকের দেখা করার কথা ছিল ; অনেক দাবি, অনেক অনুরোধ, অনেক প্রতিবাদ ।

— তা ছিল । কিন্তু, যুবক, তুমি নিজেকে বিশেষ সৌভাগ্যবান মনে করো না । মনে রেখো, তুমি আমার পথপ্রদর্শক মাত্র ।

— অদূরে গম্বা, আপনি সোজা চলে যান ।

— তুমি রাগ করলে ?

— আপনাকে একটু আগে আমি বলেছিলাম যে নারীর সঙ্গে সাদাস্রমণে আমি কখনো নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি বটে, কিন্তু আপনার ক্ষেত্রে সেকথা আসে না ।

ইংরেজিতে থাকে বলে ফুল থ্রোটের লাকটার, তিনি সেইভাবে হাসলেন । একথা ঠিক সমস্ত প্রবীণ পুরুষ ও নারীর মধ্যেই কখনো কখনো একটি শিল্পকে খুঁজে পাওয়া যায় ।

রেডিও-ভবনের পাশ দিগে, স্টেডিয়ামের গা ঘেঁবে আমরা হাঁটছিলাম । আবছা অন্ধকারের রাত্রি, পথে অনেক মাহুষজন, কিন্তু কেউ আমাদের লক্ষ্য করছে না । অল্প-বয়েসী যুবক ও যুবতীরা নিঃশব্দের নিম্নেই মত্ত । একটি ডিগারি শিশু অনেকক্ষণ ধরে আমাদের পেছনে পেছনে আসছিল, উনি একটু বিব্রত বোধ করলেন, উনি সঙ্গে পয়সা আনেন নি — খুব সম্ভবত কোনোদিনই ওর নিজের কাছে টাকাপয়সা থাকে না — অন্তত গত কয়েক বছর ।

উনি আমার দিকে তাকালেন ।

আমি বললাম, খুঁজো পয়সা আমার কাছে আছে, কিন্তু ডিকে যেওয়াটা কি ঠিক নীতি ?

— নিজের বিবেককে প্রশ্ন করো ।

— আমার বিবেক এক-একরকম নির্দেশ দেয়, সেই ভিত্তিই আপনার কাছে জানতে চাইছিলাম ।

— আমি মাহুষকে নীতিবোধ শেখাই না ।

আমি ডিগারি শিশুটিকে হন পয়সা দিলাম । সে চলে যাবার পর আমি বললাম, ওর প্রতি দয়াবশত আমি পয়সা দিই নি, আমি চাইছিলাম, ও যেন আর বিরক্ত না করে ।

— কলকাতায় ও-ই কি একমাত্র ডিগারি ?

— না, এখানে ডিয়ারির সংখ্যা তিনলক্ষ একজন।

— একজন মানে ?

— আমাকে নিয়ে।

— তুমি কিম্বের ডিয়ারি ?

আমি একটু চুপ করে রইলাম। তারপর উত্তর দিলাম, বলতে যাচ্ছিলাম, ভালো-দামার, তারপর মনে হলো, এটা একটা ক্লিশে, আবার মনে হলো, ক্লিশে হলেও সত্যি — অথচ এসব মুখে বলা যায় না।

— তুমি ভালোবাসা পাও নি ?

— তা পেয়েছি। তবু একটা ডিয়ারিপনা থেকেই যায়।

— যাদের ওরফত থাকে, তারা খুবই কোনো বড় কাজ করতে পারে না।

— আপনাদের ঐ ভবলতা নেই।

— ছিল এক সময়। খুবই। যখন আগার মায়ের খুব অস্থগ... থাক।

— ছেলেবেলায় একটা লেখা পড়েছিলাম, সফ্রেটিস ইন অ্যান ইণ্ডিয়ান ভিলেজ —

— আমার ক্ষেত্রে সেটা খাটে না।

ইডেন উজানের কোণঠায় এসে আমরা গাড়াই। রাস্তার মাঝখানে গোল একটা স্থাপত্য — এক সময় এখানে বিদেশী কোনো রাজপুরুষের মূর্তি ছিল, এখন শূন্য পেডেস্টাল। মেরিকে কিছুক্ষণ তাকিতে রইলেন। মনোরম হাওয়া দিচ্ছে।

তিনি জিজ্ঞাস করলেন, পথপ্রদর্শক, এবার কোন্ দিকে ?

আমি বললাম, রাস্তা পার হতে হবে। পারবেন ?

সটু সটু করে গাড়ি ছুটে যাচ্ছে, মাছে মাছে বিশালকায় ট্রাক। উনি বহুদিন একলা এইভাবে ট্রাকিকের মধ্যে হেঁটে রাস্তা পার হন নি। কিন্তু সব ব্যাপারেই ওঁর একটা সপ্রতিভতা আছে। ডান দিক ও বাঁ দিকে তাকিয়ে ধীর পদক্ষেপে রাস্তা পার হয়ে এলেন, এই গতিচর্চিতে একটা আভিভ্যাস আছে। ব্যস্ততা ঠেকে মানাতে না।

তখনই কিছু গভীর দিকে না গিয়ে আমি ঠকে নিয়ে কেবলার দিকের রাস্তা ধরে আরও একটু হাটলাম। হাওয়া ক্রমশ প্রবল হচ্ছে। বেশ শীতের শিরশিরে ভাব। উনি গালটা ভালোভাবে শুড়িয়ে নিলেন শরীরে। আপনমনেই বললেন, কলকাতায় আছি, অথচ এতখানি সময় আমার নিষ্কণ, এটা যেন ঠিক বিশ্বাসই করতে পারছি না। কলকাতায় অভিব্যোগ অনেক বেশি থাকে।

আমি চুপ করে রইলাম। আমার দেশলাইয়ের কাঠি ছুরিয়ে গেছে, সিগারেট ধরাতে পারছি না, এইটাই আমার একমাত্র চিন্তা। উট্টো দিক থেকে একজন লোক হেঁটে আসছিল, মুখে সিগারেট, আমি তাকে বললাম, দাদা, একটু আগুনটা দেবেন ? লোকটি থমকে গাড়ালো। আমার সিগারেট ধরাতে যেটুকু সময় লাগলো, সেই সময়ে লোকটি তাকালো ভারত কিংবা পৃথিবীর সবচেয়ে বিখ্যাত নারীটির দিকে। চিনতে পেরেছে

কিনা কে জানে, তবে নিশ্চিত অবাক হয়েছে। পর্যায়ক্রমে আমার দিকে এবং তাঁর দিকে ছ'বার তাকালো।

উনি একটু পাশে সরে পাড়িয়ে দ্বিগুণে তাকিয়ে আছেন এদিকে।

হঠাৎ আমার একবার মনে হলো, এই লোকটিই কি পল্লার ধারের সেই আততায়ী? এর। ঠিক খবর পেয়ে যায়।

আমি লোকটিকে বললাম, থলুবা।

না, লোকটি চিনতে পারে নি। আবার হাটতে আরম্ভ করলো। আমি ঠেকে বললাম, আমি একটু বেশি সিগারেট খাই, আপনি কিছু মনে করছেন না তো?

উনি হাতের ভঙ্গিতে কথাটা উড়িয়ে দিয়ে বললেন, আমরা নদীর দিকে ঘাচ্ছি না কেন?

আমি বললাম, ঠিক কোন্ ভাষায় আপনাকে মানাবে, ঠিক বুঝতে পারছি না। পপগ্রন্থকের অনেক ধারিত্ব।

উনি বললেন, আমি নদী দেখতে এসেছি। আমাকে সবচেয়ে বেশি মানায় উঁচু মকে, সেটা আলাদা কথা।

আবার হাত। পার হবার একটা ব্যাপার হলো। ছোট রেল লাইন পেরিয়ে আমরা এলাম স্ট্র্যাণ্ডে। জায়গাটা নির্জন।

নদী এখন কালো এবং গভীর। একটি আলো কলমস বিদেশি জাহাজ খুব কাছেই তলে পড়েছে লম্বা লম্বা আলোর রেখা। ঘুরে কয়েকটা ভিডি নৌকার লঠনকে এখানে থেকে জোনাকি বলে ভ্রম হয়।

উনি মুখ তুলে তাকালেন নদীর দিকে। বললেন, কই, কিছুই হলো না তো?

— কি?

— আমি ডেবেছিলুম অন্তরকম মনে হবে। কিন্তু আমার মনে পড়ছে কলকাতার কথা, কলকাতা বন্দরের শমশ্রা, বাংলাদেশের প্রয়োজনের কথা, এবং দ্বিতীয় সেতু —

আমি বললাম, আপনি এখনো মকে পাড়িয়ে আছেন কিংবা রাজত্ববনে প্রতিনিধি-সম্মেলনে। আপনি নদীর কাছে আসেন নি।

উনি চোখ বুজে আবার চোখ খুললেন। বললেন, এবার তো ভালো করে দেখতে পাচ্ছি নদীকে।

— জয় না স্বপ্ন, কোনটা?

— প্রশ্ন করো না।

— কি অসহায় মনে হচ্ছে এখন আপনাকে।

একটু দৃপিত ভঙ্গিতে আমার দিকে ঘুরে বললেন, অসহায় কেন?

— জয় না স্বপ্ন আপনি বুঝতে পারছেন না।

— আমি আত্মচিন্তা করি না। আমাকে সারা দেশের কথা চিন্তা করতে হয়।

— এখানে কোনো দেশ নেই। এখানে শুধু নদী, চিরকালীন

উনি থানিকটা অহংকার ও অভিমান মিশ্রিত মুখে তাকিয়ে রইলেন নদীর দিকে।
ওর ঠোঁট কাঁপছে। কিছু খেন বলতে চান।

তারপর নিজেই সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নেমে গেলেন জলের কাছে। নিচু হয়ে
তলে হাত দিলেন।

‘আমি ভাবলাম, উনি নিশ্চয়ই নদীর জল মাথায় ছেটাতে চান। পরক্ষণেই মনে হলো,
এরতো, নদীর কাছে গেলেন কোনো গোপন কথা বলার জন্য। আর তো কেউ নেই।

ଆମ୍ଭାମି ସଂକଳ୍ପ

ସିଦ୍ଧାନ୍ତସ୍ଥଳ ବନ୍ଧୋପାଧ୍ୟାୟେ
କାହିଁକି ଅବଲମ୍ବେ
ଡିଜିଟାଲ୍
ସଂଗ୍ରହ ଓ ଗ୍ରନ୍ଥ

ছবির ভুক্তিতে পর পর পচিশটা নিসর্গদৃশ্যের সাহায্যে পল্লীগ্রামের সকাল থেকে সন্ধ্যা এবং রোদ থেকে বৃষ্টি ও বৃষ্টির পরের অবস্থাটা বৃত্তিয়ে দেওয়া হয়। এই শট-গুলির উপরেই ছবির পরিচয়লিপি বিদ্যুত। শেষ শটে শেষ টাইটলের শিচ্ছেন দেখা যায় মেঘাচ্ছন্ন আকাশে স্বর্গাস্তের রঙ।

CUT

নদীর জল। সকালের রোদ। একটি মেয়ের হাত জলের তলা থেকে উপরে উঠে আসে, জল নিয়ে পেল। করে। ক্যামেরা দিচ্ছিল এলে অনঙ্গবৌকে দেখা যায়, কমলাপেড়ে হালকা বেগুনী রঙের শাড়ি পরে বুকজলে ঝাড়িয়ে আনমনে কী যেন ভাবছে।

এবার হীক কাপালির বৌ ছুটকিকে জলে নামতে দেখা গেল। সে ছপ্, ছপ্, ক'রে এগিয়ে গিয়ে একটা শব্দ শুনে আকাশের দিকে দেখে। এরোপ্লেনের শব্দ।

ছুটকি অ বামুনদিদি — উড়োজাহাজ !

অনঙ্গ ও আকাশে দেখে।

পাঁচটা ফাইটার প্লেন ফরমেশনে উড়ে যাচ্ছে।

অনঙ্গ সত্যি রে, কী হুল্লর দেখায় ! বক যেমন সারি বেঁধে উড়ে যায় না ?

অধর কাপালির বৌ মোক্ষদা (পুঁটির মা) তার মেয়েকে নিয়ে নদীর পাড় দিয়ে নেমে আসে।

মোক্ষদা অ বামুনদিদি — তোমার বাড়িতে কলু এসে তেল নিয়ে ঝাড়িয়ে আছে।

অনঙ্গ থাকুক ঝাড়িয়ে।

মোক্ষদা ওমা, সে কি গো !

ছুটকি বামুনদিদি ঠিক আমার মতো, একবার জলে নামলে আর উঠতি চায় না।

অনঙ্গ সত্যি রে। এর আগে যেখানে ছিলাম না, সেখানে কী জলকষ্ট। এখানে মনের হুখে সীতার দিতে পারছি।

ছুটকি এখন আকণ্ঠ জলে।

ছুটকি ডুব সীতার জান বামুনদিদি, ডুব সীতার ?

অনঙ্গ ওরে বাবা — ভয় করে !

ছুটকি এই জাপো !

ছুটকি জলের তলায় অদৃশ্য হয়ে যায়।

অনঙ্গ চেয়ে আছে, কিন্তু ছুটকি ওঠার নাম করে না।

আমার পিসি - সব মরে গেল। আটজন। আমি মরি নি...

অর্জুন বন।

অনেক ছুটুকি মোক্ষদা ও পুঁটি কলসিকাথে ঘাট থেকে গিরছে।

অনঙ্গ চার বছর হল আমার বিয়ে হয়েছে ত - এই চার বছরে কত দুগেছি জানিস ? - সেই হরিদ্রপুত্র, যেখানে আমার স্বপ্নরবাড়ি। তারপর গাহদেবপুর। তারপর ভাতছালা - যেখানে জলের কষ্ট বলছিলাম না ? - আর তারপর এই নতুন গাঁ। চার লাগগা।

ছুটুকি এখান থেকে আবার ফস্ করে চলে যাবে না ত ?

অনঙ্গ সগে ত এলাম রে। একটু গুছিয়ে বসি !

মোক্ষদা তোমরা এলে বলে সবাই কত খুশি। বলে বামুনদিদির আসাতে গাঁ একেবারে আলো ক'রে দিগেছে।

অনঙ্গ হু - কী যে বলিস !

ছুটুকি ঠিকই ত।

অনঙ্গ কী ঠিক ?

ছুটুকি তোমার বুঝি রূপ নেই ?

অনঙ্গ তুমি গাম ত !

ছুটুকি কত নুনিকষির মন তুমি টাইলে দিতে পার।

অনঙ্গ মারল এক পাগড় - তুই কিংস কম হাস রে ?

ছুটুকি খিল খিল ক'রে হেসে ওঠে।

ছুটুকি ওমা, বামুনদিদির যা কথা !

ছুটুকির হাসি হঠাৎ থেমে যায়। তার দৃষ্টি ঘুরে গেছে ডান দিকে।

দূরে একটি হলধে সাট ও ধুতি পরা যুবককে দেখা যায়। সে কোমরে হাত দিয়ে পাড়িয়ে একদৃষ্টে মেয়েদের দিকে তাকিয়ে আছে।

অনঙ্গ লোকটা কে রে ? কে লোকটা ?

ছুটুকি ইটখোলায় কাজ করে।

অনঙ্গ অমন চ্যাংলার মতো চেয়ে আছে কেন ?

মোক্ষদা ও ওইরকমই। কাছ থেকে যদি দেখনা ত ভয় করবে।

এবার যুবকটিকে কাছে থেকে দেখা যায়। এর নাম যজ্ঞ, লোকে বলে যজ্ঞপোড়া।

যজ্ঞের আমখানা পুড়ে গিয়ে বীজতস চেহারা - দেখলে সত্যিই ভয় করে।

যজ্ঞ এবার দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়ে ইটখোলার দিকে এগিয়ে যায়।

অনঙ্গর বাড়ির বাইরের পিছন দিকটা। একটা বটগাছের খুরি ধরে গ্রামের কয়েকটা

ছেলে দুলছে। অনঙ্গ তাদের সামনে দিয়ে কলসিকাঁপে ভিজে কাপড়ে পিড়কির দিকে এগিয়ে যায়।

মতি মূচিনী বসে আছে পিড়কির ঠিক যুগটাতে, তার পাশেই মাটিতে রাখা একটা চাল ফুথড়ো। অনঙ্গ মতিকে দেখে যুগপৎ পুলকিত ও বিস্মিত।

অনঙ্গ কী রে মতি - কখন এলি ?

মতি এট ত বাঘুন্দিনি !

অনঙ্গ ওটা তোমার গাছের বৃষ্টি ?

মতি হ্যাঁ - তোমার ক্ষয় নিয়ে এলুম।

মতি গলবস্ত হয়ে গড় করে। অনঙ্গ হেসে এক পা পিছিয়ে যায়।

অনঙ্গ দেখিস আমায় ছুঁয়ে দিশনি - নাইতে হবে !

অনঙ্গ চলতরা কলসিটা রাগাবরের দাওয়ায় রাখে।

অনঙ্গ এই একটু আগেই ভাতছানার কথা ইচ্ছিল। ওখানে কী চলকট তাই পরছিনাম এদের।

মতি আমরাও তোমাদের কথা খুব বলি বাঘুন্দিনি।

অনঙ্গ ঘরে গেছে কাপড় ছাড়তে, সেপান থেকেই সে কথা বলে।

অনঙ্গ ওরা সব কেমন আছে রে - কালী, ভান্ন ?

মতি সব ভাল আছে বাঘুন্দিনি।

অনঙ্গ ভান্নর ছেলেরপিলে হয় নি ?

মতি একটা মেয়ে হল যে ভান্নর মাসে - দুমাসও হয় নি।

অনঙ্গ তাই ত হবে। আমরা থাকতেই ত পোয়াতি হল।

মতি এবার তোমার হবে ত বাঘুন্দিনি ? আমরা সবাই এসে মিলি গাব খে।

এবার অনঙ্গকে ঘরে শেরিজ পরা অবস্থায় দেখা যায়। মতির কণায় তার নুপে একটা বিবর্ততার ভাব মেলে ওঠে। কিন্তু পরমুহুর্তেই সে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে।

অনঙ্গ হবার হলে হবে !

অনঙ্গ উঠানে এসে একটা একটা করে কাপড় দড়িতে মেনে দিতে থাকে।

অনঙ্গ ভাবিত বলতে কি - আমরা এখন খুব ভালো আছি রে। বিয়ের পরে একটা বছর কীভাবে কেটেছিল সে ত তোদের বলি নি। উঠানের মানকছ তুলে নিয়ে পান্নিতপুরের হাঠে গিয়ে বিক্রি করে উনি ঘরে চাল আনতেন। ভাতছানাতেও ত - মনে নেই ? - ভুই আর কুড়িয়ে এনে দিতিস - কাঠাল এনে দিতিস।

মতি তা কেনে দেব না বাঘুন্দিনি। তোমরা ছিলে সে আমাদের কত ডাগ্যি।

একথা সবাই বলে।

গঙ্গাচরণকে দেখা যায় গ্রামের পথ দিয়ে বাড়ির দিকে এগোতে। ঠা হাতে ছাতা.. ডান হাতে একটা মাছ। রাস্তা ও বাড়ির কটকের মাঝখানে একটা বাশের ঝাঁকো। সেটা পেরোবার সময় গঙ্গাচরণ পায়ের চাপ দিয়ে একবার দেখে নেয় সেটা যথেষ্ট মজবুত হয়েছে কিনা। পিছনে দূরে রাস্তার ধারে বটগাছের তলায় ছেলেরা হাডুডু খেলছে; গঙ্গাচরণ একবার তাদের দিকে দেখে নিয়ে ফটকের দিকে এগিয়ে আসে।

অনঙ্গ (নেপথ্যে) মতি এসেছে।

গঙ্গা। কেমন আছ, মতি?

গঙ্গা। মাছটা উঠোনের দাওয়ায় রাখে।

অনঙ্গ। মাছটা কত নিল গো?

গঙ্গা। নিধুচরণ দিল। বগ্নে আটটা মাছ উঠেছে, একটা ব্রাহ্মণের সেবায় লাগুক।

গঙ্গাচরণ গামছা দিয়ে ঘাম মুছতে মুছতে উঠোনের উত্তরপূর্ব কোণে থাকে- কেতটার দিকে এগিয়ে যায়।

গঙ্গা। দেখেছ, এই কমাশেই উঠোনের চেহারাটা কেমন শাসে-তলে হয়েছে।

গঙ্গা। এবার ঘরের দাওয়ায় এসে পা ধোয়। অনঙ্গ পাশেই দাঁড়িয়ে গামছা দিয়ে চুল নিষেড়োচ্ছে। এবার সে রাস্তার দিকে এগিয়ে যায়।

অনঙ্গ। তুই বরং একটা ডুব দিয়ে আয় মতি। আমি তোকে তেল দিচ্ছি, তুই পিছন দিক দিয়ে সোজা চলে যাবি—গিয়ে একটা বন পাবি। সেটা পেরোলেই নদীর ঘাট।

অনঙ্গ মতির হাতে সরষের তেল ঢেলে দেয়।

কিছুক্ষণ পর।

একটা ঝিঙে ফুলে ডেঁয়ে পিঁপড়ের ভিড়।

রাস্তার ঘরের দাওয়ায় বসে অনঙ্গ কুটনো কুটেছে আর গঙ্গা মুড়ি খাচ্ছে।

গঙ্গা। আর বিকেলে ডাবছি একটু কথা বলতে বেরোব।

অনঙ্গ। কোথায়?

গঙ্গা। এই এদিক মেদিক। বিশেষ মশাইয়ের ওখানে একবারটি যাওয়া দরকার। উনি ত গায়ের মাতলর লোক। ডাবছি একটা পাঠশালা খুলব, সেই কথাটা ওকে বলা দরকার।

অনঙ্গ। এই যে বললে কবরেদী করবে।

গজা ওটা ত ধরেইছি। শুধু কবরেজীতে কি চলে? এ গায়ে সব মুখ্যস্থান লোক।
এদের একেবারে সবদিক দিয়ে বেঁধে ফেলে দিতে চলে। কবরেজী করব, ভাত পড়ান,
ভাবছি পুরুতগিরিটাও ধরব। এ গায়ে পুরুত নেই, জান ত? কত স্থানিধে বল
দিকি নি।

অনঙ্গ একসঙ্গে এত সব পারবে?

গজা পুরুতগিরি এমন কী কঠিন। পাতিতে ত সব লেখা থাকে। বেধে নিলেই চল।

হাওয়ার পাশে বসে কালী কুকুরটা ল্যাক নাড়ছে। গজা তার দিকে একমুঠো মুড়ি
ছুঁড়ে দেয়।

কী জানি ভেবে অনঙ্গর টোটার কোণে হাসি দেখা দেয়।

অনঙ্গ আঁকে না—

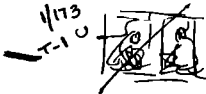
অনঙ্গ বেয়ে যায়।

গজা কী?

অনঙ্গ কিছু না।

গজা কিছু না?

অনঙ্গ ভূমি হাসবে।



অনঙ্গ: কি হবে —

(দুই মিনিট পরে)

অনঙ্গ: ধীঃ

অনঙ্গ: না না না।

অনঙ্গ: না না না না না?

অনঙ্গ: না, না, না, না।

অনঙ্গ: না, না, না?

অনঙ্গ: না, না, না, না, না —

গজা হাসবে কেন? হাসির কথা?

অনঙ্গ (সলজ) জানি না।

গঙ্গা ঠিক আছে, আমি হাসব না, তুমি বল।

অনন্ত আজকে না, পুঁটির মা বলছিল যে আমার রূপে নাকি নতুন গাঁ আলো। হয়ে গেছে -

কথাটা বলেই অনন্ত হেসে ফেলে। কিন্তু গঙ্গা কথা রেখেছে; সে গম্ভীরভাবে এক-দৃষ্টে তার স্বীর দিকে চেয়ে আছে।

অনন্ত কী দেখছে?

গঙ্গা দেখছি কথাটা সত্যি কি না।

অনন্ত আহা, তুমি বুদ্ধি জান না। আগে বুদ্ধি দেখ নি আমার?

নেপথ্যে কণ্ঠস্বর। ম্যালেরিয়া রোগী রামলাল এসেছে।

রাম পেরাম পণ্ডিতমশাই।

গঙ্গা এসো হে রামলাল, বোস।

রামলাল ঘরের দাঁওয়ার দিকে এগিয়ে যায়।

রাম আজো নাড়ীটা যদি একবারটি দেখেন।

গঙ্গা আগে একটু ঠাণ্ডা হয়ে বস ত। এতপানি পথ হেঁটে এলে, নাড়ী চকল হবে যে।

রাম ঠা পণ্ডিতমশাই।

গঙ্গা কলকতে আগুন নিয়ে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

গঙ্গা এ তোমার কোদাল কোপান নয় হে বাপু। এ ডাক্তার-বস্ত্রির কাজ - মাথা ঠাণ্ডা রেখে করতে হয়। দেখি, হাতখান দেখি।

রামলাল ডান হাত বাড়িয়ে দেয়, গঙ্গা গম্ভীরভাবে নাড়ী দেখে।

গঙ্গা ত...কাল কেমন ছিলে?

রাম আজো, রাতে ঘুমাচ্ছি। শরীর বেন একেবারে পাথর!

গঙ্গা কী খেয়েছিলে?

রাম আজো, ছুটি ভাত পেলাম।

গঙ্গা কেন? ভাত খেলে কেন? এ কেমনধারা! আজেল হে তোমার? ভাত খেলে আর সারবে কি করে?

ধমকের কলে রামলাল তারি সংকুচিত হয়ে পড়ে।

রাম আজো, আর পাব নি।

গঙ্গাচরণ ঘরে গিয়ে তাক থেকে কবিরাজী ওষুধ নিয়ে পুরিয়াতে ভরে।

গঙ্গা (স্বগত) চাবার পো - বুদ্ধি আর কত হবে। আরের মধ্যে ভাত খেইয়েছে!

পুরিয়া নিয়ে গঙ্গাচরণ বাইরে আসে, রামলালকে পুরিয়া দেয়।

গঙ্গা। এই নাও। তুলসী গাতার রস দিয়ে মধু দিয়ে মেড়ে বাবে।
রাঘ। আজ্ঞে যা বলেন পণ্ডিতমশাই।

রামলাল নমস্কার করে ফটকের দিকে এগিয়ে যায়।

গঙ্গা। শোন—

রামলাল থামে।

গঙ্গা। ডানো সরষে আছে ঘরে ?

রাঘ। আজ্ঞে তা আছে পণ্ডিতমশাই।

গঙ্গা। হু কাঠ; পাঠিয়ে দিও ত। আমি আবার বাজারের তেল খাই না। কলুরে দিয়ে ভাঙিয়ে নিই।

বিকেল।

গঙ্গাচরণ পড়ন্ত রোদে ছাতা মাথায় দিয়ে হেঁটে চলেছে। পথে বৃদ্ধ চাবী ক্ষেত্রমোহন নমস্কার করে।

ক্ষেত্র। পেমান পণ্ডিতমশাই।

গঙ্গা। তার পৈতেউ। কুতয়ার নিচ থেকে বার করে অঙ্কে জড়িয়ে নেয়।

গঙ্গা। ভগ্নস্ত!

গঙ্গা। এগিয়ে চলে। আরেকটি চাবী—বদ্বীচরণ—গেজুর গাছের মাথায় উঠে রস বার করছে।

গঙ্গা। বলি ও বদ্বী!

বদ্বী। পেমান ঠাকুরমশাই!

গঙ্গা। ভগ্নস্ত!—বলি রসটল পাওয়াও বাবা!

বদ্বী। কাল পেটিয়ে দেবো'মন পণ্ডিতমশাই!

গঙ্গা। আচ্ছা, আচ্ছা!

গঙ্গা। একটি নতুন তৈরি আটচালা ঘরের সামনে এসে হাজির হয়। চাবীরা ভটলা করছিল, তারা গঙ্গাকে দেখেই সম্মুখে উঠে দাঁড়ায়।

সকলে। পেমান, পণ্ডিতমশাই!

গঙ্গা। ভগ্নস্ত, ভগ্নস্ত!

বৃদ্ধ সন্তোষ হাঁক দিয়ে ওঠে।

সন্তোষ। ওয় ওই—ঠাকুরমশাইয়ের জন্য একটা আলন নিয়ে আর!

গঙ্গা। আটচালার দিকে দেখছে।

গজা বেশ করেছ ত ঘরখানা। এইখানে পুজো হয় ?

হীরা আজ্ঞে সামনের বছর থেকে করবার ইচ্ছে আছে।

প্রসন্ন একটা নকশা-করা আসন এনে ঝেড়ে ঝুড়ে দাওয়ার উপর দিচ্ছিলে দেয়।

প্রসন্ন আহ্নন পণ্ডিতমশাই !

গজাচরণ বসে। নটবর কাপালি এবার একটা ঘূর্ণের মতো প্রসন্ন করে বসে।

নট আজ্ঞে আপনি পারবেন পুজো করতে ?

সন্তোষ ঠা ঠা করে ওঠে।

সন্তোষ জানিস না। তুমি না – কথা বলতে আসিস। উনি লেখাপড়া জান। পণ্ডিত –
উনি পারবেন না ত কে পারবে ?

নটবর ভাগি সংকুচিত হয়ে পড়ে। হরিপদ হস্ত পণ্ডিতমশাইকে খুশি করার
জন্তুই তার হাঁকোট। গজার দিকে এগিয়ে দেয়।

হীরা তামাক ইচ্ছে করুন পণ্ডিতমশাই !

সন্তোষ আবার গজিয়ে ওঠে।

সন্তোষ আরে এ কি পাচুঠাকুর পেয়েছিস নাকি ? কোথেকে একটা মোংরা হাঁকো
এনে...গাভান পণ্ডিতমশাই – আমার বাড়িতে আড়ান নতুন হাঁকো রয়েছে, আমি
এনে দিচ্ছি।

গজা ধ্যে এনো।

সন্তোষ হাঁকো আনতে চলে যায়।

গজা কথা বলতে হয় নুকেতনে। পুজো করতে পারব কিনা যে সিদ্ধিঙ্গ করলে,
তোমরা এর কিছু বুঝবে ?

হীরা পর্যন্ত নটবরকে হতম্বনা করে।

হীরা ই্যা – একেবারে অর্গমুখ্য !

গজা বাক গে – এখন যে জন্তু আসা। আমি এখানে একটা পাঠশালা করব বলে
ঠিক করেছি। সেই নিয়ে আজ বিশেষ মণাদের সঙ্গে কথা হবে। তা তোমরা
তোমাদের ছেলেলিলেগুলোকে পাঠিয়ে দিও।

হীরা এ ত খুব ভালো কথা পণ্ডিতমশাই।

প্রসন্ন আমাদের ছেলেলিলের একটা হিলে হয়ে যাবে।

সন্তোষ হাঁকো কলকে এনে দেয় গজাকে।

সন্তোষ এই নিন পণ্ডিতমশাই। নতুন হাঁকো।

হীরা তা আমাদের কত দিতে হবে সেটা যদি একবারটি বলে দেন।

গঙ্গা আমার বাপু ছোট ছবরশক্তি নেই, বুঝেছ। বিজ্ঞানদানঃ মহাপুণ্যঃ। বিজ্ঞানদান করলে কোটি অশ্বমেধের ফললাভ হয়। তবে আমারও ত একটা চলাচলতির বাধ্য। দেখতে হবে। সেই বুঝা তোমরা যা ভালো মনে কর তাই দিও।

বিবেশ মশাইয়ের বাড়ির বাইরের দাওয়া। বাড়ির বেটুকু অংশ দেখা যাচ্ছে তা থেকে বিবেশের সচ্ছল অবস্থাটা বেশ বোঝা যায়। বিবেশ আর গঙ্গা তামাক পেতে পেতে কথা বলে।

বিবেশ আপনি কিছু ভাববেন না পণ্ডিতমশাই, সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আপনি হলেন গিয়ে আমাদের মাথার মণি!

গঙ্গা মাথা আছে বলেই ত মাথার মণি! একথা সকলেই মানে যে আপনি হলেন গিয়ে গায়ের মাথা।

বিবেশ হেঁ হেঁ, বেটুকু আছে তা আপনাদেরই আশীর্বাদে।—এখন, পাঠশালা ত না হয় হলই, কিন্তু আপনার সংসারটা যাতে চলে তারও ত একটা বাধ্য দেখতে চান।

—আপনার বাড়িতে পেতে কজন?

গঙ্গা দুজন। আমি আর আমার পরিবার।

বিবেশ দুজন। তাহলে দশকাটা চলেই আপনাদের মাস চলে যাবে।

গঙ্গা হ্যাঁ, তা একপ্রকার...

বিবেশ আর তেল ছুন ডাল—এ সবও হয়ে যাবে। আমি গলি কি পণ্ডিতমশাই, আপনি পুস্তকগিরিটাও ধরেন।

গঙ্গাচরণ তার কথায় একটা দিবি ভারভাতিক ভাব বজায় রেখেছে।

গঙ্গা কথাটা বলেছেন ভালোই। মানে সংস্কৃতটা ত শিখতে হয়েছে কঠোর করে। খুব শক্ত জিনিস, জানেন ত?

বিবেশ হ্যাঁ—খুব শক্ত!

গঙ্গা একি ব্যর তার মুখ দিয়ে বেরোয়?

বিবেশ বেরোবে কী করে? না শিখলে পরে বেরোবে কী করে?

গঙ্গা ধার্মিকতাঃ রক্তগিরিনিভঃ

চাকচাক্যবতঃসং পুরহুগিবর।

ভীতিহস্তা—ইয়ে, রক্তকলজলাঃ!

বিবেশ হঁ!—খুব শক্ত।

গঙ্গা এটা কী বললাম জানেন?

বিবেশ মশাই অটহাস্ত করে ওঠেন।

বিবেশ খুব ভালো লোককে জিজ্ঞেস করেছেন পণ্ডিতমশাই! আমাদের বিত্তে এই

আঁক আলু পর্বত, জানেন ত ? আর শিশুবোধক । পড়েছেন শিশুবোধক ? -
‘শাপি সব করে রব রাতি পোহাইল, কাননে কুহুমকলি সকলি ফুটিল ।’ - দেখেছেন,
দেই কবে শিখেছি, তুলি নি এখনো !

MONTAGE

পাঠশালা চালু হয়ে গেছে, ছাত্ররা পাঠের নামতা মগন করছে - গঙ্গাচরণ নারায়ণ
হাতে নিয়ে পুস্তক করতে থাকে - গঙ্গাচরণ একটি কয় চাবীর নাকী দেখে বিস্ময়
মতো মাথা নাড়ছে - অন্য লাউ মাচা থেকে লাউ কাটছে - অন্য ডাঁটা শাকের
গাভ কাটছে - রাধাথরের দাঁড়ায় বসে অন্য কুনো কুটছে, গঙ্গাচরণ মুড়ি খাচ্ছে -
বুড়ির মধ্যে গঙ্গাচরণ চালের খলি হাতে গ্রামের পথ দিয়ে বাড়ি কিরছে ।

পাঠশালা ।

বছর ঘুরে গেছে, ছাত্র সংখ্যা বেড়েছে ।

গঙ্গা একটি ছাত্রের স্রেট হাতে নিয়ে আঁছে, তাতে খুব অপর হাতে লেখা একটি
‘ক’ অক্ষর ।

গঙ্গা এই ক হয়েছে ? এই ক-য়ের আঁকড়ি ? দে, হাতখান দে ।

গঙ্গা ছাত্রের হাত ধরে স্রেটের উপর আরেকটা ক লেখায় ।

গঙ্গা এই হল ব, আর এই হল আঁকড়ি, আর এই হল ক । যা ভালো ক’রে লেখ
গিয়ে ।

ছাত্র স্রেট নিয়ে তার সায়গায় চলে যায় । গঙ্গাচরণ গজ গজ করে ।

গঙ্গা লাঙলা চাবা ! লাঙলের মুঠি ধরে ধরে হাত আঁড়ট হয়ে গেছে । অসগা হতে
লাগবে ছয় মাস ! - এই ফটকে !

ফটক লেখা ছেড়ে উঠে দাড়ায় ।

ফটক গুরুমশাই !

গঙ্গা কের গুরুমশাই ?

ফটক স্তার !

গঙ্গা ঠা, স্তার বলবি । ইদিকে আয় ।

ফটক এগিয়ে আসে । গঙ্গাচরণ তার হাঁকোটা কটকের হাতে ধরে ।

গঙ্গা তামাক সেজে আন ত দিকি । তোর কাকীমাকে বলে আশ্রম চেয়ে নিবি ।

ফটক চলে যায় ।

গঙ্গা হেবো!

আরেকটি ছেলে উঠে পাড়ায়।

হেবো স্মার?

হেবোকে কিছু বলার আগেই গঙ্গাচরণ দেখে কিছু দূরে রাস্তায় একটি অপরিচিত লোক পাড়িয়ে তার দিকে দেখছে। এর নাম মধুস্বন।

গঙ্গা কাকে চাই?

মধু আজ্ঞে, আপনার কাছেই আলা।

গঙ্গা তবে কাছে এস।

ছাত্রী পড়া বন্ধ ক'রে মধুস্বনের দিকে দেখছে। মধুস্বন রাস্তার পাশের নালার দিকে চেয়ে কিছুক্ষণ ইউত্তত করে, শেষে একটা লাগ দিয়ে নালার পেরোয়। ছাত্রী তার কদরং দেখে হো হো ক'রে হেসে ওঠে।

গঙ্গা আই, কী হচ্ছে কি? মন দিয়ে পড়া কর।

মধুস্বন পাঠশালার চালার তলায় এসে গঙ্গাকে নমস্কার করে।

গঙ্গা জয়ন্ত!

মধু আজ্ঞে আমি আসছি কামদেবপুর থেকে। এগান থেকে তিন ক্রোশ পথ।

গঙ্গা প্রয়োজন?

মধু আজ্ঞে আমাদের গায়ের আশেপাশে ওলাউঠোর মড়ক লেগেছে। তাই আপনারে ঘেয়ে একবার গাটা বেঁধে দিতে হবে।

গঙ্গা অ, গ্রাম বন্ধন করতে হবে?

মধু আজ্ঞে হ্যাঁ।

গঙ্গা তা সেসব কথা ত এইখানে বসে হবে না। চল, বাড়িতে চল।

গঙ্গা বাঁশের মাচা থেকে উঠে পড়ে। হেবো এগনো আবেশের জ্বল পাড়িয়ে আছে।

গঙ্গা তার কথা ভোলে নি।

গঙ্গা হেবো, তোর বাপকে বলবি কাল এসে খেন ক্ষোরী ক'রে দিয়ে যায়।

হেবো বলব স্মার!

গঙ্গাচরণের বাড়ি।

দাওয়ার এক প্রান্তে মধুস্বন বাঁশের খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসে আছে। বিপরীত প্রান্তে গঙ্গাচরণ তারি চিন্তিতভাবে পাশচারি করছে। দাওয়ার মাঝ বরাবর ঘরের দরজার মুখে অনঙ্গ পাড়িয়ে কথাবার্তা শুনেছে।

গঙ্গা খুব কঠিন কাজ! খুব কঠিন...

মধু কিত্ত এ যে না করলেই নয় পণ্ডিতমশাই। আপনার উপরেই ত সব ভরসা।

গঙ্গা। কুলসুওলিনী ভাগরণ করতে হবে। থরচ আছে। পারবে?

মধু। আপনি যা বলেন পণ্ডিতমশাই। আমাদের গায়ে আমরা মাট-মস্তর ঘর বাস করি। হিন্দু মোসলমানে মিলে চাণা তুলে আমরা সব পরচ হোগাবো। আপনি শুধু বলেন আপনার কী কী লাগবে।

গঙ্গা। তবে পাড়াও। ফর্দ ক'রে দিচ্ছি, নিয়ে যাও।

গঙ্গা বাস্তবাবে ঘরে ঢেকে। চাণা গলায় অনঙ্গর সঙ্গে কথা হয়।

গঙ্গা। তোমার শাড়ি আছে কপানা?

অনঙ্গ। আমার?

গঙ্গা। তোমার না ত কি আমার? চট্ট ক'রে বলে।

অনঙ্গ। আটপোরে তিনখানা আছে। আর একখানা।

গঙ্গা। চারখানা। আর ভালো?

অনঙ্গ। ভালো, ভালো...ভালো আছে দুখান। আর তোরঙ্গের মধ্যে একখান।

গঙ্গা। কী নেবে, ভালো না আটপোরে?

অনঙ্গ। কস্তাপাড় একখানা হলে ভালো হয়।

গঙ্গা। হবে হবে সব হবে। এটা ধর ত—

গঙ্গা হাঁকোটা অনঙ্গর হাতে চালান দিয়ে তাকে রাখা পাতাশত্রেয় মধ্যে থেকে একটা বই বার ক'রে বাস্তবাবে তার পাতা উলটোতে থাকে।

অনঙ্গ। ই। গো—এই যে পুজো না কী বলছিল না—এ তুমি পারবে?

গঙ্গা। আরে পুজোটা ত আর আসল জিনিস না; আসল জিনিস হল স্বাছোর নই খলে ওলাউঠো হলে কী করতে হয় দেখে নেওয়া। ওলাউঠো... ওলাউঠো...

পুজোর ঢাক বাজছে।

কামদেবপুরে একটি প্রকাণ্ড তৈতুল গাছের নিচে মহা সমারোহে গ্রাম বীধার পুজো হচ্ছে। প্রায় শতখানেক লোক গঙ্গাচরণকে ঘিরে পুজো দেখছে। ঘট থেকে শুরু ক'রে একে একে পুজোর সব উপকরণগুলি দেখান হয়। আরতি চলেছে, গঙ্গার ডান হাতে শাঁখ, বাঁ হাতে ঘণ্টা।

আরতির পর হোম। গঙ্গা নিষিধায় মস্তোচ্ছারণের সঙ্গে আরতি দিয়ে চলে, সমনত সকলে সম্মুখের সঙ্গে তার কার্যকলাপ অমুখাবন করে। গঙ্গাচরণের ডান পাশে দেগা যায় মধুসূদনকে, কস্তাগুলিগুটে চক্ষু মৃত্তিত ক'রে বসে আছে।

সবশেষে শান্তিফলপর্ব।

কিত্ত দেখা গেল তাতোও শেষ নয়।

গজ্ঞা আছা, এখন আসল কাজ বাকি।

গজ্ঞা ঘটের পিছন থেকে একটা হলধে কাপড় তুলে নিয়ে জনমওসীকে উদ্দেশ্য করে
প্রশ্ন করে।

গজ্ঞা এ গায়ে নিমগ্ন আছে?

সকলে পরস্পরের মূখ চাওয়া চাওয়া করে।

গজ্ঞা নিমগ্ন ছাড়াই?

মধু আছে।

গজ্ঞা থাকতেই হবে। ঈশান কোণে ত?

মধু আছে তা আপনি যখন বলছেন, তখন তাই হবে।

গজ্ঞা চল, ধরুন বাধতে হবে।

গজ্ঞা ঈশান কোণের নিমগ্নদের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়, সকলে ভিড় করে তার পিছন
পিছন চলে।

গজ্ঞা ও ভালো কথা—নদীর জল থাকে না, অস্বতপক্ষে এক মাস। আর যদি
জিনিস থাকে না। আর মাছি বসলে সে খাবার ফেনে ধেবে, বুঝেছ?

সত্য হয়ে এসেছে। গজ্ঞার গাড়ি করে গজ্ঞা কামদেবপুর থেকে নিজের গায়ে ফিরতে।
ছইয়ের নিচে ধামায় চাল ডাল কলা লাড়ি ইত্যাদি পুজোয় পাওয়া মিধে। গজ্ঞা
ঝিমোচ্ছে। হঠাৎ একটা চিৎকার শুনে গজ্ঞার তজ্ঞা ভেঙে যায়।

একটি বৃক ভল্লোক রাস্তা দিয়ে হৃদয়ঙ্গ এগিয়ে আসছেন। ইনি দীনবন্ধু ভট্টাচার্য।

দীনু ও মশাই, শুনেছেন—

গজ্ঞা (গাভোয়ানকে) হুহে, গাড়িটা একটু থামাও দিকি।

গাড়ি থামে, দীনু দৌড়ে এগিয়ে আসে। হাঁপ ধরার দরুন কিছুক্ষণ তার মূখ দিয়ে
কথা বেরোয় না। তারপর—

দীনু আপনার কাজ হয়ে গেল?

গজ্ঞা চেয়ে আছে দীনুর দিকে, কী বলবে বুঝতে পারে না।

দীনু আমার নাম ঈদীনবন্ধু ভট্টাচার্য। আমি থাকি ওই বাসান গায়ে।

গজ্ঞা তা কী ব্যাপার বলুন ত।

দীনুর হাসি মিলিয়ে যায়।

দীনু আমি না খেতে পেয়ে মরতি পণ্ডিতমশাই। ঘরে একদানা চাল নাই। চালের
দাম চার টাকা থেকে সাড়ে ছ'টাকা হয়ে গেছে।

গজ্ঞা বলেন কী?

দীপ্ত চোখে ভালো দেখতে পাই না, তাই রোজগার গেছে কমে, বয়স হল উনসত্তর, তার উপরে একগাদা পুষ্টি—কী করি বলুন ত।

গঙ্গা তা এ ব্যাপারে আমি আর কী...

দীপ্ত আপনি আজ যা পেলেন, তার থেকে সামান্য কিছু যদি দিয়ে যান—
হংসামাছ—হুটি চাল আর ডাল হ'লই হবে।

দীপ্ত সন্দরূপ দৃষ্টিতে গঙ্গার দিকে চেয়ে থাকে। গঙ্গা তার ধামার দিকে হাত বাড়ায়।

গঙ্গা কিন্তু আমাদের দিকে ত চালের দাম...

দীপ্ত যুগের দরুন নাকি এমনটা হচ্ছে।

গঙ্গা হুঁহু?

দীপ্ত জাপানীরা সিঙ্গাপুর নিয়ে নিয়েছে, তাই নাকি চালের দাম বাড়ছে। আরো বাড়বে; সবই বাড়বে।

গঙ্গা কিছুটা চাল দেয়, দীপ্ত সেটা গামছায় বেঁধে নেয়।

দীপ্ত হুটি ভাল যদি ..

গঙ্গা ভালও দেয় পানিকটা।

দীপ্ত খেতে, খেতে।...আপনি আজ যা উপকার করলেন!—আপনার নামটা...?

গঙ্গা শ্রীগঙ্গাচরণ চক্রবর্তী।

গঙ্গার গাড়ি আবার রক্তনা দেয়। দীপ্ত কিছুক্ষণ গাড়িটার দিকে চেয়ে থাকে, তার পর ছাতা সমেত হাত মাথার উপর তুলে ঠাক দেয়—

দীপ্ত একদিন যাব আপনার গায়ে!

রাত।

রাগ্নারের দাওয়ায় বসে গঙ্গাচরণ বেশ উত্তিসংকারে ভাত পাচ্ছে, অন্য পাখা হাতে তার সামনে বসে।

গঙ্গা একদিন, তুমি যখন রাঁধবে না?—আমি বসে বসে দেখব।

অনঙ্গ রাগ্না শেখার শপ হয়েছে বুদ্ধি?

গঙ্গা তোমার রাগ্নায় এত শোয়াদ হয় কি ক'রে সেটা দেখব। এই যে পেপের ভালনা রেখেছে—এতে কী কী দিলে, কেমন ক'রে দিলে, সেটা একটু বল দিকি।

অনঙ্গ কেন বলব? তুমি ত অনেক কিছুই জান বাপু, এটা না হয় নাই জানলে।

গঙ্গা আর কেনেই বা কী হবে বল। চালের দাম যদি সত্যিই বাড়ে তাহলে ত এসব ভালো ভালো রাগ্নার কথা ভুলেই যেতে হবে।

অনঙ্গ সত্যিই বাড়বে? তুমি যে বলছিলে বুড়ো বানিয়ে বলেছে?

গজা। যুক্বে হকে সেটা ত ঠিক। আর যুক্বে হলে তখন কী হয় সে কেউ বলতে পারে ?

অনঙ্গ। কার সঙ্গে কার যুক্বে হচ্ছে গো ?

গজা। আমাদের রাজার সঙ্গে জার্মানী আর জাপানীর। মাপার উপুর দিয়ে এরোসেন বায় দেখ নি ?

অনঙ্গ। হ্যাঁ! — কী তন্দর লাগে দেখতে।

গজা। এইসব এরোসেন দার যুক্বে করতে।

অনঙ্গ। আচ্ছা কী করে গড়ে বল ত ?

গজা। এরোসেন ?

অনঙ্গ। হ্যাঁ—

গজা। ওসব কলকজার বাপার।

কথাটা বলে গদাচরণ বুঝল খেটে বলা হয় নি, আরো বুঝিয়ে বলা দরকার।

গজা। আকাশে খুব হাওয়া ত। ২ত উপরের দিকে যাবে তত বেশি হাওয়া। যুক্বে গড়ে দেখ নি ?

অনঙ্গ। এবারে বুঝেছে। সে মাথা নাড়ে।

অনঙ্গ। ও!

কিছুদিন পর।

সকাল। ইয়াসিনের নূর দোকান।

গদাচরণ হাতে কেরোসিনের বোতল নিয়ে দোকানের দিকে এগিয়ে আসে।

ইয়াসিন। সেলাম, পড়িতমশাই!

গজা। জয়জয়! — কেমন আছ ইয়াসিন ?

ইয়াসিন। আছি ত একরকম পড়িতমশাই, কিন্তু তেল ত নেই।

গজা। তেল নেই ?

ইয়াসিন। উহ।

গদা খেন কথাটা বিবাস করতে পারছে না।

গজা। বল কি — ক্রাসিন নেই তোমার দোকানে ?

ইয়াসিন। চালান একদম আসে নি। মহম্মার হাকিমের কাছে দরখাস্ত করতি হবে, তবে চালান আসবে।

গজা। পরমা দিলে দোকানে ভিনিস পাওয়া যায় না এমন ত কখনো ভনি নি বাপ। তা এও কি যুক্তির সঙ্গে হচ্ছে নাকি ?

ইব্রাহিম সেইরকমই ত বলছে।

দোকানের আরেকজন খন্দের দাড়িয়ে আছে ; এর নাম শিবদাস।

শিব এই বেলা কিছু চাল আর ছন কিনে রাখেন পণ্ডিতমশাই।

গঙ্গা কেন বাপু - ওইগুলো পাওয়া যাবে না নাকি ?

শিব ওইগুলো ঘরে থাকলে পরে আশপেটা খেয়েও কোনোরকমে কঠোরটে চলে যাবে।

ইব্রাহিম সাপধানের মার নেই পণ্ডিতমশাই।

গঙ্গা বড চিন্তায় ফেললে হে ইব্রাহিম ! চালও যদি অমিল হয়...

ইব্রাহিম আমরা হলাম বাপসাদার মাহুয, সব দিক দেখে শুনে কাজ করতি হয়।

একবার যখন গওগোন বেধেছে - কখন যে কী হয় কেউ কি বলতি পারে ?

গঙ্গা সবিশেষ চিন্তিত।

এরোপ্লেনের আওয়াজ পাওয়া যায়। দোকানের সামনে থেকে দু-তিনটি ছেলে মেয়ে বৌড়ে এগিয়ে যায় এরোপ্লেন দেখতে। দূরে মাঠে ছেলের দল খেলা করছিল, তারাও মাকালের দিকে চেয়ে হতা করে। গঙ্গাও কোতুল সংবরণ করতে পারে না। তারও দৃষ্টি আকাশের দিকে চলে যায়।

ছুটকিদের দাড়িতে ঢেঁকিতে ধান ডানা হচ্ছে। ছুটকি ঢেঁকিতে পাড় দিচ্ছে, মোক্ষনা কুলোর চাল ঝাড়ছে। এই দৃশ্যের উপর এরোপ্লেনের শব্দ ক্রমে মিলিয়ে আসে।

পর পর কয়েকটি শব্দ গ্রামের দৃশ্যের উপর দূর থেকে ভেসে আসা ঢেঁকির শব্দ।
পারে ছেঁড়া ক্যাথিসের জুতো, মাথায় ছেঁড়া ছাতা, দীর্ঘ ডটচার্জ এদিক ওদিক বেগতে বেগতে নতুন গায়ের দিকে এগিয়ে আসে।

থানক নিষেধের সঙ্গ সবমাত্র ভাত বেড়েছে এমন সময় নেপথ্যে দীর্ঘ কঠবর।

দীনু চকোত্তি মশাই বাড়ি আছেন ?

অনন্স ভাতের হাতা রেখে মাথায় লোমটা দিয়ে উঠে পড়ে।

দীনু ও চকোত্তি মশাই !

অনন্স রান্নাঘরের দরজার মুখটাতে এসে দাঁড়ায়।

অনন্স উনি ত বেরিয়েছেন।

দীর্ঘ হাসিমুখে মাকো পেরিয়ে ফটকের দিকে এগিয়ে আসে।

দীনু কে, মা লন্ডা ? আমারে একটু খাবার জল দিতে পার মা ? আমি ব্রাহ্মণ

অনন্স হ্যা - আহুন।

দীহু কটক খুলে দেতরে আসে, দাঁওয়ার পাশে পাড়ার। অনঙ্গ ঘটিতে চল এনে দেয়।

দীহু একটা কথা মা – আজ আমি এখানে ছুটি থাবা !

কিছুক্ষণ পর।

দীহু পরম ভুগ্নসহকারে আহ্বার করছে ; দরজার চৌকাঠের ঠিক শিঁছনে অনঙ্গ হাত পাখা নিয়ে পাড়িয়ে আছে।

দীহু মা লক্ষ্যের রাগা খেন একেবারে অমৃত, অমৃত !

অনঙ্গ মূহু হাত করে।

দীহু চকচকি আরেকটু হবে মা ?

অনঙ্গ জিভ কাটে।

অনঙ্গ ট্যাডম ভাঙ্গা দেবো ছুখান ?

দীহু তাই পাও। আর একটা কাটা লক্ষা।

অনঙ্গ লক্ষা আর ট্যাডম ভাঙ্গা এনে দেয়। দীহু লক্ষায় কামড় বেগ। লক্ষা বেগে রাগাবরের দাঁওয়ার ঝোলানো খাঁচার টিগাটা মুখের হয়ে ওঠে। দেখা যায় টিগাটা খাঁচার তলার ঠাক নিয়ে গলাটা বার করে একদৃষ্টে দীহুর দিকে চেয়ে আছে। টিগার কাণ্ড বেগে দীহুর আমোদ হয়।

দীহু কী রে – তুইও খাবি নাকি একটু ?

পাঠশালা

ছেলেমা পেটে বানান লিখছে।

গঙ্গা। ন-স ব্রহ্মই ক ট – নিকট। ক-স ব্রহ্মই র সূর্যজ্ঞান – কিরণ।...

গন্ধাচরণের বাড়ি।

অনঙ্গ দীহুর ভক্তে তামাক দেতেছে, কসকেতে ছুঁ দিতে দিতে দীহুর দিকে এগিয়ে আসে। দীহু এখন ঘরের দাঁওয়ার।

দীহু আরে ভাখ ভাখ – আমায় দাঁও, আমায় দাঁও ! তামাক লাগতে লাগতে বলে বুড়ে হয়ে গেলাম –

দীহু অনঙ্গর হাত থেকে কসকে নিয়ে হুকোয় লাগায়। অনঙ্গ বর থেকে মাহুর এনে দাঁওয়ার বিছিয়ে দেয়।

অনঙ্গ আপনি এবার একটু জিরিয়ে নিন।

বিকেল।

বিথেন মশাইয়ের বাড়ির বাইরের দাওয়া। দাওয়ার উপরে হাঁকো হাতে বসে আছে গজাচরণ, বিথেন, সন্তোষ ও শ্রীনিবাস। এ ছাড়া আরো পাঁচ-সাতজন দাওয়ার সামনে মাটির উপর উঁচু হয়ে বসে আছে। যুদ্ধ শব্দে আলোচনা হচ্ছে।

সন্তোষ এই যে ভাষ্যমার কথা শুনিছি, এর শেষ কবে বিথেন মশাই?

বিথেন তা কি কেউ বলতি পারে? এ হল রাজাদের ব্যাপার। আমরা মুখুন্ডা

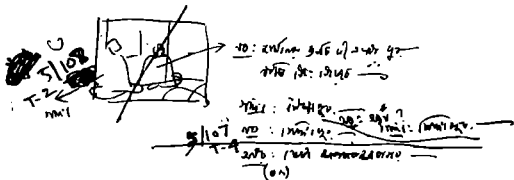
গেয়ো মাহুদ, আমর। কি এসবের কিছু বুঝতে পারি?

শ্রীনিবাস জার্মানরা তুমি কী একটা পুর নাকি নিয়ে নিয়েচে?

গজাচরণ গলা খেকরানি দিয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

গজা। সিঙ্গাপুর।...জার্মান নর, জাপানী।

কেটে পেটা কোন ভিলা হুদ পণ্ডিতমশাই!



সকলে আবার গজার দিকে সাগ্রহে দৃষ্টিপাত করে।

গজা। ভিলা...মেদিনীপুর।

শ্রীনিবাস পুরীর কাছে হল কি?

গজা। ঠিক কাছে নয়। একটু দূরে। পশ্চিম দিকে।

সন্তোষ তাহলে সেই পানেই যুদ্ধ হচ্ছে?

গজা। তা ত হবেই।

সন্তোষ আর সেই জন্তু চালের দাম বাড়ছে?

গজা। সেইটেই ত স্বাভাবিক!

বিথেন তবে ইয়া—একটা কথা বলি শুধুন। এই যে চালের দাম বাড়ছে, তার জন্য

কোনো অহুবিদ্য হবেন না। আমার গোসায় দান রয়েছে, চালের কোনো অভাব হবেন না।

রোস পড়ে এসেছে।

গঙ্গা পালি খোঁজল হাতে বাড়ি করে। ফটকের নুপে এসেই সে থেমে যায়। দাওয়ার ঘুমন্ত দীহুকে দেখেছে সে, যদিও তার মাথায় কাপড় ঢাকা অবস্থায় তাকে এখনো চিনতে পারে নি।

গঙ্গা দাওয়ার পাশে দাঁড়িয়ে কৌতূহল ও বিশ্বস্তের সঙ্গে দীহুকে নিরীক্ষণ করে। হঠাৎ একটা হাসির শব্দ শুনে তাইনে দির বেগে উঠোনের এক কোণে দাঁড়িয়ে অনন্য মিটিমিটি হাসছে। গঙ্গাকে হাতছানি দিয়ে তাকে অনন্য। গঙ্গা এগিয়ে যায়।

গঙ্গা। কে বল ত ?

অনন্য জ্ঞানি না। তোমাকে খুঁজছিলেন, তোমার নাম ধরে ডাকছিলেন।

গঙ্গা। বুঝছি। এ সেই বুড়ো ভট্টাচার্য। কখন এস ?

অনন্য। অনেককণ। ভাত খেল ত।

গঙ্গা। ভাত ছিল ?

অনন্য। থাকবে না কেন ?

গঙ্গা। অ—তোমার অন্ন ধ্বংস করেছে নৃষি ?

অনন্য। আহা, কী যে বল। অতিথি না ?

অনন্য স্বামীর পাশ কাটিয়ে রান্নাঘরের দাওয়ার দিকে চলে যায়। গঙ্গা তার দিকে এগিয়ে যায়।

গঙ্গা। শোন, বাজারে জামিন নেই, চালের দাম ছ টাকা—তুমি এমন ক'রে রান্না থেকে লোক ধরে ধরে—

গঙ্গা আর বলতে পারে না, কারণ দীহুর ঘুম ভেঙেছে। সে ধড়মড় ক'রে উঠে বসে।

দীহু। ও—আপনি ঘিরেছেন ?

গঙ্গা পা ধোয়ার উদ্দেশ্যে দাওয়ার দিকে এগোয়।

দীহু। মা লক্ষ্মীর হাতের রান্না পেয়ে ঘুমটি যা হল !—

গঙ্গা দীহুর দিকে পিঠ ক'রে পা ধুতে আরম্ভ করে।

দীহু। আমি এসেছি চকোতি মশাই, আপনার সঙ্গে একটা পরামর্শের গুত্ত। আমাদের বাজারে চাল নাই। যাও বা মেলে তা আট টাকা ক'রে কাঠা...

গঙ্গাচরণ দীহুর দিকে পিঠ করেই গামছা দিয়ে পা মুছতে মুছতে জবাব দেয়।

গঙ্গা। আমাদের ইদিকেও অবস্থা ভালো না।

দীক্ষু আপনি ত তত্ত্বজ্ঞান মাহুয, আর ছুটি মাত্র প্রাণী ; শতাব্দী নেই ত ?
গঙ্গা কলকে নিয়ে রাগাবরের দিকে এগায়।

গঙ্গা থাকলে ত দেখতেই পেতেন।

দীক্ষু আমি এই বুড়ো বয়সে এতগুলো পুঁজি নিয়ে কী করি বলুন ত।

গঙ্গা কলকেতে হুঁ দিতে দিতে বরের দাঁওয়ার দিকে ফিরে আসে।

গঙ্গা চাল কত চাই আপনার ? একবার বিবেচনাশাইকে বলে দেখতে পারি।

দীক্ষু বিবেচনাশাই ?

গঙ্গা হ্যাঁ। তিনিই এই গায়ের মাতার।

দীক্ষু সেই চাল কি কিনতে হবে ?

গঙ্গা নইনে পাবেন কি ক'রে ?

দীক্ষু মূখ শুকিয়ে যায়।

দীক্ষু পরমা ত আমি নি।

গঙ্গা আনেন নি ?

দীক্ষু উহঁ।

গঙ্গা তবে আর কী হবে !

গঙ্গা দাঁওয়ার বিপরীত প্রান্তে হঁকো হাতে বসে পড়ে। অনেক রাগাবরের দরজায়
পাড়িয়ে এদের দুজনের কথাবার্তা শুনেছে।

দীক্ষু বিরস বদনে কপালে করান্নাত করে।

দীক্ষু হায় রে ! এবার বুঝি না পেয়ে মরতে হল !

গঙ্গা অল্পনিকে মূখ ফিরিয়ে ডামাক পেয়ে চলেছে।

দীক্ষু দাঁওয়ার সিঁড়িতে বসে জুতো পরতে থাকে। অনেকপানি সময় নিয়ে ঝেড়ে
পুঁজে ধুলো কাকর বার ক'রে সে জুতো জোড়। পরে। গঙ্গা তার দিকে ফিরেও
দেখে না, কিন্তু অনঙ্গর চাহনিতে অশ্রুস্ফার ভাব।

দীক্ষু উঠে পড়ে। গঙ্গার দিকে ফেরে। গঙ্গা দীক্ষুর ব্যবহার করা মাছুরটা গুটিয়ে
রাখছে।

দীক্ষু তাহলে আমি। নমস্কার।

গঙ্গা ইনিকের অবস্থাও ভালো না।

দীক্ষু আমি, মা লক্ষী !

দীক্ষু ফটক খুলে বাইরে বেরিয়ে পড়ে। অনঙ্গ তার স্বামীর দিকে দোঁপে। স্বামীর
দৃষ্টি পাচিলের বাইরে। সে এখনো হঁকো পেয়ে চলেছে।

অনঙ্গ একবার শোন—শুনছ—!

গঙ্গা স্বীয় দিকে দিগে দেবে।

অনন্ত একবার শোন এসে!

গঙ্গা অনন্তর দিকে এগিয়ে আসে। অনন্ত বেশ আঁবোর সঙ্গে স্বামীর প্রতি অত্যাগ ভানায়।

অনন্ত এই বুড়ো মাথাকে শুধু হাতে কিয়ে দিলে?

গঙ্গা সারে ও অত্যন্ত ধড়িঙ লোক - পয়সা! আমি নি - দিকে করতে বেশিয়েছে -
এক আমি চিনি না?

অনন্ত দোহাই তোমার - তুমি একে ডাক - মইলে আমি মাথা খুঁড়ে মরব -

গঙ্গা এত আচ্ছা মুখকিল দেখছি - আমি কি এখন এর সঙ্গে চালের দান্দায়
ধেরোব - সারাদিন ঘুরিচি?

অনন্ত সাত ঘণ্টা কেন, কাল বেণ। আজ রাতটা উনি থাকুন। - দোহাই তোমার,
তুমি ডাকে।

গঙ্গাচরণ স্বীয় অত্যাগ পালন করবার জন্য হঠকোর দিকে এগিয়ে গিয়েই দেবে
দীর্ঘ এগুনো কাঁচাকাঁচির মধ্যেই রয়েছে, ছাতাটা খুলতে গিয়ে খুলছে না এমন ভাব
ক'রে রাস্তায় পাড়িয়ে রয়েছে।

গঙ্গা ও ভটচাঁদ মশাই!

রাত।

গঙ্গাচরণের রাস্তাঘরের দাওয়ায় বসে দীর্ঘ ভটচাঁদ জামবাটিতে দুধ পাকছে। তার
সামনেই দুধ কালো ক'রে বসে আছে গঙ্গাচরণ, তার গৌকে এগুনো দুধ লেগে
রয়েছে। সে আঁড়চোখে ত্রুটি ক'রে দেখছে দীর্ঘ দুধ পাওয়া। রাস্তাঘরের দরবার
চৌকাঠের ঠিক পিছনে পাড়িয়ে অনন্ত শান্তভাবে হাতপাখা নাড়ছে।

আরো রাত।

ঘরের দাওয়ায় দীর্ঘ ভটচাঁদের চক্কি বিছানা পাতা হয়েছে। সেই বিছানার উপর
হাতে তাকে নিয়ে বসে দীর্ঘ ভটচাঁদ গঙ্গাচরণকে হুঁধু লব্ধে জ্ঞান দিচ্ছে।

দীর্ঘ এই যে চালের দাম হ' হ' ক'রে বাড়ছে, এর আসল কারণটা কী জানেন?

গঙ্গার কণ্ঠস্বরে বোঝা যায় অনেক কথার পরে এখন সে বেশ ক্রান্ত, বুড়োর হাত
থেকে অব্যাহতি পেলে সে বৈচে যায়।

গঙ্গা আসল কারণ?

দীর্ঘ আসল কারণ হল - জাপানীরা ব্রহ্মদেশ নিয়ে নিয়েছে।

গঙ্গার খটকা লাগে।

গঙ্গা আর সিঙ্গাপুর ?

দীপু সিঙ্গাপুর ত নিয়েইছে – আবার ত্রুক্ষদেশও নিয়ে নিয়েছে। সেট যে ত্রুক্ষদেশ –
যেখান থেকে মধ্য মোটা আলো চান আসত – সেই চান আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

গঙ্গা অ।

দীপু আর তার উপরে আবার গবরমিট !

গঙ্গা গবরমিট ?

দীপু গবরমিট ত সস্তায় চাল নিয়ে বাচ্ছে।

গঙ্গা কোথায় ?

দীপু মিলিটারির ভাঙে। মিলিটারি ত যুদ্ধ করবে। গালি পেটে ত আর লুক্কায়
না বশাই।

ঘরের দরজটা আধ ডেভানো রয়েছে, ঠাঁক দিয়ে অনঙ্গকে দেখতে পায় গঙ্গাচরণ।
সে খাটের পাশে মাটিতে বসে স্বামীর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। দীপু কথা বলে
চলে।

দীপু আমরা না হয় অবেজো বাহুব, আমরা না খেয়ে মরলে তার কি এসে গেল
বলুন। অগ্নি আপনি তবু কামকথো নিয়ে আছেন – পাঠশালা আছে, পুঁজো –
আচ্চা আছে, এদিক সেদিক...

গঙ্গা হু...অনেক কাজ !

দীপু এদিকে আমি এই বুড়ো বয়সে এক গাঙ্গা পুঁজি নিয়ে কী করি বলুন ত।

অনঙ্গ-গঙ্গার আবার দুটি বিনিময় হয়। অনঙ্গ বাড় নেড়ে গঙ্গাকে ভিতরে আসতে
বলে। প্রদীপের আলোয় অনঙ্গকে তারি কমনীয় দেখাচ্ছে।

দীপু এ গায়ে আপনিই ত একমাত্র ত্রুক্ষণ, তাই না ?

গঙ্গা আজ্ঞে হ্যাঁ।

দীপু সবেধন নীলমণি – অ্যা ?

দীপু দৃষ্ট বিকশিত করে। তার কথায় বাস্তবের তর গঙ্গা আদৌ পছন্দ করে না। সে
মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

দীপু হাসি মিলিয়ে যায়। সে দীর্ঘবাস বেলে।

দীপু খুব দ্রুদৃষ্টি আপনার – খুব দ্রুদৃষ্টি !

গঙ্গা উঠে পড়ে।

গঙ্গা আপনি তাহলে এখন শুয়ে পড়ুন।

দীপু দিনের বেলা ঘুমটি বেশ ভালো হয়েছে ত, তাই...ইয়ে কাল তাহলে বিশ্রাম
বশাইকে একবারটি...

গঙ্গা। গরুর আসে, তার দৃষ্টি অনঙ্গর দিকে। অনঙ্গও চেয়ে আছে তার দিকে। গঙ্গা স্বীর দিক থেকে দৃষ্টি না সরিয়ে খাটের পাশটায় এসে বসে।

অনঙ্গ। কী দেখছ?

গঙ্গা। দেখছি কখাটা সত্যি কি না।

অনঙ্গ সলজ্জভাবে মাথা নাড়িয়ে নেয়।

গঙ্গা। হাঁ...বোধহয় সত্যি।

গঙ্গা। খাট থেকে উঠে পড়ে। কয়েক পা এগিয়ে থিরে গায়ের কত্থাটা খুলে ঘরের কোণে ছুঁড়ে কেলে।

অনঙ্গ। কান, চুটকিদের বাড়িতে ধান ভানে ত?—ন পালি ক'রে ভানলে এক পালি ক'রে পায়।

গঙ্গা। তাতে কী হল?

অনঙ্গ। আমি যদি বাই?

গঙ্গা। অবাক হয়ে স্বীর দিকে দেখে।

গঙ্গা। কোথায় যাবে?

অনঙ্গ। এখন না। যদি খুঁ টানাটানি হয়।

গঙ্গা। আবার খাটে এসে বসে।

গঙ্গা। পাগল নাকি? এই ছোটলোকদের সঙ্গে যাবে তুমি ধান ভানতে?

অনঙ্গ। তাতে কী হল?

গঙ্গা। আচ্ছা! বেশ, ধর যদি গেলেই—তুমি ঢেঁকিতে পাড় দিতে পারবে?

অনঙ্গ। সে আর এমন কী বস্তু। শিখে নিলেই হল।

গঙ্গা। আর ধান খে এলে দেখ?

অনঙ্গ। সেও শিখে নেব। ঢেঁকি ঘেঁই উঠবে, অমনি হাতটা দেব, আর ঢেঁকি ঘেঁই নামবে, অমনি হাতটা তুলে নেব।

গঙ্গা। মুগের কথা, না?—দেখি হাত ধান সেপি।

অনঙ্গ স্বাধীর দিকে তার ডান হাতটা বাড়িয়ে দেয়। গঙ্গা। কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দ হাতের মুঠোর স্বীর শেলব হাতটা ধরে থাকে।

গঙ্গা। এই গাঁয়ে আমাদের কত সম্মান জান ত? সেই সম্মানটা বাঁচিয়ে রাখতে হবে ত?

গঙ্গা। হাতটা ছেড়ে দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে।

গঙ্গা। চালের লব্ধ ভোমাকে ভাবতে হবে না। তার ব্যবস্থা আমিই করব।

অনঙ্গ দর যদি আরো বাড়বে ?

গঙ্গা কত আর বাড়বে। যুদ্ধ খামলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। অত বড় যে যুদ্ধক্ষেত্র
যুদ্ধ শেষে চলেছিল মাত্র আঠারো দিন। এ আর কতদিন চলবে।

অনঙ্গ ভগবান করুন যেন তাই হয়।

গঙ্গা তাই হবে। তবে তুমি অমন করে রাস্তা থেকে লোক দূরে দূরে এনে -

অনঙ্গ এই চুপ !

অনঙ্গ ঠোটে আঙুল দেয়। জ্বলন্ত দুই দরজার দিকে যায়। এমন অল্প ঠাঁক,
তার ভিতর দিয়ে বালিশে রাখা দীর্ঘ ভটচাখের মাথা দেখা যাচ্ছে।

গঙ্গা উঠে পড়ে।

এবারে দীর্ঘকে দেখা যায়। সে চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে। তার পিছনে ঘরের
দরজাটা বন্ধ হয়ে যায়। শব্দ শুনে দীর্ঘ চোখ খোলে। তারপর ঘাড় ফাৎ করে বন্ধ
দরজার দিকে দেখে। চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর আবার দৃষ্টি ঘুরিয়ে নেয়।

হপুর।

গাছের চালের আড়ত।

আড়তের সামনে বিস্তার লোকের ভিড়, একটিমাত্র লোক কোনোরকমে ছুঁহাত
হৃদিকে প্রসারিত করে সে ভিড় সারলাতে চোঁটা করছে। মালিক কুণ্ড মশাই
হিসাব লিপছেন। টং টং করে টাকা বাজাচ্ছেন, আর মাঝে মাঝে আপন মনে
জনতার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে হাত তুলে তাদের ধৈর্য ধরতে বলছেন।

গঙ্গাচরণ চালের খলি হাতে দোকানের সামনে এসে ভিড় বেধে রাস্তার উল্টো দিকে
একটা গাছের শুঁড়ির উপর বসে ঘাম মোছে।

ভিড়ের চাপ ক্রমশ বাড়বে। ক্রেতারা কোনোরকমে একে একে চাল কিনে নিয়ে
ভিড় ঠেলে বাইরে বেরিয়ে আসে।

একটি থাকি শাট পরা লোককে এদের থেকে যেন একটু আলাদা বলে মনে হয়।
তার চোখের চাহনিটা যেন কেমন। বার বার সেটা সন্দেহজনকভাবে চলে যাচ্ছে
চাল বোঝাই বস্তার দিকে।

নতুন গায়ের প্রসন্নকে দেখা গেল চাল কিনতে।

ধামা হাতে ভিড় ঠেলে সে বাইরে আসে, গঙ্গাচরণ তাকে দেখতে পায়।

গঙ্গা বলি ও প্রসন্ন !

প্রসন্ন পেছাম পিওতমশাই !

গঙ্গা চাল পেলে ?

প্রসন্ন আঠারো টাকা মণ ! - ন'সিকে চড়ে গেছে এই দশ দিনে !

গঙ্গা আমি ত সাহস ক'রে এতদেই পারছি না!

খাকি মাট পর। লোকটা হঠাৎ বেপরোয়াভাবে ডিড়ি ঠেলে সটান গিয়ে চালের নত্বর উপর লাগিয়ে পড়ে খাবলে খাবলে চাল তুলে কোঁচড়ে ভরতে থাকে।

কাণ্ডে বেগে ডিড়ের মধ্যে হৈ-হুলা শুরু হয়ে যায়। কুতুমশাই কলম ফেলে চাঁট ক'রে উঠেন।

খাকি-পর। চাল সমেত ডিড়ি ঠেলে বেরিয়ে এসে উল্লাসে পালায়।

এবার তার দেখাদেখি আরেকটা লোক (মটবর) ডিড়ি ঠেলে মোকানের লোককে এক ধাক্কা দিয়ে পাড়িপালার উপর ফেলে দিয়ে চালের নত্বর উপর কাঁপিয়ে পড়ে।

আর তার উপরে পড়ি কি মরি ক'রে কাঁপিয়ে পড়েন কুতুমশাই—যদি চালের কিছুটা উদ্ধার করা যায়।

চারিদিকে প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলা, লোকজন এদিকে ওদিকে পালাজে, মহিলা ক্রেতার। তারবারে চাঁৎকার করছে।

গঙ্গা তার জায়গা থেকে উঠে এগিয়ে এসে হতভম্বের মধ্যে এদিক ওদিক দেখেছে।

প্রসন্নকে ধাক্কা মেরে একটা নোক গাছের ভিত্তি চাল নিয়ে একটা ঢালা ঘরের পাশ দিয়ে নৌড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

প্রসন্ন পণ্ডিতমশাই, চাল লুট হচ্ছে!

প্রসন্ন ধামা নিয়ে পালায়।

একটি চৌকিদার ও একজন ডহলোককে (নিকু) হনহনিয়ে এগিয়ে আসতে দেখা গেল।

মটবর চাল নিয়ে পালাতে গিয়ে কয়েকজন গ্রামের লোকের হাতে ধরা পড়ে, প্রবল ধস্তাধস্তি চলতে থাকে।

ডিড়ের মধ্যে একজন লোকের হাতের ধামা থেকে কেনা চাল উলটে মাটিতে পড়ে।

কিছু লোক দেখে চালই খাবলে তুলে নিতে চেষ্টা করে।

গম্বাচরণ এখনো কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

হঠাৎ একটা কাতর কর্ণবর শুনে সে ডান দিকে ফেরে। দেখে প্রসন্ন চৌকিদারের হাতে ধরা পড়েছে, তার হাত থেকে ধামা কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

প্রসন্ন আমি চাল চুরি করি নি!—পয়সা দিয়ে কিনেছি! চুরি করি নি!—

গম্বাচরণ তাকে উদ্ধার করার জন্য ব্যস্তভাবে এগিয়ে যায়।

গঙ্গা আরে ও ত পয়সা দিয়ে চাল কিনেছে—আমি নিজে চোখে দেখেছি—আমি—

গঙ্গার কথা বলা শেষ হয় না। নিকু নামক ডহলোকটি তাকে অত্যন্ত রুচভাবে একটা ঠেলা মেরে মাটিতে ফেলে দেয়।

নিকু খেস পালা!—কোপরালালি করার আর জায়গা পাও নি?

প্রদত্তক নিয়ে নিরুত্তর ও চৌকিদার চলে যায়।

এমন অস্বাভাবিকভাবে তাকে কেউ অপমান করতে পারে এটা গম্ভীর ভাবতে পারে না।
দে কিছুর ফালফাল করে চেয়ে থাকে, তারপর ধুলোমাখা থলিটা ও ছাতাটা
ভুলে নিয়ে কোনোরকমে উঠে পাড়ায়।

ছুটকিব বাড়িতে ঢেঁকিতে ধান ডান। হচ্ছে।

এবার পাড় দিচ্ছে অনঙ্গ, চাল ঝাড়ছে ছুটকি, আর ধান এলে দিচ্ছে মোক্ষনা।

বিকল।

দূর থেকে দেখা যায় উন্মুক্ত প্রান্তরের মাঝখানে একটা বিশাল বটগাছ আকাশের
দিকে শাখা প্রশাখা বিস্তার করে শেখর ধরা মগরের মতো পাড়িয়ে আছে। গাছের
পিছনে অস্ত্রোজ্ঞান ঘন স্বর্ষ।

পর পর চারটি শট-এ আমরা গাছের কাছে এগিয়ে গিয়ে দেখতে পাই গম্ভীর
তার নিচে নিখর হয়ে বসে আছে।

এবার আমরা গম্ভীরের খুব কাছে। সে পিঠের গাম্ভীর খুঁট দিয়ে চোখের জল
মোচে।

নেপথ্যে অধর কাপালির কর্ণধর শোনা যায়।

অধর পেরাম পণ্ডিতমশাই! - আপনি এতদিনে বসে?

গম্ভীর: কিছু না বলে শুধু ধৈর্য থেকে কথা এসেছে সেই দিকে দেখে। কিছুদূরে
রাবার ধারে অধর, হরিপদ ও আরেকটি চাষীকে দেখা যায়।

অধর পাঁচ কুঁড় দোকান লুট হয়েছে এমন এসাম পণ্ডিতমশাই। দেশে এ কী
দিনকাল পড়ল বলেন ত। আমরা ত ভাত না পেয়ে থাকতে পারি না - আর
আজ তিনদিন ঘরে চাল নাই। চিড়ে কুটে রেখেছিল সেই লাগুন মানে, তাই
চুটে করে খাওয়া হচ্ছে। ছেলেপিলেরা ত শোনেন না - তারা প্যাট ভরে খায়।
আর আমরা খাই আপপেটা। আর চিড়ের দরও হয়ে গেল আপনার বাবো আনা
দেয়! -

দূরে দীপির পাড় দিয়ে তিনটি স্থলোক ধাম। হাতে করে আসছে। হরিপদ
অধরের দুটি সেই দিকে আকর্ষণ করে। অধর উঠে পাড়ায়, গলা ছাড়ে।

অধর ধামায় কী আছে গো - চাল নাকি?

কে নো উত্তর না পেয়ে তিনজনই দৌড়ে মেয়েগুলোর দিকে এগিয়ে যায়।

গম্ভীর নিশ্চয়ভাবে পাড় ফিরিয়ে দৃষ্টটা দেখে।

অধর দূর থেকেই সংবাদটা দেয়।

অনন্ত পণ্ডিতমশাই, বলে কিনা বিশ টাকা মণ!

সফা।

গজাচরণের বাড়ির ফটক।

একটি ক্রান্ত হাত ঠেলা দিয়ে ফটকটাকে খোলে। গজাচরণ ফটক খুলে উঠানে আসে। রাধাচরণের দাওয়ায় পালি থলি ও ছাতাটা ছুঁড়ে নেন।

তন্নর ঘর থেকে বেরিয়ে দাওয়ায় এসে পাড়িয়েছে, উদ্বিগ্নভাবে গজার দিকে দেখে। গজা তার দিকে পিঠ ক'রে দূরে মাঠের দিকে চেয়ে আছে। আকাশে মেঘ।

অনন্ত পালি থলিটার দিকে দেখে। তারপর পেটাকে তুলে নিয়ে রাধাচরণে চলে যায়। গজা এখনো উদাস চুপে বাইরের দিকে চেয়ে আছে।

অনন্ত (নেপথ্যে) চাল কত নিল?

গজা কোথায় চাল?

অনন্ত (নেপথ্যে) ঘাতে আনলে—

গজা ও পালি পালি।

অনন্ত (নেপথ্যে) এট ত চাল!

এবারে গজা অনন্তর দিকে দেখে—অনন্তর হাতে চাল। গজা এগিয়ে গিয়ে অনন্তর হাতের উপর হাত রাখে। দুজনে পরস্পরের দিকে দেখে। অনন্ত স্থিতহাস্ত করে।

অনন্ত চাল এলি নি, শুধু পাড় দিয়েছি।

গজা দীর্ঘশ্বাস কেলে।

গজা মান যদি গেতেই হয়, দুজনের একসঙ্গে যাওয়াই ভালো!

পাঁজুড়ে পরপর কয়েকটি পবনের কাগজের শিরোনামা—

'মান ও চালের অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধি'

'বাংলার উপরে মন্বন্তরের ছায়া'

পর পর ক্রমবর্ধমান সংখ্যা দিতে চালের দর কুড়ি থেকে দ্বিশ টাকা মণে উঠল পেটাও বৃদ্ধিয়ে দেওয়া হয়।

সবশেষে শিরোনামা পড়ে—

'বাজার হটতে চাউল উধাও'

দুটি অদ্বিবর্ষ প্রতাপতি নৃত্যের ভঙ্গিমায় শুকনো মাটির উপর চক্রাকারে ঘুরছে।

নারীকণ্ঠ (নেপথ্যে) মা!—

বাশের ককির উপর একটা জাল ফড়িং এসে বসল।

নারীকণ্ঠ (নেপথ্য) বাগো ! -

অনঙ্গ তার বাড়ির ফটকের কাছে এসে দাঁড়ায়। সে উদ্বিগ্নভাবে বাইরে রাস্তার দিকে চেয়ে আছে। সমুদ্রটা জুপুর, অন্ধাশ মেঘাচ্ছন্ন।

নারীকণ্ঠ (নেপথ্য) ছুটি ক্যান দাও মা ! -

এবারে পর পর আটটি অনাহারক্লিষ্ট উদ্বাস্ত নারীর ক্রোড়-আপ পড়ে।
এবারে পুরো হলটিকে দেখা যায় - সব মিলিয়ে বারো-চোদ্দজন - কেউ শাঁকের উপরে, কেউ রাস্তার উপরে দাঁড়িয়ে কাতরদৃষ্টিতে অনঙ্গর দিকে চেয়ে আছে।
অনঙ্গ এ দৃশ্য আর দেখতে পারে না। সে ঘরের দাওয়ায় গিয়ে বসে। ছুটুকি এসে পিড়কিতে দাঁড়িয়েছে।

ছুটুকি কী দেখছ বাবুনদিদি ?

অনঙ্গ এরা কারা রে ছুটুকি ?

ছুটুকি এরা স্বস্ত্র ভেলার লোক। দেশে গেলে পায় না, তাই ভিক্ষা করতে বেরিয়েছে।

উদ্বাস্তর দল চলে যায়।

অনঙ্গ আমার ত দেখে হাত পা পেটের ভিতর সিঁদিয়ে দেল। এদিকে আমাদেরও ত আজ ভাত চড়ে নি।

ছুটুকি হুঘনি শাক পাবে ?

অনঙ্গ হুঘনি শাক ? তোরা খাচ্ছিল নাকি ?

ছুটুকি আর কী খাব বাবুনদিদি ?

অনঙ্গ কেন, তোদের বাড়িতে ধান নেই ?

ছুটুকি দর যেই বাড়ল, অমনি সব ধান আড়তে নিয়ে গিয়ে গেছে দিল না ? - এখন যা পাই তাই খাট। শাক পেলে শাক, নয় ত গেড়ি-গুগলি।

অনঙ্গ যেন কথাটা বিশ্বাস করতে পারে না।

অনঙ্গ গেড়ি-গুগলি ? সে ত ঠাসে পায় !

ছুটুকি আর কথা বাড়ায় না।

ছুটুকি চলি বাবুনদিদি।

অনঙ্গ কী জানি মনে ক'রে পিড়কি দরজার দিকে দাওয়া ক'রে যায়।

অনঙ্গ এই ছুটুকি - শোন !

ছুটুকি কিছুটা পথ এগিয়ে গিয়েছিল, অনঙ্গর ডাকে থামে। অনঙ্গ পিড়কির মুণ্ডায় এসে দাঁড়িয়েছে।

ছুটকি কী গো?

অনঙ্গ শোন না।

ছুটকি এগিয়ে যায়।

ছুটকি কী?

অনঙ্গ গেড়ি-ডগলি কি ক'রে রাঙা করে রে?

ছুটকি কেন জিগ্যাস করছ বাগুনদিদি? তুমি ত আর এসব জিনিস খাবে না।

অনঙ্গ তুই বল না।

ছুটকি শাঁস বের ক'রে নিয়ে চক্কড়ি ক'রে খায়। হল ত?

ছুটকি চলে যায়।

অনঙ্গ কিছুক্ষণ চূপ ক'রে গাড়িয়ে থাকে দরজার পাশে। দূর থেকে উষ্মাস্বরের
কণ্ঠস্বর ভেসে আসে -

'না, মাগো, ছুটি ফ্যান ধাও মা!'

বিশ্বেস মশাইয়ের বাড়ির বাইরে।

বিশ্বেস মশাই তার দেড় বছরের নাতনীকে কোলে নিয়ে তার সামনে উলু হয়ে বস।
সমবেত চাবীঝুলকে উদ্বেজ ক'রে বাক্যবর্ণন করছে।

বিশ্বেস তোমাদের এ কেমনধারা কথা বলে দিকি? তোমরা ত দেখলে। আমার
গোলায় কত ধান আছে সে ত দেখলে। নিজের চোখে দেখেও তোমাদের বিশ্বাস
হল না?

হীরা ওই দু-পাচ আড়ি ধান নিয়ে আর আমাদের কী হবে বিশ্বেস মশাই?

অধর আপনি ধান না দিলে আমাদের পরিবার না খেয়ে মরবে বিশ্বেস মশাই।

বিশ্বেস আরে বাপু, ধান ধে দেব, সে ত খা আছে তার খেকেই দেব। তার চেয়ে
বেশি ধান যেবো কোথেকে?

কেত্র আপনি ত বলেন ধান নাই, কিন্তু আমাদের সংসারটা কীভাবে চলে যেটাও
ত আপনাকে ভেবে দেখতি হবে!

গ্রামের দীমানার বাইরে একটা ভল। ভায়ণা থেকে ছুটকি হুহনি পাতা তুলে
কৌচড়ে রাখছে।

বিশ্বেস মশাইয়ে বাড়ি।

বাইরের উঠোনের ধরতলা দিয়ে গদাচরণ ভিতরে আদে। হীরা অধর ও নীলমণি
কথা সেরে চলে আসছে, গদা তাদের সামনে পড়ে।

গদা গোলা কিরকম দেখলে হীরা?

হীরা! আমরা আর কী জাপন পণ্ডিতমশাই? বামন ভাবাবে ত্যামনই ত জাপন।
অমন হাতির মতো গোলা, আর আমাদের পাচজনকে পাচ আড়ি করে ধান দিতে
গিয়ে ফুটরে গেল?

গঙ্গা! তা তোমাদের ত ভাত্র মাসে আউণ ধান পেকে উঠছে —

অধর ও নতুন ধানের চাল খেলি মত্ত মত্ত কলের। পণ্ডিতমশাই! ও খানে, আর
পট্টপট্ট করি মরবে। ও খাবার সময় হবে সেই কান্তিক অস্ত্রান মাসে।

চাষী তিনজন চলে যায়, গগাচরণ বিশ্বাসের দিকে এগোয়।

বিশ্বাস তাকে দেখে ছুপা এগিয়ে আসে। সেই পুরোনো দৃষ্টতার দেশমাত্র নেই
বিশ্বাসের ব্যবহারে।

বিশ্বাস পেগাম পণ্ডিতমশাই! আপনি ব্রাহ্মণ মহাশয়, আপনাকে আর কর্ত্ত্ব হিসাবে
কী ধান দেব বলেন। পাচ আড়ি ধান নিয়ে ধান, কিন্তু এই শেষ। আর অন্যর
ধান নাই।

অজ্ঞান বন।

ছুটকি কোচড় ভতি শাক নিয়ে বাড়ি ফিরছে। পুকুরের পাশ দিয়ে একটা মোড়
নিচেই সে থমকে দাঁড়ায়।

নিশ হাত দুই একটা গাছের পাশে দাঁড়িয়ে আছে যত পোড়া।

যত দীরে এগিয়ে আসে।

ছুটকি বৃকের কাপড় সামলে নিয়ে গানিকটা পিছিয়ে যায়।

ছুটকি এগানে কী—

দুজনই রক্ত কণ্ঠে কথা বলে।

যত্ন তোর মস্তে দাঁড়িয়ে আছি।

ছুটকি কেন?

যত্ন আমি ইটখোলায় থাকব, তুই আর।

ছুটকির চোখ ঝলসে ওঠে। সে যত্নকে অগ্রাহ করে এগিয়ে যায়। যত্ন আঁতটি এক
পাশে সরে গিয়ে তার পথ রোধ করে।

যত্ন ছটকি!

ছুটকি সরো! সব ছাড়ে! নইলে আমি চোচাব—

যত্ন পথ ছাড়ে না।

যত্ন তুই ভাবলি তোকে আমি এমনি এমনি ভাবছি?

ছুটকি সরো! বলছি! নইলে আমি—

ছুটকির কথা বেয়ে যায়। যত্ন তার সাটের তলা থেকে এক মুঠো চাল বার করেছে। ছুটকি চালের দিকে দেখছে, তার ক্ষত নিশান পড়ছে।

ছুটকি চাল কার ভাঙে ?

যত্ন কার ভাঙে আবার ? তুই জানিস না কার ভাঙে ?

ছুটকি তগে দে আমায় !

যত্ন দেখ ত। তুই আর একবারটি। ওই ভাঙা বাড়িটার কাছে -

ছুটকি বহুর মুখের দিকে দেখে। তার দৃষ্টি অত্মপর্যবেক্ষণ করে ক্যামেরাও বহুর মুখের দিকে দেখে।

যত্ন ওপানে কেউ আসে না। কেউ চানতে পারবে না। তাকে চাল দেব আমি। আরো দেব। যখনই আসবি তখনই দেব।

ক্যামেরা বহুর মুখের দিকে এগিয়ে গেছে। তার বাঁ গালটার দিকে, যে গালটা পুড়ে বিকৃত, বীভৎস হয়ে গেছে।

এবার ছুটকির মুখটাও স্থগায় বিকৃত হয়ে ওঠে।

ছুটকি হারামজাদা! বাবাইশ! - কথাগুলো আটকালো না মুখে? - সত্যে, সত্যে বলছি! -

ছুটকি মাটি থেকে একটা টেলা তুলে নিয়ে বহুর দিকে ছুঁড়তে উত্তপ্ত হয়। যত্ন পালায়।

ছুটকি কোনোরকমে নিঃশব্দে সামলে নেয়। হাতের টেলাটা পাশে মাটিতে ফেলে দেয়। তার চাহনিতে ক্রোধের বদলে এখন হতাশার ভাব ফুটে ওঠে। সত্যিই রক্ষা করতে গিয়ে চাল হাতছাড়া হয়ে গেল!

ছুটকি কৌচড়ের শব্দ শাক মাটিতে ফেলে দেয়।

সন্ধ্যা।

গঙ্গাচরণ বাড়ি ফিরছে।

একটা দীঘির পাশ দিয়ে যেতে যেতে তার হাটা থেমে যায়।

অনাথশ্রমিক স্ত্রীলোক কোমর জলে দাড়িয়ে নিঃশব্দে জলের তলায় হাত দিয়ে গাড়ি-গুগলি তুলে কৌচড় রাখছে।

গঙ্গা কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে, তারপর মাথা হেঁট করে বাড়ির দিকে রওনা দেয়।

রাত

গঙ্গাচরণের শোবার ঘর। বাইরে থেকে চাঁদের আলো এসে বিছানার চানদের পড়েছে, এ চাড়া ঘরে আর আলো নেই। গঙ্গা আর অনন্ত দুজনেই খাটে বসে

গজা। বিবেশ মশাইও যদি এইরকম করেন, তাহলে আর কী করা যায় বল।
এতগুলি লোক এত করে হাতে পায়ে ধরলে—তাও বলে কিনা চাল নাই?
এত চাল যায় কোথায়?

অনঙ্গ। কী হবে?

গজা। আমল গোলমালটা কোথায় চান? চান। মাথার ঘাম কেনে চাষ করে—আর
আমরা তার মাথার উপরে বসে খাই। এই ব্যাঘ্রা, তাই গোলমাল। নিতেরও ত
ভবি নেই যে চাষ করে পাব!

অনঙ্গ। আর কোথাও চাল পাওয়া যায় না? একটু খোঁজ করে দেখ না গো।

গজা। খাট থেকে উঠে পড়ে পায়চারী শুরু করে।

গজা। খোঁজ কি আর করি নি ভেবেছ? শঙ্করপুর গ্রাম—এইপেন থেকে সাত কোশ
পথ—নিবারণ বোমের বাড়িতে চাল আছে।

অনঙ্গ। যাবে?

গজা। তের টাকা যার মাসের আণ—ত্রিশ টাকা দরের চাল সে আর কতটা কিনতে
পারে।

অনঙ্গ। টাকা ত আছে।

কথটা গজার কাছে অপ্রত্যাশিত। সে হাটা থামিয়ে স্বীর নিকে ঘুরে বেগে।

গজা। টাকা আছে?

অনঙ্গ তার হাতের শোনার বালাটা খুলে গজাচরণের নিকে এগিয়ে দেয়।

অনঙ্গ। এতে হবে না?

গজাচরণ অগাক হয়ে বাটে এনে অনঙ্গর নিকে মুখ করে বলে।

অনঙ্গ। হবে?

সে অনঙ্গ বালাটা ও খুলে কেনেছে হাত থেকে।

গজা তার হাত থেকে বালাটা নেয়।

গজা। হবে, যদি ভূমি কথা দাও যে আধপেটী খেয়ে থাকবে না।

অনঙ্গ একটা অর্ধপূর্ণ মলঙ্ক মুছ হাসি হাসে।

অনঙ্গ। আমার আধপেটাই ভাল।

গজা। মানে?

অনঙ্গ। অকচি। খেতে ইচ্ছা করে না।

গজা। সে কি? কই, আমাকে ত বল নি।

অনঙ্গ। ও কিছ না। ঠিক হয়ে যাবে।

অনঙ্গ হেসে উঠে পড়ে। গজা। ইঙ্গিতটা বুঝতে পারে না।

জ্ঞ। না হলে বোল। আমি ওমুখ দিয়ে দেব।

সকাল।

গঙ্গাচরণ চাউ। মাথায় চালের খলে নিয়ে শঙ্করপুরের উদ্দেশে গ্রামের পথ দিয়ে হেঁটে চলেছে।

অনঙ্গ, ছুটুকি ও মোক্ষদা জঙ্গলের ভিতর দিয়ে ছেঁটে চলেছে। অনঙ্গ একটা গাছের ডালকে লাঠির মতো ব্যবহার করছে, ছুটুকি আর মোক্ষদার হাতে শাবল। পরিবেশটা আমাদের অচেনা। অনঙ্গর অবস্থা শোচনীয়, সে বারবার ছোট্ট পাচ্ছে, টাল সামলাতে পারছে না। ছুটুকি, মোক্ষদা এগিয়ে গেছে।

মনঙ্গ ও ছুটুকি !

ছুটুকি কী গো —

মনঙ্গ যেটে আলু যেটে আলু ক'রে কোথাও মানলি রে — এ ত দাবের জঙ্গল !

ছুটুকি ও মোক্ষদা হেসে ওঠে।

ছুটুকি তোমার আলুর ভাগ শেলেই হল ত !

একটা অচেনা গ্রামের মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলেছে গঙ্গাচরণ।

জঙ্গলের আরেকটা অংশ।

কাটাঝোপের মধ্যে দিয়ে অতি সাবধানে কাপড় বাঁচিয়ে হেঁটে চলেছে অনঙ্গ, ছুটুকি ও মোক্ষদা।

মোক্ষদা একটু সেগে বামুনদিদি — কাটা !

অনঙ্গ সে আর বলতে ! এর মধ্যে আটকেছে কাপড়টা।

ঢালু পথ দিয়ে নেমে এসে আরো গভীর বনে প্রবেশ করে তিনজন।

অনঙ্গ তাকে এইসব আলু-টালুর খবর কে দেয় রে ছুটুকি ? — তোর নাগর বৃত্তি ?

ছুটুকি ও মোক্ষদা খিলখিল ক'রে হেসে ওঠে।

ছুটুকি ও মা গো ! — বামুনদিদির বা কথা !

শঙ্করপুর গ্রাম।

পথের ধারে একটা শোড়া ইটের মন্দির, তার পাশেই বসে গঙ্গাচরণ একটু তিরিয়ে নিচ্ছে। একটা লজ্জা শুনে সে ঘাম মোছা বন্ধ ক'রে পাশের দিকে চায়। শব্দবাহীর দল আসছে হরিধ্বনি করতে করতে।

‘হরি হরি বল — হরিবোল ! হরি হরি বল — হরিবোল !’

গঙ্গাচরণ উঠে এগিয়ে যায়।

তার সামনে দিগে শংখাঙ্গীর দল চলে যায়। এগোস্তীর মড়া — মাথায় সিঁহর, লালপেড়ে শাড়ি, পায়ে আলতা।

গঙ্গাচরণ জোড়হাত ক’রে কপালে ঠেকায়।

কাছেই একটি বাড়ির দাওয়ায় একজন বৃদ্ধ বসে আছেন। গঙ্গাচরণ তাকে প্রশ্ন করে —

গঙ্গা। নিবারণ ঘোষের বাড়িটা কোথায় বলতে পারেন ?

নিবারণ ঘোষের বাড়ি।

নিবারণ চাল আমার আছে বাবাঠাকুর। দুই মণ চাল আছে। আপনি ব্রাহ্মণ। আপনারা মিথ্যা বলব না। কিন্তু সে চাল বিক্রীত নয়।

গঙ্গাচরণ গিড়কির বাইরে গাড়িয়ে আছে। নিবারণের কথায় তার মুখে গভীর হতাশার ভাব ছুটে ওঠে।

গঙ্গা। চাল বেচবে না ?

নিবারণ না বাবাঠাকুর। আজ সকালে মঙ্গলন গঙ্গের এয়েছিল — ধাম। দিয়ে। সবাইকে বিদেয় ক’রে দিয়েছি।

গঙ্গা। আমি সাত ফোণ পথ ছেটে আসছি।

নিবারণ সে আমি কাঁ করব বাবাঠাকুর ? ও চাল আমি বেচব না।

গঙ্গা। আমি পয়সা এনেছি সঙ্গে — দাম দিচ্ছি।

নিবারণ পয়সা কি আমি বুঝে থাকে। বাবাঠাকুর ? ও চাল একবার গেলি কি আর আসবে ? ও চাল বেচব না।

গঙ্গা। তাহলে আর কী। — তাহলে আমি আসি।

গঙ্গার আশা ভেঙে গেছে। সে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে রওনা দেয়।

নিবারণের হঠাৎ কী জানি খেয়াল হয়, সে দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে এসে গঙ্গাকে ডাক দেয়।

নিবারণ বাবাঠাকুর ! — শোনে, শোনে বাবাঠাকুর।

গঙ্গা থামে। নিবারণ গঙ্গার একেবারে কাছে চলে আসে। তাকে দেখে ভারি কুণ্ঠিত বলে মনে হচ্ছে।

নিবারণ আমি চাল দিচ্ছি — আপনি আমার বাড়িতে রাখা ক’রে ছুটি খেয়ে যান।

গঙ্গা মাথা নাড়ে।

গজা সে হয় না। রাজার চালই যদি দেবে ত আরো ছুটা বেশি দাওনা বাপু। আমার একার হস্তে ত নয়, আমার ঘরে ত আরো লোক আছে।

নিবারণ না বাবাঠাহুর। সে হয় না। আপনি একটা ভুব দিয়ে রজ্জু চড়িয়ে ছুটি ভাত খেয়ে নেন। আপনাকে না খেয়ে যেতে দিলে পরে পাণ হলে বাবাঠাহুর। আমার পুত্রে মাছ আছে, আমি খরিয়ে দিচ্ছি। মাছের কোল, ভাত, গন্ধর দুধ— আপনি প্যাট ভইরে খেয়ে নেন। একটা পয়সা দিতি হবে না আপনাকে। আমার মেয়ে আছে, সেই সব ব্যাবস্থা ক'রে দেবে। পেস্থি, অ পেস্থি! —

নিবারণ মেয়েকে ডাকতে চলে যায়।

এবারকে হার মানতে হয়। এই অস্থায় খাবার লোভ সংবরণ করা তার পক্ষে অসম্ভব। সে আবার নিবারণের দরজার দিকে এগিয়ে যায়।

অনঙ্গ।

ছুটুকি আর মোক্ষনা শাশন দিয়ে মাটি খুঁৎহে মেটে আলুর তক্ত। অনঙ্গ কাছেই গাড়িয়ে আছে।

অনঙ্গ কী কাটারে বাবা! এত কাটা জানলে কি আর আসি।

মোক্ষনা আমি ত তোমারে বললাম বাবুনদিদি যে তোমার আসার দরকার নাই, আমরা নিজে এসে তোমারে আলুর ভাগ দিয়ে বাব।

একজন লোকের পা — জননের ভিতরের পথ দিয়ে যেতে যেতে নারীকণ্ঠ হবে থেমে যায়। দূর থেকে অনঙ্গের কথা শোনা যায়।

অনঙ্গ বাড়িতে একা একা বসে থাকতে ভালো লাগে না রে। খতল হুন্দি। নাগায় আসে।

লোকটা একটা বটগাছের দিকে এগিয়ে যায়। এখানে লোকটার পুরো পরীরটা শিছন থেকে দেখা যায়। তার পরনে কালো সাট। বনে হয় এই লোকটাই প্রথম চাল লুট আরম্ভ করেছিল।

লোকটা বটগাছের আড়ালে গিয়ে গাড়ায়। এখান থেকে দূরে অনঙ্গদের দেখা যায়। লোকটা অপেক্ষা করে।

নিবারণ ঘোষের গোয়াল ঘর।

উহুনের উপরে কড়ায় তেল ফুটেছে। বা দিকে কাসিতে সন্ধ্য কাটা। তিন ইঞ্চিরো পোনা মাছ, ডান দিকে ব্যাকোষের উপর বাটা হলুদ, হুন, লঙ্কা।

গন্ধাচরণ শ্রান ক'রে রহইয়ের অন্ত তৈরি হয়ে বসেছে, কিন্তু অভ্যাস নেই বলে কান্নাটা কীভাবে জ্ঞপ করতে হবে সেটা বুঝতে পারে না। কিছুক্ষণ ইতস্তত

ক'রে শেষে এক টুকরো মাছ তুলে নিয়ে কড়ার উপর ধরতেই নেপথ্যে খেতি বলে ওঠে—

খেতি দাদাঠাকুর ! —

গঙ্গা খাড় ফিরিয়ে দেশে দরকার মুখে পাড়িয়ে নিবারণ ঘোষের বোড়শবছরীয়া বিধবা মেয়ে মিটি মিটি হাসছে।

খেতি রাত্রার অভ্যাস নেই বুঝি ?

গঙ্গা না, মানে, 'ওটা ঠিক...

খেতি আমি দেখিয়ে দেব ? আমি বলে বলে দিই, আপনি সেই ডাবে রাঁদুন ?

গঙ্গা খেতির কাছ থেকে নির্দেশ নিতে প্রস্তুত হয়।

অপল।

ছুটকি — মোক্ষদা মাটি খুঁড়ে চলেছে, আর পানিকটা খুঁড়লেই হয়ত আলু বেরিয়ে পড়বে।

অনঙ্গ মাটিতে একটা বেগুনী ফুল দেখে হাত বাড়িয়ে সেটা গাছ থেকে ছিঁড়ে নেয়। লজ্জাবতী গাছ, গাছের পাতাগুলো কঁকড়ে নেতিয়ে পড়ে।

খাকি সাট পর। আগন্তুকটি বটগাছের শুঁড়ির মধ্যে একটা কাঁকের ভিতর দিড়ে একদৃষ্টে মেয়ে ভিনজনের দিকে দেখছে।

আগন্তুকের অলস বিড়ি অঙ্ককারের মধ্যে অলে অলে উঠছে।

নিবারণ ঘোষের গোয়াল ঘর।

গঙ্গা ভাতের মধ্যে মাছের কোল ঢালে, ভাত মাখতে শুরু করে।

খেতি দোরগোড়ায় পাড়িয়ে দেখছে।

মাখতে মাখতে গঙ্গার হাতের আঙুলগুলো হঠাৎ কেমন বেন নিস্তেজ হয়ে আসে। মাখা থেমে যায়। গঙ্গা চুপ ক'রে বসে থাকে।

খেতি খাবেন না দাদাঠাকুর ?

গঙ্গা মাখা নাড়ে।

খেতি শরীর খারাপ করছে ?

গঙ্গা আবার মাখা নাড়ে, ধীরে।

খেতি ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করে। হয়ত পারে ও বুঝতে।

খেতি ঘরে লোক আছে বুঝি ?

গঙ্গা ধীরে মাথাটা তোসে। সে কককটে খেতির প্রশ্নের জবাব দেয়।

গঙ্গা। মশ আমার পাতে তেল দেয়, ক্যান্ডি!—নিভের ভুলে কিছুটা রাখে না।

পেশ্বি মহাভূত্বতিপূর্ণ চুইতে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে গঙ্গার দিকে। তারপর —

পেশ্বি। আপনি পান বাঁঠাকুর। আপনি পেট ভরে পান। গাওয়া হলে পর গুই বাশঝাড়টার পিছনে এসে অপেক্ষা করবেন। আমি আপনার জন্য কিছু চাল দিয়ে দেব।

গঙ্গা অবাক হয়ে পেশ্বির দিকে চায়। এতটা মমতা সে আশা করে নি।

পেশ্বি। আর যদি কখনো চালের অভাব হয়, আপনি আমার কাছে আসবেন। আমি যা পারি দিয়ে দেব। আপনি পান।

ভগল।

ছুটকি ও অনঙ্গ ভরনে মিলে যেটে আলুটাকে টেনে তোলে। আলুর ভারে ছুটকি টান সামলাতে পারে না, মাটিতে গড়িয়ে পড়ে। তারপর কোনোরকমে উঠে লাড়িয়ে একাই আলুটা কাঁধে করে নেয়।

অনঙ্গ। খালিটা আমার চাতে দে না।

ছুটকি। কেন? তোমার রাঙা হাতে কেন আমার। চলে।

ভিনভনে রওনা দেয়।

গাছের পিছন থেকে আগন্তুক চেয়ে রয়েছে।

অনঙ্গর শাড়ি কাটাগ ঝাঁটকে যায়।

অনঙ্গ। এই যাঃ!

ছুটকি। কী হল আমার?

অনঙ্গ শাড়িটাকে ঝাঁচিয়ে কাঁটা ছাড়াতে চেষ্টা করে।

অনঙ্গ। তোরা এগো — আমি আসছি।

ছুটকি — যোকন! এগিয়ে যায়।

গাছের পিছন থেকে লোকটা ফেৎছে।

অনঙ্গ এখন একা। সে উপর হয়ে কাঁটা থেকে শাড়ি ছাড়াচ্ছে।

লোকটা হাত থেকে বিড়ি কেসে দেয় ছুঁড়ে। সেট! একটা নালার জলে পড়ে ভেসে চলে যায়।

ভঙ্গীবিমানের শব্দ শোনা যায়।

লোকটা গাছের পাশ থেকে বেরিয়ে অনঙ্গকে নক্সা করে ফ্রুতপদে এগিয়ে আসে।

ছুটকি আর যোকন! এরোগ্রেনের শব্দ শুনে থেমে আকাশের দিকে চায়।

ছুটকি। এই, উড়োজাহাজ!

মোকদ্দা কোথায় রে?

অনঙ্গও আকাশের দিকে মুখ তুলেছে, এমন সময় পিছন থেকে লোকটা এসে ডান হাতে অনঙ্গর মুখটা চেপে বাঁ হাত দিয়ে তাকে জাপটে ধরে।

৩৪



৩৫

১৯৮০ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত গল্প

অনঙ্গ ও তার সঙ্গী (৩৫)

২০০০ সালে প্রকাশিত



ছুটকি — মোকদ্দা এখনো এরোপ্লেন দেখার চেষ্টা করছে। ভেঁ শব্দে কান পাতা যায় না।

মোকদ্দা অনেকগুলো একসঙ্গে বোধ হয়।

ছুটকি এত পাতা — আকাশ দেখাই যায় না!

লোকটা অনঙ্গকে মাটিতে ফেলে তার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। তার বাঁ হাতটা এখন অনঙ্গর মুখের উপর চাপা, ডানহাতটা দিয়ে সে অনঙ্গর বকলগ্র শাড়ির খাচলটা ধরে টানাটানি করছে। অনঙ্গ প্রাণপণে নিজে থেকে মুক্ত করতে চেষ্টা করছে। মুখের উপর থেকে হাতটা সরাতে চেষ্টা করছে। প্লেনের শব্দ কমে আসে। অনঙ্গ এক গুরুত্বের জ্ঞান নিজের ঠোঁট ছোটোকে মুক্ত করে একটা পরিমিত চিৎকার দেয়।

অনঙ্গ ছুটকি —!

ছুটকি চিৎকার শুনে ঝটতি গুর চক্ক দিফারিত করে কাঁধ থেকে যেতে আলুট। ফেলে ছুট দেয় অনঙ্গর দিকে।

মোকদ্দাও তার পিছু নেয়।

শাবল হাতে দুজনকে আসতে বেগে লোকটা অনঙ্গকে ছেড়ে পালাতে চেষ্টা করে।

কিন্তু বেশিদূর যাবার আগেই ছুটকির শাবলের বাড়ি তার পিঠের উপর পড়ে।

মোকদ্দাও এসে পড়ে। দুজনে মিলে লোকটাকে নির্দয়ভাবে প্রহার করতে থাকে।

অনকও উঠে পড়েছে। সে দিশাহারা। ভাবে এগিয়ে চলেছে। তার খোঁপা আলগা হয়ে গেছে, পিঠ থেকে শাড়ির খাঁচল খসে পড়ে মাটিতে লুটোচ্ছে। সামনে একটা অজুর্ন গাছ; অনঙ্গ সেটাকেই অবলম্বন ক'রে পাড়িয়ে হাঁপাতে থাকে। এদিকে গ্রহণের চোটে বৃত্তপ্রায় হয়ে লোকটা। নালার গড়িয়ে পড়ে। মোক্ষদা কান্না হয়ে ধপ্, ক'রে মাটিতে বসে পড়ে হাঁপাতে থাকে। ছুটুকি তার রক্তমাখা শাবলটার দিকে দোঁপে নিয়ে অনঙ্গর দিকে ধাওয়া ক'রে যায়। বাবার পথে মোক্ষদাকে উদ্দেশ্য ক'রে বলে—

ছুটুকি তুমি আবার বসে পড়লে কেন— ওঠ!

মোক্ষদা কোনোরকমে উঠে পাড়ায়।

ছুটুকি অনঙ্গর শাড়ির গ্রাস্ত মাটি থেকে তুলে নিয়ে তার পাশে এসে পাড়ায়।

ছুটুকি চলে বামুনদিদি— আর এখানে নয়।

অনঙ্গর উদ্ভ্রান্ত ভাব এখনো যায় নি।

অনঙ্গ কী হল আমার— কী হল!—

ছুটুকি কিছু হয় নি— চলে— কিছু হয় নি—

ছুটুকি অনঙ্গকে কাছে টেনে নেয়। অনঙ্গ ছুটুকির কাঁধে ভর করে। দুজনে এগোয়।

মোক্ষদাকে ও নালার জল ভেঙে এগিয়ে আসতে দেখা যায়।

ছুটুকি (মোক্ষদাকে) আলতা সঙ্গে নিয়ে নিও!

নালার জল ধর্ষণকারীর রক্তে লাল হয়ে গেছে। ফ্রেমের একপাশে লোকটির একটি অনড় হাত জলের উপর চিত হয়ে পড়ে থাকতে দেখা যায়।

গলাচরণের বাড়ির পিছন দিক।

ছুটুকির কাঁধে ভর ক'রে অনঙ্গ এগিয়ে চলেছে বিড়কির দিকে। পিছনেই কাঁপে আলু নিয়ে মোক্ষদা।

অনঙ্গ দরজায় এসে পৌছায়, দরজায় ভর ক'রে হাঁপাতে থাকে।

অনঙ্গ ঠিক আছে। তোরা খা—

মোক্ষদা তুমি একটু চুপটি ক'রে শুয়ে থাক বামুনদিদি— আমরা যুরে আসছি।

অনঙ্গ ঠিক আছে।

মোক্ষদা ও ছুটুকি রওনা দেবে, এমন সময়—

অনঙ্গ শোন—

দুজনে আবার এগিয়ে আসে।

অনঙ্গ কাউকে বলসি না, কথা দে—

মোক্ষদা ওমা, এসব কথা কেউ বলে নাকি বাঘনদিদি!

অনঙ্গ ছুটকির পেটে কোনো কথা থাকে না।

ছুটকি তোমাকে নিয়ে বপন কথা তখন তেন কাকপক্ষীতে ও টেরটি পাবে না।

অনঙ্গ ঠিক আছে, তোরা যা।

শোবার ঘর।

অনঙ্গ ঢুকে দরজাট। বন্ধ করে দেয়। সে এখনো বিশেষ্যারী— কী চল কী হবে কিছুই যেন বুঝতে পারছে না। দরজায় পিঠ দিয়ে সে ঘরের জিনিসপত্রের দিকে দেখে— কোণায় হাড়িকুড়ি, আলনাঘ কাপড়, তাদের উপর পুরো উপচার, দেবদেবীর ছবি।

এবার অনঙ্গর দৃষ্টি যায় দেয়ালে টাঙানো আয়নার দিকে। অনঙ্গ আয়নার দিকে এগিয়ে যায়, আয়নার সামনে এসে পাড়ায়, আয়নার নিজের প্রতিবিম্বের দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে থাকে।

অর্জুন বন।

অনঙ্গ পাখলের মতো ছুটে চলেছে বনের মধ্যে দিয়ে।

নদী।

অনঙ্গ জলে সাঁপ দিয়ে পড়ে। বার বার ডুব দিয়ে নিজেকে শুদ্ধ করার চেষ্টা করে।

গঙ্গাচরণের ঘরের দাওয়া।

গঙ্গা পা ধুচ্ছে।

একটা মুছ শব্দ শুনে সে পিছন ফিরে গিড়কির দিকে দেখে।

গঙ্গা! গা ধুয়ে এলে?

গঙ্গা গামছায় পা মুছে কুলুঙ্গি থেকে হাঁকোটা হাতে নেয়। তারপর আবার গিড়কির দিকে দেখে।

এবার অনঙ্গকে দেখা যায়— সিক্তবদনে অধোবদনে গিড়কির এক পাশে হুপ করে ঝড়িয়ে আছে। গঙ্গা স্বভাবতই ব্যাপারটা বুঝতে পারে না।

গঙ্গা! কী হল তোমার?

অনঙ্গ ধীরপদে দৃষ্টি নত করে দাওয়ার দিকে এগিয়ে আসে।

গঙ্গা! কী ব্যাপার?

‘কনক পাওয়ার সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে হার্মীর পাশে এসে পাড়ায়। এখনো তার দৃষ্টি নত।

গজ। কী হয়েছে বল ত? আমি চান এনেছি

কনক এবার গম্বীর দিকে মুখ তুলে চায়। পরম্বর্তেই সে আর কনক রোদ করতে না। পেরে হার্মীর ক্রুর উপর কাঁপিয়ে পড়ে।



মেবাজের মজার আকাশ স্বর্গাধের রঙ।

সেই প্রজাপতি ছুটি নৃত্যরত অবস্থায় আবার দেখা যায়।

ইটপোনা। কিছুদিন পরের দূর। ইটের পাজার উপর বসে বড়পোড়া। পকেট থেকে

বিড়ি বার ক'রে মুখে পুরে তাতে অগ্নিসংযোগ করে।

সে যেখানে বসেছে সেখানে থেকে অজুর্ন বনটা দেখা যাচ্ছে। বহু কী কারণে জানি

বনের দিকে একবার দেখে নেয়।

ছুটকির বাড়ি।

তারের খাচার ভিতর একটা কাঠবিড়ালি ছটফট ক'রে ঘুরছে। তার পাশেই তটম

হলে বসে আছে ছুটকি।

বিশেষ মশাইয়ের বাড়ির খাইয়ে।

হীকু, অধর, হরিশর্প, নটবর, ক্ষেত্র ইত্যাদি সকলে দাওয়ায় সামনে ভেঁড়া হয়েছিল। কেউ বসে আছে, কেউ দাঁড়িয়ে। সকলেরই দৃষ্টি বিশেষ মশাইয়ের দিকে। বিশেষের কাছেই দাওয়ায় উপরে বসেছে গলাচরণ। কিছুকণ কাকুর মুখে কথা নেই, তারপর অধর হরিয়া হয়ে বলে ওঠে—

অধর আপনার হাতে পায়ে ধরছি বিশেষ মশাই—আপনি কর্তৃপক্ষ দিয়ে আমাদের—
পাখাতাকে বাঁচিয়ে রাখুন!

ক্ষেত্র আপনি যদি আমাদের দিকে না দেখেন ত হেলেনিলে নিয়ে কোণায় খাই
বলুন!

বিশেষ ধান নেই। একটি দানাও নেই। গোলা খুলে দেখ—গোলা ত রয়েছে—গোলা
খুলে দেখ!

অধর আর ছুইদিন কাকুর পেটে এক দানা চাল পড়ে নি বিশেষ মশাই!

বিশেষ তবে আর কি!—তুমি আধ কাঠা চাল নিয়ে যাও আমার ঘর থেকে—আমি
নাহয় এক মুঠো কম পাব!—কী বলেন পণ্ডিতমশাই—আঁ?

বিশেষের স্বেচ্ছাক্রমে গঙ্গার কোনো ভাষণনিবর্তন হয় না। সে একই ভাবে হতাশ
দৃষ্টিতে সামনের দিকে চেয়ে থাকে। বিশেষ তার টাঁক থেকে একটা চাবির গোছা
বার ক'রে গঙ্গার দিকে ছুঁড়ে দেয়।

বিশেষ পণ্ডিতমশাই, এই মিন ত চাবি—একবার গোলাটা খুলে দেখিয়ে দিন ত
ওদের কী আছে না আছে।

দওয়ায়মান চাবীদের মধ্য থেকে গোবিন্দ কাপালি হঠাৎ কঠিন স্বরে বলে ওঠে—

গোবিন্দ গোলা দেখতি হবে না বিশেষ মশাই। আমরা জানি ও গোলায় আপনার
ধান নেই।

বিশেষ ঘেন আকাশ থেকে পড়ে।

বিশেষ তবে কিসে আছে—আঁ?—কিসে আছে?

গোবিন্দ ধান আছে আপনার বাড়িতে।

বিশেষ আমার বাড়িতে? আঁ?

হীকু আপনার ধান আপনি লুকিয়ে রেখেছেন।

বিশেষ লুকিয়ে রেখেছি? আঁ? আমার নিজের ধান আমি লুকিয়ে রেখেছি?

হীকু ও গোবিন্দ দল থেকে বেরিয়ে চলে যায়।

গঙ্গা দাওয়া থেকে চাবির গোছা ভুলে নিয়ে বিশেষের হাতে দিয়ে উঠে পড়ে।
তার বিকৃত ভাব বিশেষকে ঘেন কিকিৎ বিচলিত করে। বিশেষ উঠে গঙ্গার দিকে
এগিয়ে আসে।

বিবেশ আপনি ব্রাহ্মণ—আপনার মিথ্যা। বললে আমার নরকভোগ—সত্যি বলছি,
ধান আমার একদানিও নেই—

গলা কোনো কথা না বলে চলে যায়।

ছুটকির বাড়ি।

ছুটকি এখনো সেইখানেই বসে আছে। এবারের ধীরে ধীরে সে দৃষ্টিটা ডানদিকে
ঘোরায়। বাড়ির উঠোনটার দিকে দেখছে। একটি পাটিয়াতে একটি প্রৌঢ় চাষী
ওশাশ কিরে ঘুমাচ্ছে। আশেপাশে আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

ছুটকি উঠে পড়ে।

দরজা দিয়ে ধেঁয়সে একটি বাইরের উঠোন পেরিয়ে আরেকটা দরজা দিয়ে সে
একেবারে বাড়ির বার হয়ে যায়।

দুটো বাড়ির মাঝখানে একটি। মকু গলি দিয়ে ছুটকি এগিয়ে যায় আরেকটা দরজার
দিকে। এটার পরেই একটি পুঁহর, তার পরেই অর্জুন বন। ছুটকি যাচ্ছে সেট
বনের দিকে।

ইউখোলা।

যত্ন এখনো সেইখানেই বসে বিড়ি টানছে।

আবার তার দৃষ্টি দূরে অর্জুন বনের দিকে চলে যায়।

এবার দূর থেকেই দেখা যায় একটা লাল শাড়ি পরা মেয়ে এসে বনের মধ্যে পাড়িয়ে
ইউখোলার দিকেই চেয়ে আছে।

যত্ন ছুটকিকে চিনতে পেরে পাড়ার উপর থেকে মাটিতে নেমে পাড়ায়।

ছুটকি বিধাভূক্ত ভাব নিয়ে যত্ন দিকে দেখছে। যত্নের মধ্যে বাবদান প্রায়
একশো গজের।

যত্ন ও ছুটকির দিকে দেখছে। সে দুবার হাতছানি দিয়ে ছুটকিকে ডাকে। ছুটকি
হঠাৎ কী মনে করে জানি আবার বাড়ির দিকে রওনা দেয়। এমন সময় একটা শব্দ
তার গতিরোধ করে।

তার কাছেই একটা গাছের ডালে শব্দে একটা ইট এসে আঘাত করেছে।

ছুটকি বোঝে এটা যত্নর কীতি।

ছুটকি আবার যত্ন দিকে দেখে; যত্ন আবার তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে।

এবার ছুটকি যত্ন দিকেই রওনা দেয়।

যত্ন — ছুটকি সাক্ষাৎ হয়।

ছুটকি ঢেলা মারলি কেন? যদি গায়ে লাগত?

যত্ন ছুটকির দিকে এগিয়ে আসে। সে জানে ছুটকি এই প্রশ্ন করার ক্ষমতা তার কাছে
আসে নি।

ছুটকি চাল কোথায় ?

যদু আছে।

ছুটকি কোথায় ?

যদু তুই আগ আমার সঙ্গে। আগ -

ছুটকি যত্নে অস্ত্রসংরক্ষণ করে।

একটা বচরুপী বসে আছে মাটিতে। যত্ন করছে বচরুপীটার মাথাটা। একপাশে একটু ঘুরে যায়।

যদু এই যে, এদিকে -

একটা পোড়ো বাড়ির সামনে এসে চাকির চমকে দৃষ্ট। মাটির প্রকাণ্ড মাট-চালটির জানালা দরজা ছাউনি কিছু নেই, শুধু দেয়ালগুলো দাঁিয়ে আছে।

ছুটকি আর যত্ন বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। জনমানবশূন্য ধর্মধমে পরিবেশ, পাণির ডাক ছাড়া কোনো শব্দ নেই।

যদু তুই পাড়া, আমি আসছি।

যত্ন পাটিলের একটা ভাড়া অংশ টপ্পে বাড়ির ভগ্নপূর্ণের ভিতর অন্ধ হয়ে যায়। ছুটকি অগ্রমনস্কভাবে ঝাঁকিয়ে এগিয়ে যায়।

যত্ন খলিতে চাল নিয়ে বেরিয়ে আসে। কোথায় গেল ছুটকি ? কেই যে।

যত্ন এগিয়ে গিয়ে ছুটকির পিছনে দাঁড়ায়। এলি থেকে পানিকটা চাল বার করে ছুটকির সামনে ধরে।

যদু এই স্থাপ্!

ছুটকি হাতের এক ঝটকায় চালটা মাটিতে ফেল দেয়।

যদু ও কি রে ? কত ক'রে ভোগাড় করিচি জানিস ? শুধু তুই বলে -

ছুটকি আগার এসব কথা কেন ?

ছুটকি যত্নে ছেড়ে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। যত্ন তার পিছনে ধাক্কা করে।

যদু মাইরি বলছি - কালীর দিবি - তুই বিশ্বাস কর ! - এই ছুটকি !

ছুটকি ধামে। যত্নও দাঁড়িয়েছে তার কাছে গিয়ে। কয়েক মূলত হতনেই নির্ধাক। তারপর ছুটকি একটা অপ্রত্যাশিত শব্দ করে বলে।

ছুটকি তোর মূখ পুড়ল কি ক'রে ?

যদু শুধু কি মূখ ? এই ঘাখ -

যত্ন তার মাট তুলে পেটে পোড়ার দাগ দেখিয়ে দেয়।

ছুটকি কী হয়েছিল ?

ছুটকি প্রহরা করেই হাটতে শুরু করে, যেন যত্ন সারিধা তার পক্ষে বেশিফল-বরদাস্ত করা অসম্ভব। যত্ন তার পিছন পিছন যায়।

যত্ন কালীপুতোর দিন — একটা তুর্ভি — বার বার আগুন দিচ্ছি — তাও সাল। কিছুতেই জ্বলে না। শেখটার কাছে গেছি দেখব বলে — অমনি সাল। নামের সামনে বম্ ক'রে বাস্ট করল!

ছুটকি খেমেছে। যত্ন তার পিছনে। কথা শেষ ক'রে যত্ন হু পা এগিয়ে আসে ছুটকির দিকে। ছুটকি একটা শুকনো হাসি হাসে।

ছুটকি তোরাও দেখছি সহজে মরণ নেই!

ছুটকি এগিয়ে যায় ভগ্নবৃক্ষের দিকে। একেবারে শেষ প্রান্তে দুটো ডাঙা দেয়াল এক ভায়াগায় মিশে একটা নিতৃত কোণ তৈরি করেছে। ছুটকি সেই কোণে পাড়িয়ে অপেক্ষা করে।

যত্ন ছুটকির দিকে এগিয়ে যায়।

একটা উর্বর দৃষ্টিকোণ থেকে গভীরত্বের বাড়ির উঠোনটা দেখা যাচ্ছে। সামনের দিকে বাড়ির দরজা, পিছনে বেড়ার ওদিকে রাস্তা, ও আরো পিছনে খান কয়েক পেরিয়ে নদী। এদিক সেদিক থেকে লাঁঘের শব্দ ভেসে আসছে। অনঙ্গ উঠোন পেরিয়ে গিয়ে তুলসী — মকতে প্রদীপ দিয়ে প্রণাম করে।

পোড়ো বাড়ি।

ছুটকি কোঁচড়ে চাল নিয়ে চোরের মতো বেরিয়ে আসে। যত্নও আসে তার পিছন পিছন।

যত্ন যা বললাম মনে রাখিও। সব ব্যবস্থা ক'রে রাখ। কোনো ঝগড়া হবে না —

গভীর বাড়ি। রাগাঘরের দাওয়া! সন্ধ্যা নেমে এসেছে।

অনঙ্গ হারিকেন লঠন জ্বালায়। কাচের ঢাকনাটা বন্ধ করার সময় গিড়কির দিকে চোখ পড়ে।

অনঙ্গ কি রে ছুটকি — এত সন্ধ্যা ক'রে — কী ব্যাপার?

ছুটকি গিড়কির পাশে পাথরের মতো পাড়িয়ে আছে, তার দৃষ্টি অনঙ্গের দিকে।

ছুটকি কী করছ দেখতে এলাম।

অনঙ্গ কী আর করব — যদিই আলো জ্বালতে পারি জ্বালব, তারপর অন্ধকারে থাকব!

অনঙ্গ লঠন নিয়ে উঠে পড়ে। ঘরের দাওয়ার দিকে বাবার মাথাপথে ছুটকির

একটা প্রহর শুনে তাকে ধমকে থেমে যেতে হয়।

ছুটকি চাল নেবে?

অনঙ্গ চাল!—

ছুটকি তার কোচের দিকে দেখায়।

অনঙ্গর কাছে ব্যাপারটা প্রায় অবিস্মৃত।

অনঙ্গ তুই কোথায় পেলি ও চাল?

ছুটকি অধোবদনে, নিরুত্তর। অনঙ্গর মনে একটা বিলী সন্দেহ জাগে।

অনঙ্গ তুই কোথেকে আসছিস বলত?

ছুটকি ভূমি জানত।

অনঙ্গ না, আমি জানি না তুই বল।

ছুটকি ইটপোলা।

অনঙ্গ চমকে ওঠে কথটা শুনে। তারপর ধীরে ধীরে দাওয়ার উপর বসে পড়ে।

তার মনটা ঘেন ভেঙে পড়েছে। সে ছুটকির দিকে ছুক দৃষ্টি দেয়।

অনঙ্গ তোর দোয়ামি রয়েছে না?

ছুটকিও যেন অনঙ্গ কষ্ট পেয়েছে বুকেই নিজের অশ্রু সংবরণ করতে পারে না।

৩/২০৩-৫
১৫



CU

ছুটকি অনঙ্গর দিকে দাঁত — (অনঙ্গর দিকে দাঁত —

ছুটকি বিশেষ পেনে আমার মাথার ঠিক থাকে না!— যেদিন থেকে এসেছে ওই যুগ-পোড়া, সেদিন থেকে আমার পিছনে লেগেছে। আজ—এই এতদিনে...

অনঙ্গ এর ভক্ত তোর কোথায় গিয়ে জবাবদিহি করতে হবে জানিস?

ছুটকি কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকে। তারপর নিজেকে সংযত ক'রে চোখের জল মুছে নিয়ে আবার অনঙ্গর দিকে দেখে।

ছুটকি চাল নেবে?

অনঙ্গ তুই খা গিটো ভাত। ও চাল আমি নেব না।

অনন্স দাওয়া ছেড়ে উঠে চলে যায়।

ছুটকি তবে ভূমি কর গে উপোস — আমি চললাম।

সেই রাতে।

আগছা জোয়ার আর আলোতে দেখা যায় একটা অশ্ব গাছের গুঁড়ির আড়ালে দুটি লোক হাতে লাঠি নিয়ে ঘাপটি মেরে গলে আছে।

কিছু দূরে বিশেষ মশাইকে হাতে ৭টি নিয়ে আসতে দেখা যায়। সে সন্দিগ্ধভাবে এদিক-ওদিক চাটছে।

একবার মাঝপথে হঠাৎ থেমে অশ্ব গাছটার দিকে তাকিয়ে 'কেরে' বলে হাক দেয়, কিন্তু কোনো উত্তর পায় না।

গাছের পাশ দিয়েই বিশেষকে যেতে হলে। সে এগিয়ে আসে। গাছটা পেরোতেই লোক দুটি লাঠি উড়িয়ে বেরিয়ে এসে বিশেষকে আক্রমণ করে ধরাশায়ী করে।

তারপর বিশেষকে তারা টেনে নিয়ে গিয়ে গাছের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাধে। বিশেষের মাথা এক পাশে হেলে পড়ছে, রক্ত গড়িয়ে পড়ছে গাল দিয়ে।

পরদিন সকাল।

মাথায় ব্যাঙজবক অবস্থায় বিশেষ তার বাড়ির দাওয়ায় তক্তপোশে বেঠান হয়ে পড়ে আছে, তার বিদবা মেয়ে সহ তাকে ঠেলা দিয়ে সজিত কিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে।

সহ বাবা, বাবা! — আমি সহ, বাবা — সহ —

বিশেষের চোখের পাতা কঁক হয়, বহুগাণ্ড কুঞ্চিত হয়, মাথাটা ঊষ্ম এ পাশ ও পাশ করে।

সহ আমি সহ বাবা — তোমার মেয়ে!

বিশেষ সহ মা! —

সহ হ্যাঁ বাবা, সকাল হয়ে গেছে! —

বিশেষের চাহনিতে হঠাৎ আতঙ্ক ফুটে ওঠে।

বিশেষ ডাকাত! ডাকাত! —

সহ আর ভয় নেই বাবা! সকাল হয়ে গেছে —

গদাচরণ দরজার মুণ্ডাকে এসে দাঁড়িয়েছে। সে ব্যক্তি কথাগুলো শুনতে পায়।

বিশেষ সব নিয়ে গেছে?

সহ কী বাবা?

বিশ্বেস সেই সব - আড়ার - বস্তার ?

সজ্জা না বাবা। কিছু নেয় নি - সব ঠিক আছে।

গঙ্গা এবার ভিতরে ঢুকে আসে, বাঁওরায় উঠে বিশ্বাসের পাশে এসে পাড়ায়।

গঙ্গা 'পাশি সব করে রব !' - বিশ্বাস মশাই এখনো বিছানায় ? -

গঙ্গাচরণকে দেখেই বিশ্বাস হাউমাউ ক'রে ওঠে।

বিশ্বাস আমি এখানে থাকব না পণ্ডিতমশাই - সামান্য হুঁচকার মণ্ডি চলে গেছে না ঘরে রাগে বলুন ! - তার সঙ্গে মাহুদ খুন !

গঙ্গা খাটের পাশটায় বসে, বিশ্বাসের বাঁ হাতটা তুলে নিয়ে বাড়ী দেখে।

গঙ্গা মাথায় চোট লেগেছে ?

বিশ্বাস ওরে বাবা ! - চক্ষে সরষে ফুল ! এরা সব ডাকাইত -

গঙ্গা আঃ ! - কথা নয় !

গঙ্গা হাত নামায়, মাথা নাড়ে।

সজ্জা কেমন দেখলেন ?

গঙ্গা কতক খাত ঝুলন হয়েছে।

বিশ্বাস আমরা চাঙ্গা ক'রে দেন পণ্ডিতমশাই ! আমি বস্ত্রবাড়ি চলে যাব - পড়ে থাক আমার জমিজমা। আজ ফস্কেছে, কাল যে খুন করবে না তার কী ঠিক আছে ?

গঙ্গা অত ফস্ ক'রে কি চাঙ্গা হাওয়া যায় ?

বিশ্বাস আপনি চেষ্টা করলেই পারেন। আপনাকে আমি - আপনাকে আমি দশ মের চাল দেব।

গঙ্গাচরণ 'পথে এসো বাবা' ভাব ক'রে বিশ্বাসের দিকে দেখে।

সজ্জা ধামা এনে দেব বাবা ?

বিশ্বাস আতঙ্কে চক্ৰ বিক্ষিপ্ত করে।

বিশ্বাস এখন না, এখন না ! এখন দিলেই সর্বনাশ ! সজ্জার পর - সজ্জার পর !

চালের দাম বাড়ছে - ৩২ - ৩৪ - ৩৬ - ৪৮ - ৪০ -

'হাতাকার' 'অনাহার' 'মহামারি' - এই তিনটি কথা পর পর পড়ায় পড়ে। তারপর গব্বরের কাগজের পাতায় শহরের রাস্তায় পড়ে থাকা দু'ভিকের মড়ার ছবি পড়ে পর পর - পাচটা।

রাষ্ট্রায় জন কাণ।

লাঠির ঠক্ ঠক্ শব্দ।

জলের উপর ছায়া পড়ে মতি মূর্চিনীর। ক্যামেরা মতির পা থেকে মুখে ওঠে। তার মুখের অবস্থা।

পোড়ো বাড়ি।

যত্ন পোড়া কার ভুল ভানি অপেক্ষা করছে। সে সিগারেট ধরায়, হাতে নতুন কেনা রিস্টওয়াচের দিকে দেখে। মূর্তির বদলে সে থাকি প্যান্ট পরেছে।

অনঙ্গ বাড়ির কাছে রাষ্ট্রার ধারে বটগাছটার তলায় এসে মতি মূর্চিনী অবসরভাবে মাটিতে বসে পড়ে।

পাশেই পুঙ্কর, পুঙ্করের ওপাড়ে বসে মোক্ষদা বাসন মাকছে। তার দৃষ্টি বটগাছটার দিকে যায়। সে দেখে একটি স্থানলোক বটগাছটার নিচে মাটিতে শুয়ে পড়ল।

মোক্ষদা হাত ধুয়ে উঠে পড়ে, মতির কাছে এসে তাকে একবার ভালো করে দেখে নিয়ে অনঙ্গ বাড়ির দিকে দৌড়ে যায়।

অনঙ্গ দাঁড়ায় বসে আছে, তার চোখে হতাশ দৃষ্টি।

মোক্ষদা খিড়কি দরজা দিয়ে ব্যস্তভাবে ঢুকে আসে।

মোক্ষদা বামুনদিদি, বটগাছতলায় কে এসে পড়ে আছে দেখ এসে।

অনঙ্গ কে রে ?

মোক্ষদা একটা মেয়েমাছ। তুমি চেনো তাকে।

অনঙ্গ উৎকণ্ঠিতভাবে উঠে পড়ে। ফটক দিয়ে বাইরে এসে সে ফ্রুতপলে এগিয়ে যায় বটগাছটার দিকে। গিয়ে দেখে মতি - নিজীবভাবে পড়ে আছে বাসের উপর।

অনঙ্গ এ কি রে মতি - তোরা এ কি দশা !

মতি চোখ পেলো - প্রায় দৃষ্টিহীন চাহনিত দেখে অনঙ্গ দিকে।

অনঙ্গ তুই এখানে শুয়ে কেন ? ওই ত আমার বাড়ি - আর !

অনঙ্গ মতির দিকে হাত বাড়ায়।

মতি ছুঁয়েনি বামুনদিদি - নাইতে হবে !

অনঙ্গ তুই উঠতে পারবি না ?

মতি শক্তি নেই -

অনঙ্গ তুই এই শরীর নিয়ে এতটা পথ এলি ?

মতি মূর্চি পাড়ায়...কেউ নেই...সব চলে গেছে ..

অনঙ্গ তুই কদিন খাদ নি বল ত ?

মতি কোনোরকমে ডান হাতটা তুলে পাঁচ আঙুল ঝাঁক ক'রে দেখায়।

অনঙ্গ ইল!—গাড়া, আমি খাবার আনছি। তুই খেতে পারবি ত?

মতি ভাত...মাছের কোল...চচ্চড়ি...

অনঙ্গ কয়েক মুহূর্ত নির্বাক। মতির ইচ্ছা পূরণ করার সামর্থ্য তার নেই। তবু সে বলে—

অনঙ্গ গাড়া, আমি আনছি খাবার।

পোড়ো বাড়ি।

যত্ন একটা ভাঙা দেয়ালের উপর উঠে বসে সিগারেট খাচ্ছে। একটা শব্দ শুনে সে পাশ ফেরে।

ছুটকি এসেছে, হাতে পোটলা। যত্ন দেয়ালের উপর থেকে নেমে আসে, দ্রুত মূগোমুগি পাড়ায়।

ছুটকি কিছুকণ যত্নের বিকৃত মুখটার দিকে চেয়ে থাকে। তারপর—

ছুটকি গাড়ি কোথায়?

যত্ন ওই ত—

ছুটকি যত্নের নির্দেশ অনুযায়ী দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেখে কিছুদূরে একটা গাছের পাশে রাস্তার উপর একটা গরুর গাড়ি পাড়িয়ে আছে।

ছুটকি হাত থেকে পোটলাটা নামিয়ে মাটিতে রাখে।

ছুটকি এটা রইল। আমি আসছি।

যত্ন দেরি করিল না কিছু!

কলাপাতায় খাবার ও একটা মাটির ভাঁড়ো জল এনে অনঙ্গ মতির পাশে রাখে।

মতি আবার যেন বেহাশ হয়ে পড়েছে। অনঙ্গ তার উপর তুকে পড়ে—

অনঙ্গ মতি—মতি—ও মতি! এই যে খাবার এনেছি কলাপাতায়। আর এই যে জল। তুই খেয়ে নে।

মতি ভাত...মাছের কোল...চচ্চড়ি...

অনঙ্গ মাছ কোথায় পাব রে মতি? মাছের মূল কি দেখেছে কেউ এ ক'মাসে? ওতে মানকচু আছে। তুই খেয়ে নে—কেনন? আমি আবার আসব—

অনঙ্গ চলে যায়।

কাছেই একটা কোপড়ার পিছন থেকে মোক্ষদার মেয়ে পুঁটি মতির দিকে চেয়ে আছে।

মতি কলাপাতার দিকে তার ডান হাতটা এগোতে চেষ্টা করে, কিন্তু হাত অতদূর পৌছায় না।

অনঙ্গ উঠোনে পাড়িয়ে কাচা কাশড় ঝুঁচোকে, এমন সময় তার চোখ যায় পিড়কি দরজার দিকে।

ছুটকি চূপ করে পাড়িয়ে আছে চৌকাঠের ঠিক বাইরে, তার চোখে জন, তার দৃষ্টি অনঙ্গর দিকে।

অনঙ্গ কী রে ? -

ছুটকি এগিয়ে এসে অনঙ্গর সামনে মাটিতে উপর হয়ে তাকে প্রণাম করে। অনঙ্গ অবাক হয়ে এক পা পিছিয়ে যায়।

ছুটকি তুমি মতীলক্ষ্য বামুনদিদি ! - আশ্চর্য্য করে। নরকে গিয়েও ঘেন ছুটি খেতে পাই।

কথাটা বলেই ছুটকি দৌড়ে বেরিয়ে যায় খিড়কি দিয়ে।

অনঙ্গ কেন - তুই কোথায় চমি ? -

ছুটকি শহরে ! -

অনঙ্গ পিড়কির দিকে ছুটে গিয়ে মুখ বাড়িয়ে চিংকার করে -

অনঙ্গ কেন শহরে কেন - ও ছুটকি !

ছুটকি দূর থেকেই গুলুঙের সজ্জা খেমে পিছন কieres জবাব দেয় -

ছুটকি খেতে, বামুনদিদি, খেতে।

সেই দুটি নৃত্যরত প্রতাপতিকে আবার দেখা যায়। এবার তারা পরস্পরের খুব কাছাকাছি।

মতি এখনো সেই ভাবেই পড়ে আছে বাসের উপর।

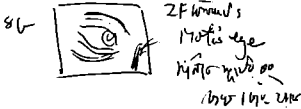
সে ধীরে ধীরে চোখ বোলে। চোখের মশি এরিক ওরিক ঘুরে এক জায়গায় নিবন্ধ হয়।

মতি দেখছে - বাসের উপর একটা কড়িঃ এসে বসল। মতির চোখ আবার ঘুরে গেল।

দূরে বাঁশঝাড়, তার পিছনে খোলা আকাশে নেমে আসা সূর্য।

মতি সেই দিকে চেয়ে থাকে নিম্পলক দৃষ্টিতে।

ক্যামেরা মতির চেয়ে থাকা চোখের দিকে এগিয়ে যায়। চোখের মণিতে
অন্তর্ধানী স্বর্ণের প্রতিকলন।



নেপথ্যে গঙ্গাচরণের কর্ণধর।

গঙ্গা। মতি -- মতি -- ও মতি !

মতি সেই ভাবেই চেয়ে থাকে।

এবার গঙ্গাকে দেখা যায়। সে মতির পাশে এসে পাড়িয়েছে।

এবার সে উপর হয়ে মতির শীর্ণ ডান হাতটা তুলে নিয়ে নাড়ী দেখে।

তারপর হাতটাকে আবার নামিয়ে রেখে মৃত মতির দিকে, বার দু'এক নুটি দিয়ে
দীরে দীরে সেগান থেকে চলে যায়।

পুঁটি এবার কোপের পিছন থেকে বেরিয়ে দৌড়ে এসে মতির পাশ থেকে কলা-
পাতায় মোড়া মানকচুটা তুলে নিয়ে যায়।

কিছুক্ষণ পর।

সজ্জা হয়ে এসেছে।

অনন্দের রাগাধরের দাঁ ওয়ায় নিখরভাবে বসে আছে। সামনেই কিছু দূরে পাড়িয়ে আছে
গঙ্গাচরণ। সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

গঙ্গা। দৃষ্টির মড়া -- কেউ চোবে না।

অনন্দের। শেয়াল কুকুরে ছিঁড়ে থাকে যে গো !

গঙ্গা। সংকারের একটা ব্যবস্থা...

গঙ্গা। দূরে বটগাছের দিকে চায়। গাছের নিচে মতির মৃতদেহ।

গঙ্গা। দেখি, আমিই যদি কিছু করতে পারি।

গঙ্গা। ও অনন্দের নুটি বিনিময় হয়।

গঙ্গা। তোমার অমত নেই ত ?

অনঙ্গ নিষিধ্য মাথা নেড়ে জানায় - না, নেই।

গঙ্গা কটকের দিকে এগিয়ে যায়।

বাইরে এসে চোখে চশমাটা পরতে গিয়ে সে হঠাৎ দূরে কী জানি দেখে থেমে যায়। তারপর অনঙ্গকে ডাকে।

গঙ্গা একবার দেখ এসে -

অনঙ্গ এসে স্বামীর পাশে পাড়ায় - রাতার দিকে দেখে।

দূরে একটা জনসমষ্টিকে এগিয়ে আসতে দেখা যায়। সব মিলিয়ে আটদশ জন লোক।

অনঙ্গ হ্যা গো এবে মনে হচ্ছে সেই -

গঙ্গা হ্যা - তিনিই। - সপরিবারে!

দুজনেরই কর্ণধর উষ্ম।

দশটা ক্রমে এগিয়ে আসছে। এখন মন্ডির মৃতদেহের কাছাকাছি।

অনঙ্গ ওয়া এখানেই আসছে, জান -

গঙ্গা জানি।

অনঙ্গ কী হবে?

গঙ্গা শুনছে সব শুদ্ধ কত জন লোক।

গঙ্গা কী আর হবে! - দুজনের জায়গায় দশজন হবে!

অনঙ্গর গর্ভগ্রাস্তে একটা রান, সলজ্জ হাসি ফুটে ওঠে।

অনঙ্গ এগারোজন!

গঙ্গা অবাক হয়ে স্ত্রীর দিকে দেখে।

গঙ্গা এগারোজন?

অনঙ্গ গঙ্গার দিকে দেখে। কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে। এবারে গঙ্গা দৃষ্টান্ত পারে।

দুজনে আবার রাতার দিকে চায়।

এবারে দীর্ঘ ভট্টাচার্যকে দেখা যায় কাছ থেকে। দীর্ঘর কোলে একটি বাচ্চা।

এবারে পর পর আলাদাভাবে তার পরিবারের বাকি সঙ্কলকে দেখা যায়। বছর তেরোর একটি মেয়ে, তারও কোলে একটি বাচ্চা; আরেকটি বাচ্চা কোলে নিয়ে তার স্ত্রী, আর সব শেষে দীর্ঘর দুটি ছেলে।

এবার আটজনকে এক সঙ্গে দেখা যায়। তারা সবাই এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে।

এবারে দেখা যায় শুধু এই আটজনই নয় - তাদের হুপশে আরো সহ লোক

রয়েছে, বর অনাহারক্লিষ্ট উষ্ম নরনারী তার।—সকলেই আমাদের দিকে এগিয়ে
আসছে—খেন আমাদেরই গ্রাস করবে।



উষ্ম অনাহার সংসীতের সঙ্গে পর্দায় একটি বিপ্লবী প্রতিচ্ছবি হয়—

‘১৯৪৩ সালে বা’লাবেশে মার্চের সপ্তি এট মধ্যমারীতে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ লোকের
মৃত্যু হয়।’

পাগল হবার আগে ॥ শম্ম ঘোষ

ফুলবেলপাতা ডাডাং ড্যাং
ঘন-কাহ্নি ডাডাং ড্যাং
দিন যদি তার চোখ শুখে নেয়
রাত্রিবেলার মাথায় ব্যাং

চাপোষা ছায়া ধে ধে রে খাল্লা
বুঝে গিয়েছি হে বেসাক ধাল্লা
মাথার ভিতরে উলটে গিয়েছে
তিনচার জোড়া গোল্লার ঠ্যাং

কাটা-কাট-কাট আরে আকাট
এই ডান-কাং এই বা-কাং
দিনহুপুরে যে সবই ডাকাত
জবর গ্যাং

ফুলবেলপাতা ডাডাং ড্যাং
ঘন-কাহ্নি ডাডাং ড্যাং
ছড়িয়ে পড়েছে জবর গ্যাং
‘নাহো রে, শহরে গ্যাঙর-গ্যাঙ !

দুটি পাত ॥ শক্তি চট্টোপাধ্যায়

মেঘ ডাকছে

মেঘ ডাকছে, ডাকুক
আমার কাছেই থাকুক
ভালো থাকবো, সুখে থাকবো — এই বাসনা রাখুক ।
কষ্ট হয়তো একটু হবে, এই তো ছিরির ঘর
আমার কাছে অল্প সময়, বাইরে অন্তঃপুর—
বৃষ্টি ভালো লাগছে যখন, পদ্মপাতায় রাখুক ।

‘ওট্টুকু ভে। মেয়ে
চোট আমার চেয়ে
এতোই যদি লক্ষ্য তাহার, চুহাতে মূখ চাকু
আমার কাছে থাকুক, তবু আমার কাছে থাকুক ॥

ছট্ফটিয়ে উঠলো ভল

ছট্ফটিয়ে উঠলো ভল, হারিয়ে গেলো কেউ
চিরু পড়ে রইলো ঘাটে — অস্তরকম ঢেউ
ভড়িয়ে যেতে চাইলো দূরে, অনেক দূরে দূরে
হাওয়ার মতো সহজ ঘুরে ঘুরে
ভড়িয়ে যেতে চাইলো কিছু অনেক দূরে দূরে ।
কী সেই কিছু ? সেও কি কোনো স্বপ্ন ?
আমার মতো নির্ভর, নির্জন—
ভড়িয়ে যেতে চাইলো কাছে — কিবা দূরে দূরে ॥

কৌতুক না কৌতুহল ॥ তারাপদ রায়

একজন দিঘিজয়ী নৈরাপত্তি
সকাল বেলায় বাথরুমে দাঁড়ি কামাতে গিয়ে
একটা ব্রণ কেটে কেল ভীষণ চিন্তায় পড়েছেন ।

একজন স্বন্দরী সপ্রতিভা
বাথারের পাশে মুচির সামনে উবু হয়ে দাঁড়িয়ে
পায়ের চকলের টেড়া স্ট্যাপ সারাজেন ।

একজন ব্যাডনায়া লেগক
প্রবাসিনী প্রিয়তমাকে একটা চিঠি লিখতে গিয়ে
দশবার কলমের নিবে কালি শুকিয়ে ফেললেন ।

কৌতুক না কৌতুহল,
কোথায় কুণ্ড উ-কার হবে
অনেক ভেবে অবশেষে একজন মহামহোপাধ্যায়
হাত বাড়িয়ে তাকের উপর থেকে অভিধান নামালেন ।

বিলাতী কায়দা ॥ লোকনাথ ভট্টাচার্য

এরকম আকর্ষণ রোহ এক কমই আসে আমাদের বাসভূমির বছরে —

ভাড়া-পড়া সাধা-সাধা বাড়ীগুলোর হঠাৎ জন্মান্তর ঘেন কোন ভূমধ্যসাগরীয়
তীরের নীলের স্বানে, সারি-সারি ফুলস্ব কমলালেবুর গাছের আবাসিত
নিবাসে —

চোখ দিয়েছ দেখতে

হে বিধাতা, যখন এই আমার পোড়া দেশে কিছুই দাও নি আর, যখন যে-
গানের স্বরে-বীধা তানপুরা বেজেই চলেছে, ষড়্জ-গাছারে-পকমে, উদারায়-
মুদারায়-তারায়, তা কখনো পরায় কখনো বজায়

শুধুই মড়াকায়ার তিমিত ঠাঁরির মহিষের আর বাড়ন্ত বয়সের মেয়েদের ।

তাই কিছুতেই হতে পারি না নিজে যা আমি হতে চাই — মঙ্গল দেয়ালে
টাঙানো সেই নিপুণ শিল্পীর আঁকা ছবি, সম্পূর্ণ শান্তি ও হৃদয়ার স্বেচ্ছ মৈত্রীতে,
যাকে দেখতে আসতে পারা যায় জনের-কুঁড়ে-হাতে দূর-দূর খাড়াই-এর পথ
ভেঙে, রিক্ত কোনো ডির গ্রামের গোধূলের ময়রের স্রাবতা হতে —

আমায় ঠেলে বেড়ায় বহু আকাঙ্ক্ষার কত-না দুর্গম জোয়ার, প্রাপিত গন্ধের
কোণে-কোণে নিরুপত্য সিঁড়িহীন চারটি মিনার, এমন-কি ঘরে ধূপ জালানো
নেই বলেই

মধ্যরাত্রেও শুনে হাত দিতে দেয় না শ্রিয় ।

তবু কিছু না দিয়েও যে এই রোহ দাও, তাকে দেখার চোখ দাও, এ-পাড়ার
মুহূর্ত্ত স্বপ্নে এখনো দিল্লি — স্বপ্নেরও অতীত পাহাড়ের সামনে পড়ে আমার
সে-এক কোন্ জন্তর সিংহ, রোমানিকিত অপ্রত্যয় —

তার জন্ত হে বিধাতা, বিলাতী কায়দায় বলতে দাও

ধন্ববাদ, ভোমার ধন্ববাদ ।

তিনটি কবিতা ॥ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

১

ডাঙা ভূমির ওপর কাশের বনে মথুর নিঃশ্বাসের মতো হাওয়া আমি দূর থেকে
দেখতে পারি স্পর্শ করতে পারি না। মাঠের ওপারে উদ্ভলবাড়ির দেওয়ালে
বহুদিন আগে লেগা শহিদুর নাম ওরা মুছতে পারে নি আমি আর ত। মুখে
আনতে পারি না এখন

ডালোবাসা যা শোভা সহস্র আক্রমণে ছুঁড়প হয় না যে সাহস তাকে আঘাত
করতেই আমার অধিকার কাঙালের মতো সংকুচিত পাড়ান।

২

এ এমন একটা পৃথিবী যেখানে সবকিছু হারিয়ে যাচ্ছে তুমি ডালোবেসে যা
লিখেছিলে আমার শপথগুলো ভেঙেচুরে পথের পাশে কোথায় পড়ে রইল
সবকিছু হারিয়ে যাচ্ছে কত প্রাণ তায়। এসব কিছু বদলে দেবে বলে জীবন
বাঁচি ধরেছিল।

চেনা চোখে নগরের দীপ্তি গ্রামে গলে সমস্ত বিদ্যুৎ কোথায় মিলিয়ে গেল
সবকিছু ছাড়তে ছাড়তে আর কিছু রইল না তুমি ছাড়া তোমার ক্রান্তি বিষণ্ণতা
তারই মধ্যে তোমার অনিবার্য অভিব্যক্তি। সবকিছু এই পৃথিবী থেকে হারিয়ে
যাচ্ছে তবু এ পৃথিবী বদলে যাবে এই আকাঙ্ক্ষাকে আমি আত্মও পথের
পাশে নামিয়ে রাখতে পারলাম না সমস্ত ক্ষতির মধ্যে ভোরবেলার সুর এখনও
জনতে পাঠি, তুমি হাত ধরে থাকো।

৩

কাতিকের বেলা শেষ হয়ে এল আহা দেখ দেখ আল্লাহ সেই পথেই চলে
যাচ্ছে এখন থেকে সীত মাঠের সমস্ত আলো যেখানে মান হয়ে আসবে।
দেখানে আগুনের ধারে ভ্রমাপরচ করতে বোসো না কারণ ক্ষতিই বেশি স্মৃতি
যত হাতড়ানে বন্ধনা মাঠ অন্ধকারে ডুবে আছে শতহীন প্রহরকে মনে করা
মিথো।

আলের পথে হারিকেন হাতে যে আসছে সে আমাদের বন্ধুও হতে পারে এসো
প্রস্তুত হয়ে বসি যদিও আনন্দ পাবার ক্ষমতা এখন আর নেই সে অন্তত ভাঙ্ক
উপভোগের মতো এখনও আমাদের কিছু সম্বল আছে শান্তি তৃপ্তি এসবের
মধ্যেই উচ্ছলতার আশ্বাস রয়ে গেছে

অন্ধকার কতক্ষণ নদীর ধারে গা এলিয়ে দিয়েছে বালিতে সারাদিনের চড়ানো
তাপ কিছু তবু আছে, এসো প্রস্তুত থাকি।

দুটি কবিতা ॥ নবনীতা দেব সেন

পুছাঘ

সচ্ছিন্ন গেঞ্জির মতো অবিকল স্বচ্ছন্দে, ছদয়
খুলে ফেলে দিয়ে গেলো 'ভালোবাসা, শপথ, মমতা'—
পরে' নিলো শনিবারে চেতনার ছাট থেকে কেনা
নতুন গামছার মতো রঙের উজ্জল প্রণয়।

ভালোবাসা, ছিলি রাতের উমিমালা
নন্দকর্যাসের উজ্জল উফীষ—
ভালোবাসা, হলি মহন দুঃখছালা
সহমরণের তীব্র শব্দবিষ!

এসো, ভালোবাসা, লোহা চৌক, এ-আগুনে
অশান-অশুচি শরীরকে করো শুক
এসো, ভালোবাসা, হরিণাম স্তনে স্তনে
ধমমিতে আর বিষ মেই অসঙ্গত।

এসো, ভালোবাসা, স্বপ্ন দেবার ক্রান্তি
এইবারে শেষ। এসে গেছে বিশ্রাম—
অচিরেই পাবে স্তব্ধ নৃত্যে শান্তি—
এসো, ভালোবাসা, এইখানে পুণ্যম ॥

স্বত্বের স্বপ্ন

স্বতি আমার চড়ুইপাখি, বেড়ালছানা—
স্বতি আমার পাড়া, আমার বাস্তুভিটে
স্বতি আমার কাজলাদীঘি, শিউলিতলা,
স্বতি আমার চড়কমেলা, দুগ্গাগাতি
স্বতি আমার উঠোন, দালান, ছাদের সিঁড়ি
স্বতি আমার মা-বাপ, আমার চৌদ্দপুরুষ
স্বতি আমার চক্ষু কর্ণ জিহ্বা নাসা
স্বতি আমার হৃৎক ৫ম্র নবগ্রহ
স্বতি আমার কিতাপ্তেজমরুৎসোম্।

দুটি কবিতা ॥ দিবোন্দু পালিত

কোথায় লুকিয়ে রাগো ভয়নাগ

স্মৃতি-সংকুচিত এক ধূর্তের বলয়ে !

ভাবো এই স্মিতভয়ে অস্থিত সম্মুখ পার হওয়া
এক লহমার মৃত্যু, ঘাতকের ছুরি কিনা দীর্ঘ প্রচলন !

চারিদিকে হুঃহ য়েল, ভয়সেহু, বন্ধ পারাশার এক তুচ্ছ শহর ;
খনন করলে বুক পনিভের মতো ওঠে নীল শম্ভুচুড় —

দিক কি ময়মূর্ত ছিল ফুটনের ও খহ আগে !

মাটি সর্বভুক, রেহ

মাটি সর্বভুক, রেহ, বালিকার করতলগত

রক্তের আভার মতো জুড়ে আছে দিকচিহ্নহীন —

আমাকে সে দেবে ব'লে প্রতিদিনই নিয়ে যায় দূরে

যেখানে মৃগোশ খুলে অলীক মৃত্যু; মাতে সেবা, সমবায় ;

ভাঙিত রাসার দূত অশ্রুচর-পরিতৃপ্ত জ্বলে শাপকের পুত্রলিঙ্গ ;

অনেক অনেক দূরে আছে দেশ ক্রামশম্পদমরশোভিত —

ধোয়ার গাধার রঙ দেখানে কি ছড়ায় আকাশে

দুষ্টি দিতে, স্মৃতিও জাগাতে !

আমাকে সে প্রতিদিনই দেবে ব'লে নিয়ে যায় দূরে

গাছের আড়ালে, ঈতে ; যখন সে খোলে করতল

বিবর্ণ অকের থেকে চোপ ভুলে দেখি বালিকার

বিগত জন্মের স্মৃতি আসন্ন সম্মার মেঘে চরে !

স্মৃতির ফাঁকে এই প্রহরে ॥ শান্তিকুমার ঘোষ

গাছের গুঁড়িতে গুঁড়িয়ে বসেছে যেহে,

পাশে তার পুরুষ

নম্র ঘাবে পা ছড়িয়ে দিয়ে ।

কাণ্ড বেয়ে নেমে আসছে বিশ্রাম এবং অবসর :

ফুলস্ন সেগনের গুবক আর কদম্ব ছলছে
ডিঙে হাওয়ায় ।

বৃষ্টির ঠাঁকে এই গ্রহরে
শিশুরা নেমে এসেছে মাঠে
ব্যাট-বল হাতে নিয়ে ।

এখনো ভাগ্যের পরীক্ষা হয় নি
ঝোড়দৌড়ের বাঁধা পথে ;
তবু গাছের সবুজকে আজ হার মানালো
উড়ন্ত টিয়ার ঠাঁক ;

কাঠবিড়ানীর আশা-বাওয়া ছায়ার কোল ঘেঁষে
রামচন্দ্রের স্পর্শ ছড়িয়ে ।

কিন্তু কালোর আক্রোশ বাড়ে সবুজের বিরুদ্ধে ;
কৃচ্ছ্রী কাকেরা বাহ বেঁধে
যেন মাটিতে হেটে এ'গিয়ে আসছে
এদিকেই ॥

নির্বাচন ॥ পার্থসারথি চৌধুরী

একদিন কী কৌশলে অমুরাগবিন্দু করেছিলে,
তারপর এই অবিচ্ছিন্ন অবহেলা ।
দেহ ভরে দিয়েছিলে কটকিত পুলকের অদগড় রেণু,
মনে এক দিগম্বর বৈরাগ্যের বল ।
প্রত্যয়হীন হয়েও সেদিন ভেবেছি
এক ভীষ্ম প্রতিজ্ঞার তপ্ত নালে কপাল পোড়াই,
পিঠে বাঁধি অরাতিবর্ধন ধনুর্বাণ ।
কী কৌশলে তুম্বনের পাগল আগরে
দিয়েছিলে কঙ্কবাক প্রেমাপ্লুত প্রধান কৃমিক ।

সে করুণা আকস্মিক বিহ্বলতা মেলে
দিয়েছিল শীতল উত্তির এক চিহ্নিত শরীরে
জরজর ভোগ আর দখলের শ্বেদাক্ত আহ্বান ।
সেটুকুই তুলে রাগি আবিল শ্রোতের উপরে
হৃদতার সঞ্চিত অমিয় ।

এবার আকৃত হয়ে মিলল না শেষ নির্বাচন।

এ ক্ষণে যদি সত্য পরাধাত পেয়ে থাকি
সেই চিহ্নে ভেঁকে নিও অস্থির আহবে।

রম্য মুগ্ধ অভিশপ্ত অবসর আমি তো। চাই নি প্রহু
চেয়েছি তোমার উত্তাল আড়িনাথ প্রবল প্রচুর সংঘাত,
পুরস্বারে উদার ও তাত্ক্ষণিক প্রণয়মিলন।

বীজ বুনতে দেরি হয়ে যাচ্ছে ॥ ফণিহরণ আগার

ঘরের অগ্নিকোণের দরজাটা এভাবে আড়াল করে পাড়িয়ে থেকো না ভূমি
আমার নিজেকে ভীষণ প্রবাসী মনে হয় সূর্যপাতের বেলায়
তোমার সঙ্গে সমকোণে পাড়াতে গেলেই কলকলতা উৎকর্ষ।
অনধর আলো একটা দপদপ করে তোমার রঙীন নপের ডগায়
অমন তেরছা চোখে ছুঁড়ে মেরো না তোমার

লোকপরম্পরিত আমহণ

আমার বৃকের ভেতর ঘাম ঝরছে হৃৎপিণ্ডের ওপর ঘাম ঝরছে
খুব অমান্বিত ভাষায়

গাণো বেগুনক্ষেতে মাটি কোপায় জগৎ মাকি
কপালের কাছে হৃৎ পাড়িয়ে তোমার নাড়িনক্ষত্র
সব তো আমার জানা

এখন ভূক বাক্যবার সময় নেই কিংবা।
পাত নিয়ে নগ কাটার

দেখছো না বীজ বুনতে দেরি হয়ে যাচ্ছে এ বছর ঘরের দিকে
জ্বিরে আসছে সব অশ্রুকাভর নদী এবং

বৃকপানো ভিথিরি মেঘের দল

এখন ঘরের অগ্নিকোণের দরজাটা আড়াল করে
পাড়িয়ে থেকো না ভূমি

বাকিয়ো না তোমার সন্ধ্যাসকাল ভূক
কালেওয়ারের পাতায় এখন বৃষ্টিকাল যে যার পরিণত সময়
দেখছো না বীজ বুনতে দেরি হয়ে যাচ্ছে

প্রিয় দিনগুলি ॥ কবিরাজ ইসলাম

প্রিয় ব্যক্তিগত দিনগুলি চৌরাস্তা ছেড়ে
স্টেশন রেস্তোরাঁ। ভেঙেছুড়ে
ওরা অজয় পেরিয়ে চলে গেছে
চলো যাই হাত ধরাধরি কের
পকেটে পুরোনো কোঁটে। পুরে ।
চৌরাস্তা ঘুরে যাবে, স্টেশন রেস্তোরাঁ।
আজও মেখে আছে জ্যোৎস্নায় রোকুনে
ওরা তো। অজয় পার হয়ে চলে গেছে
তরিতরকারির ময় কিচেন গার্ডেনে কোনো ছপ নেই
তাই এই ছাড়াছড়ি বোলপুরে বহরমপুরে ॥

একা একা খেলা ॥ কাজল চৌধুরী

অহেতুক ঘুরে লাভ নেই,
কেউ খেন খুন কাছে, কণ্ঠযে তার
স্বপ্নের প্রচণ্ড দাহ, বলে —
অহেতুক ঘুরে লাভ নেই, কোনো লাভ নেই !
তাহলে কোথায় যাব ?
সারারাত্রি জেপে বসে নক্ষত্র আলোক বীথি
স্মৃতি স্মৃতি খেলা, প্রণয়কে
দেহে মেখে একা একা রমণের ছপ — !
নিশ্চিত কৈশোর কিছু বাকি
রেখে যায় ;
হঠাৎ ক্রোধান্ত হুরা সর্বজবে
বিস্তারিত হয় —

চুঁয়ে পড়া জ্যোৎস্নার বিগলিত
স্বপ্নের স্রষ্টারে মুহূঁ করাবাদ করে ।
ভখনই সে কণ্ঠস্বর পূর্ববৎ দাবদাহে বলে, —
অহেতুক ঘুরে লাভ নেই, কোনো লাভ নেই ॥

প্রণাম ॥ স্বতন্ত্র চক্রবর্তী

শুক মাহুষের সামনে বারবার যেতে হয় ; বেলা পড়ে আসে ...
রঙের প্রতিমা থেকে অতি ধীরে মরে যায় হুঙ।
মলিন কাঠের প্রাস্ত দেখা যায় — হিম, কালো। শুক মাহুষের
গোলা বৃক্ক দিনান্তের শুক আলো করে পড়ে।

চারিদিকে অন্ধ, লোল মঙ

ঠাণ্ডা, পর, এঁধো জলে হীর্ণ পায়ে নাচে ; আর শব্দহীন, জ্ঞাত
রূপোলী মাছের ঝাঁক কুরে খায় পদতল ; বর্ণময় ওদের বিশাল
পাতার মুঠ থেকে দ্বিধাদিকে ওড়ে পাতা, পাখির পালক !
সুস্থ মাগরার নিচে আন্দোলিত দাগী উরু ...

অন্ধকারে লাল

কেজুবিন্দু ছুটে আসে। বৃষর সন্নিহ্ন এসে ঐ লাল কেজুবিন্দু থেকে
হাত ধরে নিয়ে যায় পাথরের পরপারে ; ঠাণ্ডা ছায়া ... ধীরে,
শুক মাহুষের কাছে হেঁটে বাই — দিনান্তের শুক আলো তাঁর বৃক্ক।

স্পর্শকাতরতা

আঙুলের প্রাস্ত থেকে শরীরে ছড়িয়ে যায়, মায়াময় শরীরে শরীরে।

ছিন্ন পালকে ॥ ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায়

আনন্দের স্বপ্ন-রেখা
তোমার মলিন মুখচোখে
কতদিন কতদিন পর !
আছড়ে পরে চৈত্রের পাখল
ঘড়হীন সর্বনাশ-লাগা
ছিন্ন পালকে —
অশ্বখের অনতিদীনবীন
শাখে শাখে
বহুরের শুভ কলতান
অবিয়ল কাঁপে।

ক্ষমা করো ॥ শংকর চট্টোপাধ্যায়

বিশ্বাস ও বোধের কাছে আজ সর হয়ে এসেছে বিশ্ব
মাহুয়ের বুকে পাখি ও মাছেরা পেলছে খেলা
তাই মাটি ও আকাশ দিচ্ছে যৌথ হাততালি
এইবার আমার ফিরে যাওয়ার সময়।
উড়ন্ত আধারে চিৎ ও উপড় হতে হতে
আমি ছড়িয়ে পড়ছি চৌদিকে।
আজ আমি আমার সকল প্রিয় কবিদের পায়ে তলায় বসে শুনিছি
রুমর কবিতাবলী।

আমার খণ্ডিত শরীর চুঁইয়ে রক্ত ঝরছে
তবু আশ্রয় কাঁটা তুলতে তুলতে আমি গাইছি বীজ বোনার গান
চোপের ঘলে আঁচমন শেরে আজ আমি প্রতিগ্রাসেই তুলে নিছি নিজেকে।
আজ আমার ফিরে যাওয়ার দিন
সকলের কাছে মাপ চাইছি, বলছি ‘ক্ষমা করো’
তোমরা! তো! আর রূপণ নও, ছ’চার মূঠো খুদকুড়ো ছড়িয়ে দিও
মেথো আমি তাতেই বেঁচে উঠব।

এই স্বাদ এই বিবাদ ॥ রত্নেশ্বর হাজারা

সবুজ ক্যাকটাসে শাদা ফুল ফুটেছে, এখন আমি
জন্মদিনের পায়ের তার শিকড়ে ঢেলে দিয়ে
চলে যাউ—
একদিক বালুকাময়, অত্রদিকে চেনা মাটি
প্রবণ যায় শ্রুতি আহরণে — আমি আমার
উচ্চারণের স্নায়ুগুলো মুক বালকটির কণ্ঠদেশে
ছড়িয়ে দিই—

এই স্বাদ এই বিবাদ — এই আমার হলুদ উত্তরীয়
এই তো দেহলয় গৈরিক

ডাল থেকে উড়ে যায় কচি পাতার অহংকার—
 জীর্ণ পাণ্ডুরঙে জাওয়া রয়েছে, প্রিয় ঋতুসকল
 প্রবাহিত নদীমানার কাছে তোমাদের এখন রেখে যাচ্ছি—

সবুজ ক্যাকটাসে শাদা ফুল ফুটছে — আমি আমার
 সমস্ত দিন কক্ষপথে ছড়িয়ে দিই—
 একদিক নির্জন, অস্তরিকে মেলার ভিড় — ভিড়ের মধ্যে
 কাকের হাতে খুঁজে পাই না শেষ অতুরীয়
 প্রিয় চিকমালা
 দীর্ঘতম ঋতুর কাছে তোমাদের এখন রেখে গেলাম...

আত্মজৈবনিক সনেটকল্প ॥ পবিত্র যুগোপাখ্যায়

বিকল্পে কিছুই নেই, তাই এটী জীবনবচন
 নিবিকার মিশে যাচ্ছি চন্দ্রকে আভ্যাসিক শরীরক্ষেপণে
 উদয়, যৌনতা কিংবা প্রত্যয়ের দায়, মেঘবৃষ্টির নিশ্চিতবোধ
 ক্রমশ শিকড়গুচ্ছে রাগে ধূল নীরেট নিঃশ্বাসে,—তার চাপে
 নাভিমূলে হত্যাকাণ্ড ঘটে যায়, অবৈদ্যায় ধরে প্রজ্ঞাপতি ।
 কেমন বিক্রেতা আমি, ধরে ধরে কোন্ মাংস ফিরি করে কিরি ?
 অনায়াস সফলতা ভেবে সন্ততির হাতে যৌনতার চাবি
 রেখে পৰ্বটনে যাবো — এরকম ইচ্ছা হলো নিশ্চিত প্রহান

বিকল্পে কি আছে, আমি হারিয়ে ফেলেছি তার চূড়ান্ত গম্ভীর, বাবতীয়
 পরিকল্পনার মানচিত্র — পিতৃবেলা তার প্রতিষ্ঠিত স্পষ্ট ছিল ;
 এলোমেলো হাওয়া শুণু পোড়া কাগজের ছাই ওড়ায় আকাশে ;—
 আমি তার গন্ধ চিনি , অভ্যাসভূরন্ত হাতে হত্যা করেছিলাম তোমাকে
 একদিন প্রজ্ঞাপতি ! নৃষি তার দায় — নাকে রক্তগন্ধ লেগে
 বিকল্পে এখন এই কিছু না থাকার শোকে জীবনবহন !

ধর্মের ষাঁড় ॥ শিবশঙ্কু পাল

ছোটগাট একটু ঝঁঝ। বয়ে নিয়ে হাটা চলা করি,
আর কিছু নয়
যাকি সব বিকিয়েছি আকণ্ঠ বেনার
পুত্ৰ্যাপান প্রতিষ্ঠানে, সীমাংক বহুতর দায়ে।
ভারি ভারি গরনাগাটি, কপোর বাসনপত্র, বেনারসী,
সাহেব রাজার

মুগঝাকা টাড়ির টাকা সিঁহরমাথানো
অর্থাৎ সমস্ত মিলে চমৎকার সম্পদ হলিল
'মাছুষ' শব্দের একটা ধারণার বরণ্য সজ্জল মালিকানা।

এগন থাকার মধ্যে ছোটগাট একটু ঝঁঝ, আর কিছু নয়।
বাজারের সামনে, বড় রাস্তায় ডাইনে বায়ে ডবলডেকার
ঠেলাগাড়ি, টেম্পো, ট্যাক্সি প্রতিযোগী কিংবা সহযোগী
পাশাপাশি কিংবা বিপরীত
লক্ষ্যে ছোটো, গেতে বেতে ত্রেক কবে, দেখে
রাজসিক ভঙ্গিমায় উদাস ধর্মের ষাঁড় পথ জুড়ে নিবিচার ব'সে
সারে সারে পাড়িয়ে ঘার পাড়িঘোড়া, বিরক্ত কেরানী।

সে কি জানে, আমি শেষ পূজিটুকু তারই জন্তে ব্যয় করে
একদিন নিঃশেষিত হব ?

বঙ্গীয় বঙ্গালয়

ব্যোমকেশ মুস্তফী

একশত পুনর্মুদ্রণ পরিকল্পনা'র এবার ভাণ্ডা হল নগেন্দ্রনাথ বসু সংকলিত ও প্রকাশিত 'বিষকোষ' (১৯৭ খ্রি. ১৯১২) থেকে 'বঙ্গালয়' শির্ষক গ্রন্থের 'বঙ্গালয় (বঙ্গীয়)' অংশটি (পৃ. ১৭১-১৯০)। অন্তর্ভুক্তির মতো এই রচনাটিও স্বাক্ষরবিহীন। বর্তমান মুদ্রণে দুটি সংগত স্বাধীনতা বৈশিষ্ট্য রয়েছে— রচনাটির নাম বেওয়া হয়েছে 'বঙ্গীয় বঙ্গালয়' এবং লেখকের নাম প্রকাশ করা হয়েছে, ব্যোমকেশ মুস্তফী। কিছু কিছু তথ্যসহ ত্রুটি বা বিতর্কের অবকাশ থাকলেও বঙ্গবঙ্গালয়ের আদিমুখের এই রূপাণা ও মূল্যবান ইতিহাসটি সাধারণভাবে লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল। পরিশেষে প্রাসঙ্গিক আলোচনা দুটি ও সংযোজন শেষের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করা হচ্ছে। —সম্পাদক।

বাঙ্গালায় কিরূপে এবং কোন্ ঘটনাসম্মতে রঙ্গালয়ের অভিনয় ও প্রদর্শন প্রতিষ্ঠা হয় এবং কিরূপেই বা এই কলাবিদ্যা পরিপুষ্ট হইয়া স্বাধীন ভাবে ধারণ করে, তাহার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস নিয়ে লিপিবদ্ধ হইল।

বঙ্গ রঙ্গালয়।

বাঙ্গালীর রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার মূল ইংরাজ। তবে ইংরাজ হাতে কলমে ধরিয়া দিগাই-
য়াছেন এমন নহে।

ইংরাজ জাতি আপনাদের আয়োজ্য প্রমোদের স্তম্ভ ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে এ-
দেশে থিয়েটারের প্রথম সূত্রপাত করেন। তখনকার ইংরাজ রাজপুত্রদেরাই ইহার
অহুষ্ঠা ও অভিনেতা ছিলেন। কবে ইহার প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়, তাহা স্থির করা দুঃসাধ্য,
তবে হিকির বেকল গেজেটে দেখা যায় ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা-থিয়েটার নামে ইহাদের
থিয়েটারের সাত আটবার এককথানি নাটক ও প্রহসন অভিনীত হইয়াছিল। উক্ত
বর্ষের কলিকাতার "জেনারেল এড্‌ভার্টাইজার"^১ নামক পত্র এই সকল অভিনয়ের
বিজ্ঞাপন আছে।

Vol II. No I. 1782 Hickie's Gazette হইতে জানা যায়, ১৭৮২/৪ জাহুয়ারী
পর্যন্ত এই কলিকাতা-থিয়েটার বর্তমান ছিল।

তাহার পর কলিকাতায় ইংরাজের চেষ্টায় পেশাদার থিয়েটারের সৃষ্টি হয়।

অতঃপর বাঙ্গালী ব্যাঙ্গ নাট্যাভিনয়ের সূত্রপাত ঠিক কখন হইয়াছে, নিঃসন্দেহে তাহা
নিরূপণ করা বড় কঠিন। অহুদকালে ১৮১১ সালে 'কলিগ্রাম্মার ব্যাঙ্গ' নামক এক
নাটকের অভিনয়ের কথা কলিকাতা রিভিউ পত্রিকার জ্যোতিষ খণ্ডের (Cal. Review
Vol XIII. 1850) ১৬- পৃষ্ঠা পাঠে অবগত হওয়া যায়। ১৮২১ সালের বাঙ্গালী
সংবাদপত্র "সংবাদ-কোমুদী"র ৮ম সংখ্যায় এই অভিনয়ের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল।
তখনকার ব্যাঙ্গা গাওনা হইতে এই অভিনয়ের নিশ্চয়ই কিছু বিশেষত্ব ছিল, নতুবা ইহার
বিবরণ সংবাদপত্রের পৃষ্ঠে উঠিত না। এই সময়ে কিন্তু কয়েকখানি নাটক লিখিত হইয়া-
ছিল। উক্ত কলিকাতা রিভিউখানিতে সংবাদ কোমুদীর যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে,
তাহাতে আছে যে উহার পঞ্চম সংখ্যায় "নব প্রকাশিত নাটকগুলির সূচি" "(The
evil tendency of the dramas lately invented)" নামক এক প্রবন্ধ প্রকাশিত
হইয়াছিল। এগুলির কোনখানি অভিনীত হইয়াছিল কি না, তাহাও জানা যায় না।

^১ ৩১৫ জাহুয়ারী পেশাদার Comedy of the Deaux Stratagem ও একখানি কাহিনী : ৩১ বঃ
Comedy of Foundling & Like master like man নামক কাহিনী, এবং ৪১১ ও ১১১ই এপ্রিল
School for Scandal অভিনীত হয়। বিখ্যাত বিবরণ Calcutta General Advertiser No I. 29th
January, and No 10. 3rd April 1790. পত্রিকা প্রদত্ত হইয়াছে। এতদ্বিধি উক্ত বর্ষের ১২ই, ১২৫ ও
১১৫ আদষ্ট Tragedy of Mahomet এবং Citizen নামে একখানি কাহিনী অভিনয় হইয়াছিল।

“কলিরাঙ্গার বাত্মা নাটক” নামটি, আর তাহা অভিনীত হইয়াছিল, এই বিষয়গট্টুই ডিঃ বাঙ্গালীর প্রথম নাটক ও নাটক অভিনয়ের আর কোন পরিচয় এখনও পাওয়া যায় নাই। ইহা ১২২৭ সালের ঘটনা।

ইহার পর ১২৩৭ সালের সম্ভবতঃ কোজাগরী লক্ষ্মীপুর্ণিমার দিন বাঙ্গালীর এক নাটক অভিনয়ের বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায়। “হিন্দু পাইওনীয়ার” নামক এক প্রাচীন সংবাদপত্রের ১৮৩৫ সালের অক্টোবর মাসের এক সংখ্যায় উহার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই বিবরণের মধ্যে প্রথমেই আছে — “This private theatre, got up about two years ago, is still supported by Babu Nabin chandra Bose” — অর্থাৎ “এই সপের নাট্যসম্প্রদায় দুই বৎসর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং এখনও নবীনচন্দ্র বসু মহাশয় দ্বারা প্রতিপালিত হইতেছে।” ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে এই নাট্যসম্প্রদায় ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের দুই বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দ বা ১২৩২ সালে প্রথম অভিনয় করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাও নহে। “কলিকাতা মাঞ্চলী কর্ণাল” নামক প্রাচীন মাসিক পত্রে দেখা যায় যে, ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে জাহাঙ্গীরী মাসে ৮শ্রবণকুমার ঠাকুরের চোঠায় ইংরাজীতে উত্তর-রামচরিতের অভিনয় হয়। উহা ১২৩৮ সালের পৌষ মাসের ঘটনা।

যাহা হউক ১২৩৭ সালের কোজাগরী পুর্ণিমায় (১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাস) বঙ্গ অভিনয় প্রথম হয়। এই অভিনয়ে “বিদ্যাহন্দর” অভিনীত হইয়াছিল। শুনা যায় তৎকালে খাজা বিদ্যাহন্দর পালারই বড় আদর ছিল।

কলিকাতার প্রাচীন ইতিহাস অধ্যয়ন করিলে জানা যায় যে এই সময়ে ডোম-টুলীতে ইংরাজদিগের যে নতুন নাট্যশালা স্থাপিত হয়, তাহাতে এট বিদ্যাহন্দর ইংরাজীতে গীত হইবার প্রমাণ পাওয়া যায়, —

“By permission of the Honourable the Governor General, Mr. Lebedeff's New Theatre in Doornulla (ডোমটুলী-ডোমগোড়ার), decorated in the Bengali style, will be opened very shortly with a play called 'The Disguise.' ***The words of the much admired poet Shree Bharat Chandra Ray are set to music.”—

অর্থাৎ “গবর্নর জেনারেলের আদেশ অনুসারে মিটার লেবেডেফের ডোমটুলী নতুন নাট্যশালায় ‘ছদ্মবেশী’ নামক নতুন ইংরাজী নাটক শীঘ্রই খোলা হইবে। ***এত আদৃত কবি ভারতচন্দ্রের কবিতা দ্বারা বীধা হইয়াছে।” ইহা যে বিদ্যাহন্দর — অধ্যয়ন করিলে, তাহা প্রমাণ ডিঃও বুঝা যায়। তাহা সম্ভবতঃ Ballad হিসাবে গীত হইয়াছিল। টপা ১৭২৫ খৃষ্টাব্দের কথা।

নবীনদাসু সেই লোক-প্রিয় বিষয়টাই নাটকরূপে অভিনয় করাইয়াছিলেন। শুনা গিয়াছে, তখন বঙ্গ নামক এক ব্যক্তির বাড়ীতে বিদ্যাহন্দর দ্বারা প্রথম পাওয়া হয়। এই “তত্ত্ব” জাতিতে বঙ্গ নহেন। তখনবাবু ভবলোক ধনী বাঙ্গালী ছিলেন, কোন বঙ্গ

সংগঠনের অধীনে কর্ম করিতেন বলিয়া তাঁহাকেও সকলে “মগ” উপনামে অভিহিত করিয়াছিল। তহু অবস্থ “রামতহু”র সংক্ষিপ্ত আকার। এই তহু মগের পুত্রই বিজ্ঞানস্বামী-বাজার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই বিজ্ঞানস্বামীর যাত্রার দল স্বপ্রসিক্ত গোপাল উড়ের দলের পৃষ্ঠপোষকী কিসা অভিন্ন তাহা জানা যায় না। কেহ কেহ বলেন, পাণ্ডুরিয়াঘাটার ৩৭বীরশিংহ মন্দির মহাশয়ই গোপালের দলের প্রতিষ্ঠাতা। বাহা হউক উক্ত বিজ্ঞানস্বামীর যাত্রা হইতেই নবীন বাবুর নাট্যাভিনয়-প্রবৃত্তি উদ্বেষিত হইয়াছিল। জাম-বাজারে এখন (১৩১১ সাল) যেখানে ট্রামওয়ে আস্তাবল (অর্থাৎ রক্তরাম বস্তুর গলির মোড়) সেইখানে ৩৭বীনবাবুর স্বহৃৎ অট্টালিকা ছিল। এই অট্টালিকায় সেই অভিনয় হয়। এই অভিনয়ে প্রথমে চিত্রিত নাট্যাশালার ব্যবস্থা হয় নাই। নাট্যকোষ্ঠ দৃশ্যবলী বাটার নানাখানে প্রকৃত সাজসজ্জাদি দ্বারা সাজান হইয়াছিল। এক ঘর হইতে অল্প ঘরের মধ্যে দৃষ্টিকা খনন করিয়া হৃৎকর করা হইয়াছিল। বকুলতলার পুকুরিণীর দৃশ্য প্রকৃত প্রস্তাবে অট্টালিকাসংলগ্ন উজানের পুকুরিণীতীরে সজ্জিত হইয়াছিল। বীরশিংহের দরবার স্বহৃৎ বৈঠকখানায় সাজান হইয়াছিল। অট্টালিকা সংলগ্ন উজানের এক পাশে মালিনীর কুটার ও মালিক গুহান হইয়াছিল। একস্থানে এক দৃশ্যের অভিনয় দেখিয়া, অল্প দৃশ্য দর্শনের জন্য যেখানে সেই দৃশ্য সাজান হইয়াছে, দর্শকগণকে সেইখানে উঠিয়া যাইতে হইত। প্রথম অভিনয়ে এইরূপে ছুটাছুটি করিয়া অভিনয় দেখিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই অভিনয়ে স্বীচরিত্রের অংশ স্থানোকেই অভিনয় করিয়াছিল। এখনকার জায় তখনও বারনারী ঘরটি স্বীচরিত্র অভিনীত হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, ইহা প্রথম অভিনয়ে হয় নাই, পরবর্তী অভিনয়ে হইয়াছিল। নবীনবাবুর দৌধিত্রেরা বলেন, প্রথম হইতেই স্বী-অভিনেত্রী ছিল। হিন্দু পাইওনীয়ারে ১৮৩৫ পুটালের অক্টোবর মাসে এই থিয়েটারের বিবরণ প্রকাশিত হয়, তাহাতে স্বী-অভিনেত্রীর কথা স্পষ্ট বিবৃত আছে। ১৮৩৫ সালের এই অভিনয়, রাত্রি ১২টার সময় আরম্ভ হইয়া পরদিন প্রাতে ৬টা পর্যন্ত চলিয়াছিল। দর্শকের মধ্যে হিন্দু মুসলমান সাহেব ফিরিকী সকলেই উপস্থিত ছিলেন। সম্রাট ও গণ্যমান্য দর্শকের সংখ্যাই অধিক ছিল। শুনা যায়, প্রথম অভিনয় আরম্ভ অবধি শেষ পর্যন্ত ২ দিন সময় লাগিয়াছিল। ১৮৩৫ পুটালের অভিনয়ের বিবরণে দেশীয় মন্ত্রের একতান-বাদনের পরিচয় পাওয়া যায়। সেতার, সারঙ্গ, পাখোয়াজ, বেহালা প্রভৃতি বঙ্গ বাজিয়াছিল। বাদকগণের অধিকাংশ ব্রাহ্মণ। ব্রজনাথ গোস্বামী নামে বেহালাবাদক খুব ভাল বাজাইয়াছিলেন। একটা পরমেশশক্তি গীত হইয়া অভিনয় আরম্ভ হইল। এই অভিনয়ে চিত্রিত রক্তমক ব্যবহৃত হইয়াছিল। এই অভিনয়ের অভিনেতৃবৃন্দের নাম বাহা জানিতে পারা গিয়াছে, তাহা এই,—

স্বন্দর — জামচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (বরাহনগর নিবাসী), বিজ্ঞা — রাধামণি (মণি নামে পরিচিত), রাণী — অন্নভূগা, মালিনী — ঐ, সহচরী — রাজকুমারী (রাজু নামে পরিচিত)।

হিন্দু পাইওনীয়ার^১ বলেন, স্ট্রীচারিওগুলির 'ও রাজা বীরসিং'হের অভিনয় সর্বাঙ্গিক মনোহর ও সুন্দরতম হইয়াছিল। স্ক্রুনের অভিনয় এই সম্পাদকের নিকট সুন্দরতম বলিয়া বোধ হয় নাই। মনোভাব পরিবর্তন-কৌশল, বাগ্‌ডক্সী ও অস্ত্রভঙ্গী অকৃত্রিম হয় নাই।

শ্রদ্ধা যায় এই অভিনয়ের বায় নির্দোষার্থ নবীনবাবুকে চুই লক্ষাদিক টাকা ব্যয় করিতে হইয়াছিল। এক্ষণে তাঁহাকে তাহার পাতাবাড়ী নামক ইংরাজটোলার এক বাড়ী বিক্রয় করিতে হইয়াছিল। এমন যে বাড়ীতে Military Accounts আছে, উগাই সে কালের পাতাবাড়ী। যাহা হউক প্রথমে রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ে নানাহানে দৃষ্ট সাক্ষ্যইয়া অভিনয় করিবার ব্যবস্থা উদ্ভাবন করায় নবীনবাবুর বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার পর অভিনয়ের সহিত রঙ্গমঞ্চের সংযোগ বোধ হয় ৬প্রসন্নকুমার ঠাকুরের উত্তর-রামচরিতের রঙ্গমঞ্চ দেখিয়াই করা হইয়াছিল।

একটা আশ্চর্য্যের বিষয় এই — নাট্যাভিনয়ের এই প্রথম চেষ্টাতেই বিদ্যাসুন্দরের অন্নীনতা, অন্নীন দিয়া অভিনয়ার্থ নির্দোষ, — বাঙ্গালায় নিখিত নাটকের অভিনয়ে বিরক্তি এবং বেস্তা অভিনেত্রীর সংস্রব প্রভৃতি নানা কথা লইয়া সংবাদপত্রে নিপুল আলোচন চলিয়াছিল।

যাহা হউক এই নাট্যসম্প্রদায় মধ্যে মধ্যে অভিনয় করিয়া চারিবৎসরকাল বর্তমান ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

ইহার পর যদিও বাঙ্গালায় অভিনয় হয় নাই, তথাপি বাঙ্গালীদ্বারা অভিনীত হইয়াছিল বলিয়া এহলে ৬প্রসন্নকুমার ঠাকুরের অঙ্কুরিত উত্তর-রামচরিতের অভিনয়ের কথা বিবৃত হইতেছে। Hindu Reformer নামক সংবাদপত্রের ১৮৩২ সালের জ্যৈষ্ঠয়ারী মাসের এক সংখ্যায় এই নাট্যসম্প্রদায়ের প্রথম অভিনয়ের বিবরণ পাওয়া যায়। তাঁঁড়ের বাগানে ইহার অভিনয় হইয়াছিল। সংস্কৃত কলেজের তখনকার অধ্যক্ষ ডাক্তার হোরেন হেমেন উইলসন্ সাহেব উত্তর-রামচরিতের যে ইংরাজী অনুবাদ করেন, সেই অনুবাদ অভিনীত হইয়াছিল। একজন ইংরাজ এই দল গঠনে ও শিক্ষিত করণে বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করেন।

এক দুপবারে এই অভিনয় হয়। অভিনয়ের পূর্বে নাট্যসম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে এক ন্যাকি উদ্দেশ্যাদি বিবৃত করিয়া বক্তৃতা করেন। এই অভিনয়ে কে কাহার অংশ অভিনয় করেন, তাহা জানিতে পারা যায় নাই। উত্তর-রামচরিতের অভিনয় শেষ হইলে এই সম্প্রদায়ই জুলিয়াস সীজরের ৪ম অঙ্ক অভিনয় করেন। এষ্ট দলে মার্চ মাসে একখানি স্ট্রীতিনাটোর দৃষ্টকাব্য অভিনীত হয়। ইতিয়া গেজেটে একজন সাহেব দর্শক তাহার প্রশংসা করিয়া পত্র লেখেন। জাফর-গুল-নেহারের বিবরণ সেই কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়। নাটকখানির নাম কি ছিল জানা যায় নাই। ৬প্রসন্নকুমার ঠাকুরের এই নাট্যসম্প্রদায় কতদিন চলিয়াছিল, তাহার খবর করা যায় নাই।

ইহার পর ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে হিন্দুকলেজের ছাত্রবৃন্দ কর্তৃক গভর্নেন্ট "হোয়া-

ইট হাউসে" নানা পুস্তকের বক্তৃতা ও অভিনয় হইয়াছিল। গভর্ণর জেনারেল লর্ড অকলও, লর্ড বিশপ, মাননীয় ইডেন প্রভৃতি ইহার উৎসাহদাতা ছিলেন। এই সঞ্চল ঠিক নাটকাভিনয় নহে, এই সম্প্রদায়ের কয়েকটি অভিনয়ের বিবরণ নিয়ে দেখা হইল,—

পুস্তক	পাত্র	অভিনেতা
1. The King and the Miller	King Miller	গোবিন্দচন্দ্র দত্ত নরোত্তম দাস
2. Soldier's dream	Soldier (ইনিই পরে রায় শশিচন্দ্র দত্ত বাহাদুর হন)	শশিচন্দ্র দত্ত
3 Topsy Tossopot		গোপালনাথ মুখোপাধ্যায়
4. Shakespeare's Seven Ages		অবতারচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
5. Lodgings for Single Agent		প্রতাপচন্দ্র ঘোষ
6. Merchant of Venice	Salerio [?] Duke Shylock Portia Bassanio Nerissa Gratiano [?] Nellygra Antonio	গোপালনাথ মুখোপাধ্যায় রাজেন্দ্রনাথ সেন উমাচরণ মিত্র অভয়চরণ বসু রাজেন্দ্রনারায়ণ বসু রাজেন্দ্রনারায়ণ মিত্র রাজেন্দ্রনারায়ণ দত্ত গোবিন্দচন্দ্র দত্ত কালীরক্ষা ঘোষ
7 The Dramatic Aspirant	Patent Dowles	গোপালকৃষ্ণ দত্ত গিরীশচন্দ্র ঘোষ

হিন্দু কলেজের ছাত্রদিগের এই ইংরাজী অভিনয় চেষ্টা কালক্রমে অল্পত্র সংক্রামিত হইয়াছিল। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে লর্ড অকলও "ওরিএন্টাল সেমিনারী" পরিদর্শন করিতে আসেন, এই সময় হারমান জেক্স নামে একজন ফরাসী প্রধানশিক্ষক ছিলেন। ইহার একজন বন্ধু রিশি নামক জনৈক ফরাসীও এই সময়ে কলিকাতায় উপস্থিত ছিলেন। জেক্স ও রিশি উভয়ে মিলিয়া ওরিএন্টালের ছাত্রগণ দ্বারা "জুলিয়াস সীজার" অভিনয় করিবার সংকল্প করেন। ইহার ব্যয় দেড় হাজার টাকা পড়িবে রিশি এইরূপ দ্বির করেন। অর্থাভাবে এ অমুষ্ঠান কার্যে পরিণত হয় নাই। কয়েকদিন শিক্ষাদানাদি মাত্র হইয়াছিল। ইহা ১২৪৭ সালের কথা বলিতে হইবে।

তাহার পর বার বৎসর পর্যন্ত বাঙ্গালীর মধ্যে কি ইংরাজী, কি বাঙ্গালা কোনরূপ অভিনয়ের কথাই শুনা যায় না। ১২৪৯ সালে অর্থাৎ ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে বটভায়া "মেট্রপলি-

টন একাডেমী" নামক দলের বাড়ীতে "জুলিয়াস সীজার" নাটকের অভিনয় হয়। এখনও বাধাবটলার পার্শ্বে যে বৃহৎ বাড়ী বর্তমান আছে, সেই বাড়ীতে এই অভিনয়ের অস্থলান হইয়াছিল। পূর্বে এই বাড়ীতে ওরিয়েন্টাল সেমিনারী ছিল। তাহার পর হাটখোলার দত্তবংশীয় গুরুচরণ দত্ত মহাশয় এই বাড়ীতে মেট্রপলিটন একাডেমী নামে আর একটি দল প্রতিষ্ঠা করেন। এই বৃহৎ দলবাগীতে অভিনয়ের স্থান স্থির হওয়াতে বাক্য যাইতেছে যে, দলের প্রতিষ্ঠাতা গুরুচরণদাদুও এই নাট্যাভিনয়ের একজন পূর্ণশোধক ছিলেন। শুনা যায়, ওরিয়েন্টাল সেমিনারীর কৃতপূর্ণ ছাত্রগণ এই অভিনয়ে অভিনেতা ছিলেন। অল্পমান হয়, রিশি ও ব্রহ্মণ্যের উদ্যোগে দ্বাদশ বৎসর পূর্বে যে সকল ছাত্র জুলিয়াস সীজার অভিনয় করিতে উদ্যোগী হইয়াছিল, এক্ষণে তাহাদেরই অনেকে সেই অতৃপ্ত বাসনার তৃপ্তিলাভনার্থ এই অস্থলানে যোগ দিয়াছিলেন। কে অস্থলাতা, কাহার বায়ে অস্থলান সম্পূর্ণ হয় এবং কে কে অভিনয় করিয়াছিলেন, তাহার কিছুই জানা যায় না। তবে সী-সুচি নামক ইংরাজনিগের থিয়েটারের তনৈক অভিনেতা স্কিমার নামে এক সাহেব বহু বয়, চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়া এই নাট্যসম্প্রদায়কে শিক্ষিত করেন। এই অভিনয়ে একটি বিশেষ ঘটনা হইয়াছিল,— দর্শকের তত্ত্ব টিকিট বিক্রীত হইয়াছিল। টিকিটের দ্বারা কত এবং কত টাকা বিক্রয় হইয়াছিল তাহা জানিতে পারা যায় না। অর্থ লভ্য বাঙ্গালী এই প্রথম অভিনয় করেন।

বটলার "জুলিয়াস সীজার" অভিনয়ের পর বৎসর বারাগসী ঘোষের স্কীটে প্যারীমোহন বহুর বাড়ীতে জুলিয়াস সীজার অভিনয় হয়। এই প্যারীমোহন বহু প্রথম নাট্যাভিনয়কারী অনবীচন্দ্র বহুর ভাতৃপুত্র এবং পশ্চিমাংশ সিংহের বংশীয় কোন কন্ডার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্যারীমোহনের পুত্রগণের চেষ্টায় এই অভিনয়ের স্থাপত্য হয়, বটলার অভিনেতৃবর্গের অনেকে এই অস্থলানে যোগ দেন। এই অভিনয়েও টিকিট বিক্রীত হইয়াছিল। একাদিক রাত্রি এই সম্প্রদায়ের অভিনয় হয়। এখানকার ব্যয় প্যারীবাবুর পুত্রেরাই বহন করেন। অভিনেতৃবর্গের মধ্যে একমাত্র ত্রজনাথ বহুর নাম আমরা জানিতে পারিয়াছি। ইহার পুত্রই আজকালকার সুবিখ্যাত অভিনেতা মহেন্দ্রলাল বহু।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত পাঠে জানা যায় যে, যখন প্যারী বহুর বাড়ীতে জুলিয়াস সীজারের অভিনয়ের উদ্যোগ চলিতেছিল, ঐ সময় ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতেও তখনকার শিক্ষকদিগের দ্বারা ওথেলো অভিনয়ের উদ্যোগ হইতেছিল। ওরিয়েন্টালের কৃতপূর্ণ ছাত্রেরাই এই উদ্যোগ করেন। দীননাথ গোস্বামী, প্রিয়নাথ দত্ত, রাধাপ্রসাদ বসাক, সীতারাম দে, ত্রজনাথ বহু ও কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি ব্যক্তিই ইহার অস্থলাতা ও অভিনেতা। বটলার জুলিয়াস সীজারের শিক্ষক মি: স্কিমার এবং মি: রবার্টস্ ও মি: পার্কার এই সম্প্রদায়ের শিক্ষকতা করেন। মি: স্কিমারের ক্রায় মি: রবার্টস্ সী-সুচি থিয়েটারে ও মি: পার্কার চৌরঙ্গী থিয়েটারে ছিলেন। এই সম্প্রদায় প্রায় দুই বৎসরকাল চলিয়াছিল। ওথেলো, মার্চেন্ট অক্‌ভিনিজ, হেমরি দি কোর্থ ও এমিটিওর্গ নামক চারি-

খানি পুস্তকের অভিনয় হইয়াছিল। এই সম্প্রদায় “ওরিয়েন্টাল থিয়েটার” নামে অভিহিত হইত। নিম্নে ইহার বিবরণ দেওয়া হইতেছে,—

পুস্তক	তারিখ	অভিনেতা
ওথেলো (১ম)	১২৬০/১১ আশ্বিন	ওথেলো—দীননাথ বোম
	১৮৫৩/২২ সেপ্টেম্বর	আয়্যাগো—প্রিয়নাথ দত্ত
(২য়)	১২৬০/২০ আশ্বিন	ত্রাবানশিও—থগেজনাথ মল্লিক
	১৮৫৩/৫ অক্টোবর	ডেসডিমোন—রাধাপ্রসাদ মিশ্র
মার্চেন্ট অফ্‌ ভিনিস (১ম)	১২৬২/২০ ফাল্গুন	এমিলিয়া—রাধাপ্রসাদ বসাক
	১৮৫৪/২ মার্চ	শাইলক—প্রিয়নাথ দত্ত
	(২য়)	পোশিয়া—রাধাপ্রসাদ বসাক
	১২৬০/৫ চৈত্র	
হেনরি দি কোথ	১৮৫৪/১৮ মার্চ	
	১২৬১/৪ঠা ফাল্গুন	হেনরি—কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
	১৮৫৫/১৫ ফেব্রুয়ারী	ফলষ্টাক—প্রিয়নাথ দত্ত
এমেটিওস	হট্‌স্পার—নিতালাল দে	
	১২৬১/৪ঠা ফাল্গুন	মেজর ক্রস—কেশবচন্দ্র
	১৮৫৫/১৫ ফেব্রুয়ারী	গঙ্গোপাধ্যায়

ওথেলোর দ্বিতীয় অভিনয়ে লর্ড ডানহোস্টার নাম এই থিয়েটারের পৃষ্ঠপোষকরূপে গৃহীত হইয়াছিল।

এই সম্প্রদায়ের অধিকাংশ অভিনেতাই উত্তরকালে বাঙ্গালা নাট্যাভিনয়ের প্রধান উল্লেখ্য ও অভিনেতা হইয়াছিলেন। ক্ষেত্রম ও রিশি নাট্যামোদের নীচ বাহাদুরের রূপে বর্ণন করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা উপযুক্তক্বে পতিত হওয়ায় কলে ফলফুলে অশোভিত হইয়া উঠিয়াছিল।

ইহার পরই বাঙ্গালায় অভিনয়ের সূত্রপাত হইল। কলিরামার দ্বারা নাটক ও বিজ্ঞা-অঙ্গের কথা ছাড়িয়া দিলে ১২৬৩ সালেই বাঙ্গালা অভিনয়ের প্রকৃত আরম্ভ বলিতে হয়, কারণ ইহার পর হইতেই নানাস্থানে বাঙ্গালা নাটকের অভিনয়-প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিয়াছিল। পাথুরিয়াঘাটার নিকট চড়কডাঙ্গার জয়রাম বসাকের বাড়ীতে ১২৬৩ সালে (১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে) বাঙ্গালা অভিনয়ের অর্জুণ হয়। এই সময় পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্নের লিখিত “কুলীন-কুলসর্গর্ষ” (১৮৫৪ খৃঃ) প্রথম প্রচারিত হয়। এই অভিনয়ে ওরিয়েন্টাল থিয়েটারের অভিনেতা রাধাপ্রসাদ বসাক যোগ দিয়াছিলেন। এখানে কে কি অংশ লইয়া অভিনয় করেন, তাহা জানা যায় নাই; তবে কয়েকজন অভিনেতার নাম প্রসঙ্গ হইল,—রাধাপ্রসাদ বসাক, জয়রাম বসাক, জগদ্বল্লভ বসাক, নারায়ণচন্দ্র বসাক, রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় (ইনি স্রী-

চরিত্র অভিনয় করেন)। শেখোক্ত ব্যক্তিই উত্তরকালের বেঙ্গল থিয়েটারের অপ্রতিষ্ঠা অধ্যক্ষ বিহারীবাবু। ইহারের মধ্যে অনেকেই উত্তরকালে অতি উৎকৃষ্ট অভিনেতা হইয়াছিলেন। উক্ত কুলীন-কুলসর্গের দুটবার অভিনয় হয়।

ইহার সমকালেই কলিকাতায় ও মকঃখলের কয়েকখানে বাঙ্গালা নাট্য অভিনয়ের চেষ্টা ও উত্তোাগ চলিতে থাকে। এরিএটাল থিয়েটারের একজন অভিনেতা রাধাপ্রসাদবাবু জয়রাম বসাক প্রধান উত্তোাগী হন। অপর অভিনেতা প্রিয়নাথ দত্ত তাহার নিজ মাতুলালয়ে ও (গদাধর শেঠের বাড়িতে) এই কুলীন-কুলসর্গের অভিনয়ের অহুষ্ঠান করেন। ১২৪৪ সালে প্রথমে (১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে) এই সম্প্রদায়ের অভিনয় হয়। গদাধর শেঠের পুত্র গোপালচন্দ্র শেঠ (প্রিয়নাথের মাতুল) ইহার পৃষ্ঠপোষক। এই সম্প্রদায়ে প্রিয়নাথ দত্ত, গোপালচন্দ্র শেঠ, নহুড়চন্দ্র শেঠ, নারায়ণচন্দ্র বসাক প্রভৃতি অভিনেতা ছিলেন। নারায়ণবাবু এই দলে ভারুণী ও রসিকা নাপিতানীর কৃমিকা অভিনয় করেন।

এই সময়েই অর্থাৎ জয়রাম বসাকের বাড়ীর অভিনয়ের সময়েই শিমলায় ছাত্তুবাবুর বাড়িতে বাঙ্গালায় শকুন্তলা অভিনয়ের অহুষ্ঠান হইয়াছিল। এই অভিনয়ে প্রথমাবধ বহুমুখিক, শরচ্চন্দ্র বোষ, মণিমোহন সরকার প্রভৃতি অভিনেতা ছিলেন। শকুন্তলার এই প্রথম বঙ্গাবস্থান হয়। বেদিন জয়রাম বসাকের বাটীর অভিনয় হয়, তাহার পরদিনই ছাত্তুবাবুর বাটীতে শকুন্তলার অভিনয় হয়। এই অভিনয়ে সকল অভিনেতাই বর্ণোপ-যুক্ত মূল্যবান পরিচ্ছদ ব্যবহার করিয়াছিলেন।

এই সময়েই চুর্চুড়ায় কুলীন-কুলসর্গের অভিনয় হইয়াছিল।

বাঙ্গালা নাট্য অভিনয়ের এই এক যুগ। এ সময়ে যেখানে যত চেষ্টা হইয়াছে, সর্কজ কুলীন-কুলসর্গের ও শকুন্তলা ভিন্ন অন্য নাটকের অভিনয় হয় নাই।

এই সময়েই ৮কেশবচন্দ্র সেনের বাড়ীতে খোরীতা গ্রামে ইংরাজীতে হামলেট অভিনয় হয়। এই অভিনয়ে কেশবচন্দ্র—হামলেট, শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার—লিয়ার্টেস, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মজুমদার—হোরেশিও, মহেন্দ্রনাথ সেন—রাজা, ভোলানাথ চক্রবর্তী—পলোনিয়স, বোণেন্দ্রনাথ সেন—বার্নার্ডো, নন্দলাল দাস—রাগী, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন (মিরর সম্পাদক)—অকিলিয়াস অংশ লইয়াছিলেন। ইহার পর বাঙ্গালীঘারা ইংরাজী অভিনয়ের উৎসাহ আর প্রবল ছিল না।

এই সময়েই ১২৬০ সালের চৈত্র মাস (১৮৪৭ খ্রিঃ) ৮কালীপ্রসন্ন সিংহের ঘরে তাহারই বাড়ীতে বৌদীসংহারের বাঙ্গালা অহুষ্ঠান অভিনীত হয়। ৮কালীপ্রসন্ন সিংহ, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (মিঃ ভল্লিউ. সি. বানার্জি) বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি এই সম্প্রদায়ের অভিনেতা ছিলেন। বিহারীবাবু স্বীচরিত্র অভিনয় করিয়াছিলেন। ইহার আট মাস পরে ১২৬৪ অগ্রহায়ণে (১৮৪৭ নবেম্বরে) এই স্থানের বিক্রমোর্কশীর অহুষ্ঠান অভিনীত হয়। এই অহুষ্ঠান কালীপ্রসন্ন সিংহ পণ্ডিত সাহায্যে নিজে করেন। কালীপ্রসন্নবাবুই পুরুষবা সাজিয়াছিলেন। এই অভিনয়ের কথা ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের

কলিকাতা রিভিউ পত্রের উল্লিখিত আছে। এই সময় নড়াইল হাটবাড়িয়ার ৮গুরুদাস রায় মহাশয়ের বাড়ীতেও তাহার বড় বৈঠকখানায় রক্তমক প্রস্তুত করিয়া অভিনয়ের আয়োজন চলিতেছিল। গুরুদাসবাবুর পুত্র ৮গোবিন্দচন্দ্র রায় মহাশয় তাহার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন।

ছাত্রাবুর বাড়ী যখন শহুস্তলার অভিনয় হয়, তাহার পরেই কাপ্তেন পামার ওরিএন্টাল সেমিনারীর প্রধান শিক্ষক মিঃ ডি. এল. রিচার্ডসন, রসিকলাল সরকার প্রভৃতি অনেক গণ্যমান্ত ব্যক্তি ওরিএন্টাল সেমিনারীতে সেক্স্পীয়ারের নাটকাবলী অভিনয় আরম্ভ করেন।

ওরিএন্টাল থিয়েটারের ১ম বারের অভিনয়াদি দেখিয়া কালীপ্রসন্ন সিংহ ও রাজা প্রতাপচন্দ্রাদির মনে থিয়েটার করিবার ইচ্ছা হয়। কাদম্বরীর অভিনয়ের সময়ে ছাত্রাবুর মৃত্যু হইয়াছিল। “মহাশ্বেতা” নামে কাদম্বরী অভিনীত হয়।

রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের একখানি পত্র হইতে জানা যায় — ওরিএন্টাল থিয়েটারের অধ্যক্ষ-গণের সহিত শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, প্রিয়নাথ দত্ত প্রভৃতির মনোমালিন্য ঘটিলে রাজা ঈশ্বরচন্দ্র, রাজা প্রতাপচন্দ্র প্রভৃতি বাঙ্গালী নাটক অভিনয়ের প্রস্তাব করেন। তাহারাই আগ্রহ করিয়া শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে স্থান নির্বাচন করিতে বলেন। কোনও ভ্রমলোকের বাড়ী চাহিয়া লইয়া বা ভাড়া করিয়া কার্য্যারম্ভের কথাও হইয়াছিল। ইহার পর দুই কি আড়াই বৎসর পর্য্যন্ত উহার আর কোনও উল্লেখও ছিল না। শেষে যখন কতকগুলি বৃদ্ধিকে একপানি বাঙ্গালী নাটকের আগড়াই দিতে স্তন্যপেল (সম্ভবতঃ জয়রাম বসাকের বাড়ীর “কুলীন-কুলদর্পক”) তখন ইহার পরামর্শ করিয়া সংস্কৃত “রত্নাবলী” নির্বাচন করিয়া, রামনারায়ণ তর্করত্ন দ্বারা উহার অঙ্কবাদের ব্যবস্থা করিলেন। চারি মাসের পর পণ্ডিতের অঙ্কবাদ শেষ হয়, পরে সংশোধন করিতেও আর একমাস যায়। সংশোধনের সময়ে অনেক পরিবর্তন করা হয়। অতঃপর টগা ছাপাইতেও তিনমাস বিলম্ব ঘটে। তাহার পরেও স্ট্রীচরিজের অভিনেতা নির্বাচনেও যথেষ্ট বিলম্ব হইয়াছিল। ইহার পর আগড়াই দিতেও অজ্ঞাত সম্ভ্রদায় অপেক্ষা অনেক বেলা সময় গিয়াছিল। যাহা হউক ১২৬৫ সালের ১৬ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার (১৮৭৮/৩১ জুলাই) বেলাগেহিয়ায় ষারকানাথ ঠাকুরের বাগানে রত্নাবলীর প্রথম অভিনয় হয়। রত্নাবলীতে ওরিএন্টাল থিয়েটারের কতিপয় অভিনেতা যোগদান করিয়াছিলেন। শিক্ষা দিবস ভার শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের উপর হস্ত ছিল। এই অভিনয়ে তাহারাই যে যে অংশ লইয়া অভিনয় করেন, নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া হইল,—

রাজা উদয়ন	প্রিয়নাথ দত্ত
বসন্তক	কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
জমদগ্ন	রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ
ধৌগন্ধরায়ণ	গৌরদাস বসাক, দীননাথ ঘোষ, ভাটগাঁও গুহ
ব্রাহ্মণ	নবীনচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

বাহুস্থিতি	গিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
বাসবদত্তা	মহেন্দ্রনাথ গোস্বামী, চুনিলাল বসু
রত্নাবলী	চৈতন্যচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
কাকনমাল	(শ্রীরামপুরনিবাসী এক ব্রাহ্মণ)
দুঃসদৃশতা	অখোরচন্দ্র দীপড়িয়া
বাক্তরিকর	ত্রিনাথ সেন
সারবান	যদুনাথ ঘোষ
স্বত্বদার	কেদারমোহন গোস্বামী
চোপদার	(১ম) সারকান্যাস মল্লিক (২য়) কৃষ্ণগোপাল ঘোষ
নটী	রমানাথ লাহা
নর্তকী	১ কালিদাস সান্যাল ২ কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

রত্নাবলীর ছয়টি অভিনয় হয়। শেষ অভিনয় ২৪ কাত্তিক (১৯শে অক্টোবর) শনিবারে হয়। এই অভিনয়েই ঐকতান-বাদনের প্রথম প্রদর্শনা হয়। শ্রীকৃত (এখন মহারাজ) বতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের যত্নে সঙ্গীতাধ্যাপক কেকদারমোহন গোস্বামী দ্বারা দেশীয় বহাদি লইয়া এই বাস্তবসম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল। রাত্তাঙ্গিণের বায়ে সাতসকল ও রত্নময়ক অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। ধর্মীর সাধায়া পাইয়া এবং উত্তরোত্তর অগ্রগতিতে কতি যাক্তিত হওয়ায় এই নাট্যসম্প্রদায় সাধারণের বিশেষ তৃপ্তিসাধন করিয়াছিলেন। বেলগেছিয়ায় এই নাট্যশালা ও নাট্যসম্প্রদায় অনেকদিন বর্তমান ছিল। রত্নাবলীর অভিনয় দর্শনে সঙ্গীক ছোটলাট হালিডে, ঈশ্বরচন্দ্র বিজ্ঞানাগর, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রমাপ্রসাদ রায় প্রভৃতি উপস্থিত থাকিতেন। মাইকেল যুবস্বয়ন দত্তও এই অভিনয় দর্শন করেন। কেশববাবুর বন্ধু বলিয়া তিনি রাত্তাঙ্গিণের নিকটে পরিচিত হন। সাহেবদিগের ভক্ত রত্নাবলীর ইংরাজী অগ্রবাদ আবজ্ঞক হয়। এই সূত্রে মাইকেল এখানে আসেন ও ইংরাজীতে রত্নাবলী অগ্রবাদ করিয়া দেন। এই অবধি তাঁহার সঙ্গিত ঘনিষ্ঠ হয়। শেষে মাইকেল নাটকের সংস্কৃত প্রথা ত্যাগ করিয়া ইংরাজী প্রথায়ে “শশিষ্ঠা” নাটক রচনা করিয়া কেশববাবুকে দেখান ও বাঙ্গালা রত্নাবলীর নাটকীয় গুণবহীনতা বুঝাইয়া দেন। রাত্তাঙ্গিণের পরে উহা শুনিয়া শশিষ্ঠা অভিনয় করিতে উদ্যত হন। শশিষ্ঠায় যিনি দে অংশের ভার লইয়াছিলেন, তাহার তালিকা,—

যযাতি	শ্রিয়নাথ দত্ত (পিতৃবিয়োগ হওয়ার যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়)
মাধব্য	কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
মন্ত্রী	নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
ভূক	দীননাথ ঘোষ

কপিল বকাহর	শরচ্চন্দ্র ঘোষ ঐবরচন্দ্র সিংহ (গাড়ী হইতে পড়িয়া গিয়া হাতভাডায় তারাতাঁদ গুহ অভিনয় করেন)
দৈত্য নগরবাসী	তারাতাঁদ গুহ (তৎপরিবর্তে নৃত্যলাল দে অভিনয় করেন) ১ হরিশ্চন্দ্র মৃণোপাধ্যায় ২ রমিকলাল লাহা ৩ ব্রজভূঁড় দত্ত
পারিষদবর্গ	যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (মহারাজ), প্রিয়নাথ শেঠ ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র
চোপদার	হারকানাথ মল্লিক ও মহেশচন্দ্র (তৎপরিবর্তে কৃষ্ণগোপাল ঘোষ অভিনয় করেন)
হারবান দেবধানী	বহুনাথ ঘোষ হেমচন্দ্র মৃণোপাধ্যায়
শশ্মিষ্ঠা	কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়
পুণিকা	কালিদাস সাত্তাল
দেবিকা	অবোরচন্দ্র দীঘড়িয়া
নটী	চুনিলাল বসু
পরিচারিকা	কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়
নর্তকী	(রত্নাবলীর নর্তকীগণ) এবং মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও কালীপ্রসন্ন মৃণোপাধ্যায়
নট	ব্রজভূঁড় দত্ত

সাহেবদিগের তত্ত্ব শশ্মিষ্ঠার ইংরাজী অধুবাদ মাইকেলই করেন। শশ্মিষ্ঠার আখড়াই ১২৬৫ সালের অগ্রহায়ণ মাসে আরম্ভ হয় এবং ১২৬৬ সালের ওরা ভাদ্র প্রথম অভিনয় হয়। ইহার সাত আটবার অভিনয় হইয়াছিল। শশ্মিষ্ঠার বীণা বাজাইয়া গান গাইবার ব্যবস্থা বড় কৌশলে নিষ্পন্ন হইত। শশ্মিষ্ঠার অভিনেতা সেতার হাতে করিয়া পরদার উপর কেবল হস্ত চালনা করিয়া মুখে গাইয়া যাইতেন, আর নেপথ্য হইতে একজন অপর এক সেতার বাজাইতে থাকিতেন। কেবল রাজবাটীর স্ত্রীলোকদিগকে দেখাইবার জন্য একদিন শশ্মিষ্ঠার অভিনয় হয়।

যখন পাইকপাড়ার রাজাদিগের উদ্যোগে বেলগেছিয়ায় রত্নাবলী অভিনয় হয়, সেই সময়ে আহরীটোলায় শকুন্তলার আখড়াই চলিতে থাকে। ১২৬৬ সালের প্রথমে (১৮৫২ খৃষ্টাব্দের মধ্যকালে) জনাইএর মৃণোপাধ্যায় মহাশয়দিগের উদ্যোগে তাঁহাদের কলিকাতার আহরীটোলার বাড়ীতেই ইহার অভিনয় হয়। জয়রাম বসাক ইহার রঙ্গালয়াধ্যক্ষ ছিলেন ও জয়চরণ গুপ্ত শিক্ষা দিতেন। এই অভিনয়ের জন্য আহরী-

টোলায় চন্দ্র মণোপাধ্যায়ের বর্তমান বাজারের পাশের হল প্রস্তুত হয়। অভিনেতৃদ্বিগের নাম যথা,—

দ্রুত	অতুলচন্দ্র মণোপাধ্যায়
বিদূষক	অখোরনাথ পণ্ডিত (?)
কণ	হেমচন্দ্র মণোপাধ্যায়
শাক্তরব	মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত
শারদ্বত	নীলকণ্ঠ বন্দ্যোপাধ্যায়
কঙ্কাকী	কালীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
সারথি	মহাদেব ঘোষাল
শকুন্তলা	অবিনাশচন্দ্র মণোপাধ্যায়
অনুয়া	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রিয়ংবদা	গোপালচন্দ্র দত্ত
গৌতমী	রামগোপাল হুদ
যেনকা	পূর্ণচন্দ্র মণোপাধ্যায়

এই অভিনয় দর্শনার্থ ৩কালীপ্রসন্ন সিংহ, ৩শরৎচন্দ্র ঘোষ, ৩ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-
৩দ্বারকানাথ বিজ্ঞানভূষণ, ৩গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য এবং হুগলী ও শ্রীরামপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট
প্রভৃতি সাহেবাবাদি উপস্থিত ছিলেন। প্রত্যেকের ও ভাষণে ইহার বিবরণ প্রকাশিত
হইয়াছিল।

ইহার পর ১২৬৬ সালের মধ্যকালে এবং ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের শেষে, প্রথমে বেলগেছিয়ায়
রত্নাবলী অভিনয়ের পর ও শ্মিষ্ঠা অভিনয়ের পূর্বে মালবিকামিমিত্রের অভিনয় হয়।
এই অভিনয়ে রাজা সার শ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর কঙ্কাকীর অংশ লইয়াছিলেন।
বেলগেছিয়ায় এই নাট্যালা তখন এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল।

যে সময়ে শ্মিষ্ঠার অভিনয় চলিতেছিল, সেই সময়ে ৩কেশবচন্দ্র সেনের যত্নে ও
চেষ্টায় মিস্ত্রিয়াপটিতে “বিধব-বিবাহ নাটকে”র অভিনয় করিবার অঙ্কঠান হইয়াছিল
ও আখড়াই চলিতেছিল। মিস্ত্রিয়াপটির ৩গোপাল মলিকের বাড়ীতে ইহার স্থান
হইয়াছিল। কেশববাবুই এখানকার শিক্ষক। ১২৬৭ সালের বৈশাখ মাসে ইহার প্রথম
অভিনয় হয়। অভিনেতৃবর্গের নাম,—

কুন্তিরাম ঘোষ	মহেন্দ্রনাথ সেন
মন্ত্রণ	প্রতাপচন্দ্র মজুমদার
রামকান্ত	কৃষ্ণবিহারী সেন
গুরুমহাশয়	হারাগচন্দ্র মজুমদার
রামদেব তর্কালঙ্কার	অক্ষয়চন্দ্র মজুমদার
বর	যাদবচন্দ্র রায়

বিধবাবিধাহার পক্ষীয় ব্যক্তি	ভোলানাথ চক্রবর্তী
হলোচনা	বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়
পদ্মাবতী	গোপালচন্দ্র সেন
স্বপ্নময়ীর পুত্রবধূ	নরেন্দ্রনাথ সেন
রসবতী নাপিতানী	রাগালচন্দ্র সেন

এই অভিনয়ে তিন জন প্রসিদ্ধ গায়ক গান করিয়াছিলেন — উমেশচন্দ্র ভট্ট, রাধিক-প্রসাদ দত্ত, ক্ষেত্রমোহন বসু এবং নিম্নলিখিত প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ বিভিন্ন যন্ত্রের বাদক ছিলেন,— পকানন মিত্র, গঙ্গাধর মিত্র, রসিকচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও বেণীমাধব সোম। বেলগেছিয়ার অভিনয়ের ত্রায় এই অভিনয়ও অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। পাইকপাড়ার উত্তমেন্দ্রনাথ এই অভিনয় খোলা হয়। প্রথমে “এডেলফি থিয়েটার” ডাড়া করিয়া এই অভিনয়ের প্রস্তাব হয়। ১০০ মাসিক ডাড়া চাওয়ায় সে সংকল্প পরিত্যাগ করিয়া হলধিন সাহেবকে রঙ্গমঞ্চ ও দৃশ্যপটাদি প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। ইহাতে চারি হাজার টাকা খরচ পড়ে। ৬ মূলীধর সেনই অধিক টাকা দেন, অবশিষ্ট টাকা চান্দায় উঠে। তখনকার হরকরা পড়ে এই অভিনয়ের বাদ প্রতিবাদ হইয়াছিল।

ইহার পর শোভাবাজার রাস্তাঘাড়ীতে নাট্যাভিনয়ের চেষ্টা হইয়াছিল। কুমার উপেন্দ্র-চন্দ্র দেব, কুমার অমরেন্দ্রচন্দ্র দেব, কুমার ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দেব, কুমার উদয়চন্দ্র দেব, গোপালচন্দ্র রক্ষিত, চন্দ্রকালী ঘোষ ও কালীচন্দ্র বসু প্রভৃতি ইহার উদ্যোক্তা। ১২৭১ সালে ৬৫মংকারচন্দ্র ঘোষের বৈঠকপনায় ইহাদের আপড়াই প্রথম বসে। এই সময়ে প্রিয়মাধব বহুমল্লিক, প্যারীমোহন দাস, মণিমোহন সরকার প্রভৃতি বোগ দেন। মাইকেলের “একেই কি বলে সভ্যতা” অভিনয় হয়।

শোভাবাজারের “থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি” সাধারণ না হইলেও ইহার কার্যাদি সোসাইটির উপযুক্ত নিয়মে স্বপঞ্চালার সহিত নির্বাহ হইত। তৎকাল সভাপতি, সম্পাদক প্রভৃতি কণ্ঠচ্যারী ও নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ৬৫মংকারী ঘোষ ইহার সভাপতি এবং ডাক্তার উমেশচন্দ্র মিত্র ইহার সম্পাদক ছিলেন। রাস্তা দেবীচন্দ্রের বাড়ীতে ইহার অভিনয় হইত। তিনটি প্রকান্ত অভিনয় হইয়াছিল। কবিবর ৬৫মংকার বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার অভিনয়দর্শনার্থ উপস্থিত হইয়াছিলেন। তখনকার প্রধান সংবাদপত্র হিন্দু পেট্রিয়টে ইহার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। অভিনেতৃবর্গের নাম,—

নববানু	মণিমোহন সরকার
কালীবানু	কুমার উপেন্দ্রচন্দ্র দেব
কর্তা	প্যারীমোহন দাস (বৈষ্ণব)
মাতাল	ঐ
যন্ত্রিগণ	ঐ
বাবাজী	প্রিয়মাধব বসু মল্লিক

বৈষ্ণবনাথ	}	জীবনরক্ষক দেব
পাহারাওয়াল		
পানসাহা		
চৌকিদার		
সার্জন		কালীরক্ষক বহু
বারবিলাসিনী ১ম		হরলাল সেন
ঐ ২য়		কুমার অমরেন্দ্ররক্ষক দেব
প্রসন্নময়ী		ঐ
মুটে		কুমার উদয়রক্ষক দেব
কমলা (১)		ঐ
ঐ (২)		গোপালচন্দ্র রক্ষিত
বাবু (১)		ঐ
ঐ (২)		কুমার হরেন্দ্ররক্ষক দেব
ঘরবান		ঐ
পয়োধরী (নর্তকী)		কালিদাস সাক্তান
নিতম্বিনী (ঐ)		রায়কুমার সুপোপাখ্যায়
মালী (বেলফলওয়াল)		উমেশচন্দ্র মিত্র (ডাক্তার)
বরকওয়াল		অতুলরক্ষক দেব
গৃহিণী		জয়রক্ষক বহু
হরকামিনী		কুমার ত্রৈলোক্যরক্ষক দেব
মৃত্যুকালী		.. বরেন্দ্ররক্ষক দেব

শোভাবাজার রাজবাটীর এই দলে পরে “রক্ষকুমারী” অভিনয় হইবে বলিয়া আশঙ্কাই আরম্ভ হয়। এই সময়ে বাগবাজার মদনমোহন-তলা নিবাসী ৮নীলমণি চক্রবর্তী মহাশয়ের পুত্র শ্রীধর গোপাল চক্রবর্তী মহাশয় নক্কুতাংয়ে ঘাড়ায়াত করিতেন। ১২৬৪ সালের শেষে যখন রক্ষকুমারী খুলিবার উদ্যোগ হয়, সেই সময়ে কালিদাস সাক্তানের সহিত রাজাদিগের মনোমালিন্ত হওয়ায় তিনি এবং গোপালবাবু দল ত্যাগ করিয়া আসেন। শেষে উভয়ের চেষ্টায় গোপালবাবুদিগের বাড়ীতে এক নাট্যসম্মেলনের প্রতিষ্ঠা হয়। কালিদাসবাবু নিজে নলদময়ন্তী নাটক রচনা করেন এবং তাহারই মাগড়াই আরম্ভ হয়। গোপালবাবুর নাট্যচোঁা যে এই প্রথম ক্ষুরিত হয় তাহা নহে, ইহার বঙ্গের পূর্বে সিমলানিবাসী জয়গোপাল মিত্র ও নবগোপাল মিত্র মহাশয়ের ঐবৎসচিন্তা-যাত্রার দল করিয়াছিলেন। সেই যাত্রার গাওনা গোপালবাবুদিগের বাড়ীতে একবার হইয়াছিল। এই যাত্রা শুনিয়াই গোপালবাবুর অভিনয়-সুহা বলবতী হয় এবং শোভাবাজার-রাজবাটীর রক্ষকুমারীর দলে যোগ দেন। তাহার পর নিম্নবাটীতে থিয়েটারের দল বসাইয়া,

মহা উৎসাহে শিক্ষা দিতে থাকেন। কৃতকর্ণা কালিদাস সাক্ষাত মহাশয়ই এখানে শিক্ষকতা করেন। গোপালবাবু নিজেও শিখাটেন। ১২৭১ সালের মধ্যভাগে (১৮৬৪ খ্রষ্টাব্দের শেষে) নলদময়ন্তীর অভিনয় হয়। এই সম্প্রদায়ের অভিনেতাদিগের নাম,—

নল	গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী
বিদূষক	কালিদাস সাক্ষাত
মন্ত্রী	নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
ভীষ্মদেব	গগনচন্দ্র চক্রবর্তী
কঙ্কী	জামাচরণ চক্রবর্তী
ব্যাধ	রমিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
তাকণ	গিরীশচন্দ্র মিত্র
কবি	গিরীশচন্দ্র ঘোষ ^৩
সারথী	অভয়চরণ পাল
নট	ক্ষেত্রমোহন বসু
দময়ন্তী (১)	আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়
(২)	শিবচন্দ্র "
সপিত্র	গোপালচন্দ্র মজুমদার, আনন্দলাল মিত্র, হরিন্দাস সরকার
নটী	হরিশচন্দ্র কণ্ঠকার

এই দল চারিবেশের চলিয়াছিল। জুই বৎসর “নলদময়ন্তী” অভিনয় হইয়াছিল। চৌদ বা পনের বার ইহার অভিনয় হয়। ইহার মধ্যে বর্জমানের রাজবাটীতে, ভাটপাড়ার ভট্টাচার্য্যাদিগের বাড়ীতে, শিবপুরে চৌধুরীদিগের বাড়ীতে যে সকল অভিনয় হয়, তাহা অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। ভাটপাড়ার অভিনয় সর্বাঙ্গপেক্ষা উৎকৃষ্ট হয়। এতদ্বির পাথুরিয়াবাটায় বীরনৃসিংহ মল্লিকের বাড়ীতে, লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে ও বহুপাড়ায় গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে ইহার অভিনয় হয়। এতদ্বির গোকুল মিত্রের বাড়ীতে ও গোপালবাবুর নিজ বাড়ীতে কয়েকবার অভিনয় হইয়াছিল। পাথুরিয়াবাটায় জয়রাম বসাকের বাড়ীতে ইহার যে অভিনয় হয়, তাহাই ইহার ড্রেস রিহার্সাল। এই অভিনয়ের এত সূচ্যতি হইয়াছিল যে, লোকে শঙ্কুলা অভিনয়ের স্থায় ইহার আদর করিত। মহারাজ মহাতাব চাঁদ বাহাদুর ইহার অভিনয় দেখিয়া এত প্রীত হন যে তৎবধি প্রতীক ও অভিনেতা কালিদাসবাবু মহারাজের বিশেষ অঙ্গুগ্রহের পাত্র হইয়া পড়েন। কালিদাসবাবু বর্জমানের রাজসরকারে চাকুরী করিতেন। জুই বৎসর পরে এই দলে “ইন্দুশ্রদ্ধা” নামে এক নাটক অভিনীত হয়। চট্টামহেশতলা-নিবাসী

^৩ বেঙ্গল থিয়েটারের মূলপ্রতিষ্ঠাতার পুত্রস্বরূপে গিরীশচন্দ্র এই ব্যক্তি। বিহারীচন্দ্র প্রাস অভিনয় কালীদিগের বাড়ীতে, আর তাহার সহযোগী দিল্লীবাবুর প্রথম অভিনয় বাগবাগানে।

গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার প্রণেতা; ইন্দুপ্রভা ও পাঁচ সাতবার অভিনীত হইয়াছিল, তবে ইহা গোহুল মিত্রের বাটী ও গোপালবাবুর নিজ বাটী ভিন্ন অন্তর অভিনীত হয় নাই।

এ পর্য্যন্ত অষ্টাভাট কোন ধর্মীর বাড়ীতে বা নির্দিষ্ট স্থানে নাট্যাভিনয় সীমাবদ্ধ ছিল, অন্তর গিয়া অভিনয় করার প্রথা তৎকালে ছিল না। বাগবাজারের এই নলদময়ন্তীর দল প্রথম বিশেষে ঘাইয়া দে প্রথা পরিবর্তন করেন। ইন্দুপ্রভা গ্রন্থের বিচিত্রবাহর অংশ গোপালবাবু গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই দলের পরিচয় দিবার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা দলের পরিচয় এই ভুলেই দিতে চাইতেছি। উত্তর কালে এই শৈলোক দলের সঙ্গে বঙ্গীয় রঙ্গালয়ের বিশেষ সংশ্লিষ্টা-ছিল। এই দলের অন্ততম অধিনেতা গিরীশচন্দ্র মিত্র ও আনন্দলাল মিত্র ৩গোহুল মিত্রের বাংশধর। এই গিরীশবাবু একজন উত্তম সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি। নলদময়ন্তীর সহিত যে একতানবাজ বাজিয়াছিল, তাহার বাদকদল অভিনেতৃগণ হইতে ভিন্ন নহে। অবশেষে গিরীশবাবু একটি স্বতন্ত্র বাদকদল গঠন করেন। এই দলে বাগবাজার ও শ্রামবাজার-নিবাসী কতিপয় যুবক যোগ দেন, তন্মধ্যে বহুশাড়া নিবাসী ৩গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র ৩নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাঙ্গার দুর্গাদাস করের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত রাধামাধব করের নাম উল্লেখ করিতে হইতেছে। এই দুই ব্যক্তির ভবিষ্যতে বাঙ্গালার আদি সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠাতৃগণের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি। এই বাদক দলে একজন মুসলমান যুবক যোগ দেন, তিনি হিঙ্গুল খাঁ ওরফে হেমবাবু নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি একজন সঙ্গীতজ্ঞ ও রহস্যরসপট্ট অভিনেতা ছিলেন। উত্তরকালে জ্ঞানানু-থিয়েটারে ইনি অভিনয়ও করিতেন এবং সঙ্গীত শিক্ষা দিতেন।

যখন গিরীশ মিত্রের এই বাদকদল গঠিত হয়, সেই সময়ে ভবানীপুরে “অবৈতনিক নাট্য মন্দির” নামে একটি থিয়েটারের দল গঠিত হয়। এখানে উমেশচন্দ্র মিত্রের রচিত “নীতার বনবাস” নাটক অভিনীত হয়। ১২৭২ সালের চৈত্র মাসে (১৮৬৬ মার্চ মাসে) নীলমণি মিত্রের বাটীতে (সবু রমেশচন্দ্র মিত্রদিগের পুরাতন বাটীতে) ইহার প্রথম অভিনয় হয়। এই অভিনয়ের সঙ্গে ভবানীপুরের তদানীন্তন প্রসিদ্ধ বাদক সবু রমেশচন্দ্র মিত্রের ভ্রাতা কেশবচন্দ্র মিত্রের একতান-বাদক সম্প্রদায় বাগাইয়াছিলেন।

এই সময়ে বাগবাজারের গিরীশচন্দ্র মিত্রের বাজনার দলের খুব সুনাম হইয়াছিল। ভবানীপুরে ৩জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে এই বাগবাজারের দল একদিন বাজাইতে যান। বাজনার স্থানীয় কেশববাবুর দলের অপেক্ষা বাগবাজারের দল হৃদয় আর্জন করিয়া আসেন। এই স্থখ্যাতির পর নগেন্দ্রবাবু গিরীশবাবুর দল ত্যাগ করিয়া বহুশাড়ার নিজ বাটীতে এক বাজনার দল বসান। রাধামাধববাবু ও হিঙ্গুল খাঁ নগেন্দ্রবাবুর দলে মিলিত হন। ক্রমশঃ গিরীশবাবুর দল ভাঙ্গিয়া নগেন্দ্রবাবুর দল পরিপূর্ণ হইয়া উঠে।

এই বাগবাজারের একতান-বাদক দলের দুই এক ব্যক্তির অগ্রে শ্রামপুত্র নিবাসী ৩ব্রজনাথ দেব “শ্রামপুত্র একতান-বাদক-সম্প্রদায়” নামে এক বাজনার দল করেন।

ইহারই দলে প্রথম ক্যারিওনেট বাঁশী বাজান আরম্ভ হয়। তখনও কর্নেট বাজান হইত না। তাঁত ও তারের যন্ত্র সমস্ত, পিকলো, ক্যারিওনেট বাঁশী, জলতরঙ্গের বাটী ও এই দলে একত্র বাজান হইত। এতদ্ভিন্ন পঞ্চ বান্ধাইয়া হ্রদ দেওয়া হইত। ডি-হুরে কনসার্ট বাজার হইত, বাছিয়া বাছিয়া ডি-হুরের শাঁখ আনা হইয়াছিল। যতক্ষণ বাজনা হইত, শানাইয়ের পোঁধরা হিসাবে এই শাঁখে সেইরূপ হ্রদ দেওয়া হইত। এই দল হইতে রাধামাধববাবু ক্যারিওনেট বাঁশী ক্রয় করিয়া আনেন। বাগধাক্করের দলে এই বাঁশী বাজিত। ব্রজবাবুর বাজনার দল প্রথম চৈত্র মেলার বাজাইয়াছিলেন। নাটককার ত্রিমুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ এই ব্রজবাবুর ভগিনীপতি।

এই সময়ে নানাদিকে নাট্য-চেঠা জাগিয়া উঠিয়াছিল। পূর্বে যেমন কুলীন-কুলসর্গর ও শকুন্তলার একটা যুগ গিয়াছিল, এই যুগে সেইরূপ “পদ্মাবতী”র আসর বাড়িয়াছিল।

১২৭০ সালে পাথুরেঘাটার ত্রিমুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের (তখনও রাজা হন নাই) বাড়ীতে একটা নাট্যসম্রদায় স্থাপিত হয়। যতীন্দ্রমোহনের পৈতৃক বাড়ীতে (৬৬নং পাথুরেঘাটার) ইহার রক্ষণক হয় নাই। পাথুরেঘাটার ঠাকুর গোষ্ঠীর আদি বাড়ীতে (৬৭নং পাথুরেঘাটার) ইহার রক্ষণক স্থাপিত হয়। এই স্থানে ১২৭১ সালে (১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে) “মালবিকাগ্নিমিত্র” অভিনীত হয়। পাইকপাড়ার রাজাদিগের যত্নে ১২৬৬ সালে ইহার অভিনয়ে যে সকল অভিনেতা অভিনয় করেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এই অভিনয়ে যোগ দিয়াছিলেন। পাইকপাড়ার অভিনয়-শিক্ষক ত্রিমুক্ত কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ই এখানে শিক্ষক হইয়াছিলেন। ঠিক কোন্ তারিখে “মালবিকাগ্নিমিত্র” প্রথম অভিনীত হয় ও কাহারো কোন অংশ লইয়া অভিনয় করেন, তাহা জানা যায় নাই। ইহার পর যতীন্দ্রমোহন রামনারায়ণ তর্করত্নের নূতন নাটক “কংসবধ” অভিনয় করিবার উদ্যোগ করেন, কিন্তু নানা অসুবিধায় উহা পরিত্যাগ করা হয়। এই সময়ে পুস্তকাভাবে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর নিজে “বিদ্যাহনুসর” নাটক রচনা পূর্বক আগড়াই দেওয়ান। নয় দশ বার অভিনয়ের মধ্যে নিজে একটা তারিখ দেওয়া গেল,—

- ১ম ১২৭২/২৩শে পৌষ, শনিবার (১৮৬৬/৬ জাহ্নয়ারী)
- ২য় “ ২৭শে পৌষ, বুধবার (“ ১০ জাহ্নয়ারী)
- ৩য় “ ২৯শে মাঘ, শনিবার (“ ১০ ফেব্রুয়ারী)
- ৪র্থ “ ৭ই কাশ্বন “ (“ ১৭ “)
- ৫ম “ ১২ই কাশ্বন “ (“ ২৪ “)

এই অভিনয়ের সময়ে রেওয়ার রাজা কলিকাতায় আসিয়া মহারাজ যতীন্দ্রমোহনের স্বরকতঙ্ক নামক উড়ানে বাস করেন। বিদ্যাহনুসরের আগড়াই তখন শেষ হইয়া গিয়াছে, শ্রুতিবার উদ্যোগ হইতেছিল। ১২৭২ সালের ১২এ পৌষ (১৮৬৫/৩০ ডিসেম্বর) তারিখে যতীন্দ্রমোহন তাঁহাকে স্ব-ভবনে নিমন্ত্রণ করেন। ইহাকে আপ্যায়িত করিবার জন্য এই দিনই বিদ্যাহনুসরের ড্রেস-রিহার্সালের ব্যবস্থা করা হয়। এই দিন যতীন্দ্রমোহনের নিজ

পরিচয় ও রেবার রাজ্য দলবল বাতীত আর কেহ উপস্থিত ছিল না। তৃতীয় অভিনয়ে বিজ্ঞানগরম্-এর মহারাজ দর্শক ছিলেন। এই সময়ে যুরোপ হইতে নবাগত থেরেস পুশার্ড নামক এক প্রসিদ্ধ বাদক টাউন হলে খ্যাত বাজুকৌশল জনাইয়া লোককে চমৎকৃত করিতেছিলেন। সপ্ততন্ত্র যতীন্দ্র ও শেরীজমোহনের সহিত তিনি পরিচিত হন। বিজ্ঞানস্বরের তৃতীয় অভিনয়ে পুশার্ড নিমন্ত্রিত হইয়া বেহালা বাজাইয়াছিলেন। তখনকার যুরোপীয় বাজকগণ নিজেদের “বাকিস্ টম্-” কোম্পানীর দোকানের অধ্যক্ষ রিজ্লে এই চতুর্থ অভিনয়ে পুশার্ডের বাজনার সহিত পিয়ানো বাজাইয়াছিলেন।

বিজ্ঞানস্বরের অভিনেতৃগণের নামাদি,—

রাজা বীরসিংহ	রাধাপ্রসাদ বসাক
মন্ত্রী	হরিমোহন কর্ণকার
গদাডাট	গিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
স্বন্দর	মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
ধুমকেতু	হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
পিছা	মদনমোহন বর্মা
সীরামালিনী	রুদ্ৰধন বন্দ্যোপাধ্যায়
সুলোচনা	যদুদাস মুখোপাধ্যায়
চপলা (১)	খদুনাপ বোষ
ঐ (২)	কটিক ওরফে হরকুমার খন্দোপাধ্যায়
বিমলা	নারায়ণচন্দ্র বসাক
প্রতিবাসী	অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়
প্রহরী	ব্রজভল্লভ বসাক

এই সঙ্গেই প্রথম অভিনয় হইতেই “বেমেন কর্ণ তেমনি ফল” নামক একখানি প্রহসনের ও অভিনয় হয়। ১৩ আশ্বিনের তারিখের “বেঙ্গলী” পত্র তাহার তদানীন্তন সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ এই অভিনয়ের স্থখাতি করিয়া এক বিবরণ লেখেন।

এই বিজ্ঞানস্বরের অভিনয়ের সঙ্গে বাঙ্গালা সাধারণ নাট্যালয়ের অজ্ঞাতম প্রতিষ্ঠাতা অর্কেন্দ্ৰেশ্বর মৃত্যু মহাশয়ের একটু সঙ্গ ছিল। এই অভিনয়ের সময়ে অর্কেন্দ্রাব্দ আত্মীয়তাপ্রভে যতীন্দ্রমোহনের বাড়ীতে থাকিতেন। এই তাহার প্রথম অভিনয় দর্শন। তিনি এইখানে থাকিয়াই অভিনয়বিজ্ঞার সমস্ত ব্যাপারগুলি দেখিবার ও বুঝিবার সুবিধা পাইয়াছিলেন। তিনি তখন স্থলে পড়িতেন। তখনও তিনি নাট্যের কোন সম্পর্কে ছিলেন না।

যতীন্দ্রমোহনের এই নাট্যসম্প্রদায়ে ক্রমশঃ ১. “মালবিকাগ্নিমিত্র” ২. “বিজ্ঞানস্বরের” ৩. “বেমেন কর্ণ তেমনি ফল” ৪. “বৃথলে কিনা” ৫. “মালতীমাধব” ৬. “উদয়-সঙ্কট” ৭. “চন্দ্রদান” ৮. “কল্লিগী-হরণ” ৯. “রসবিহারবৃন্দক” অভিনীত হইয়াছিল এবং এই দল

অনেক দিন পর্য্যন্ত বস্তুমান ছিল। কল্লিগী-হরণের অভিনয় পর্য্যন্ত যতীন্দ্রমোহনের নাট্য-সম্প্রদায় একটানে চলিয়াছিল। তাহার পর বন্ধ থাকে, পুনরায় ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে “রসাবিকারবৃন্দক” নামক ক্ষুদ্র দৃশ্যকাব্য রচিত ও অভিনীত হয়। এই সকল অভিনয়ের সঙ্গে ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত একতান-বাধন-সম্প্রদায় বাজাইতেন। তাহাতে অধিকাংশ দৈন্য বস্ত্র বাসিত। বেহালা বাতীত বিদেশীয় অস্ত্র কোন বস্ত্র ছিল না। ফুঁ নিয়া বাজাইবার কোন বস্ত্রও ছিল না। ইহা “শৌরীন্দ্রমোহনের কনসার্ট” নামে খ্যাত হইয়াছিল। বিজ্ঞানস্বরের অভিনয় হইতেই নাটক ও প্রহসন একত্র অভিনয়ের প্রথা প্রবর্তিত হয়।

পাথুরেঘাটার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়ীতে চতুর্থ পুস্তক মালতীমাধব নাটক ১২৭৪ সালের ১৫ আশ্বিন (১৮৬৭/৩১ সেপ্টেম্বর) বৃহস্পতিবার প্রথম অভিনীত হয়। ইহা আট মলবার অভিনীত হইয়াছিল। এক রাত্রিতে কেবল সাহেববিবিদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া অভিনয় দেখান হয়; এইদিন লর্ড লরেন্স উপস্থিত ছিলেন। মালতী-মাধবের গানগুলি বনওয়ারীলাল রায় নামক এক ব্যক্তি বাঁধিয়া দিয়াছিলেন।

এই সময়ে শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিকাল সোসাইটি “রুমকুমারী” নাটকের আখড়াই বসান। ১২৭২ সালের ১০ই জ্যৈষ্ঠ (১৮৬৪/২৪ জুলাই) সোমবারে ইহার প্রথম অভিনয় হয়। সে অভিনয় কেবল বন্ধুবান্ধবের মর্মানার্থ প্রদর্শিত হইয়াছিল। ১২৭৩ সালের ১লা পৌষ (১৮৬৭/১২ ফেব্রুয়ারী) শনিবারে ইহার প্রকৃত অভিনয় হয়।^৭ এই অভিনয়ের সময়ে এই নাট্যসমিতির ব্যবস্থা অতি সূক্ষ্ম ছিল, নিম্নে তাহার পূর্ণ বিবরণ প্রদত্ত হইল। ইহার একটি কার্য্যনির্বাহক সমিতি ছিল,—

কালীপ্রসন্ন সিংহ	সভাপতি
রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	সহকারী সভাপতি
কুমার ব্রজেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর	সদস্য
কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর	“
চন্দ্রকালী বোষ	“
রূপলাল মিত্র	“
বরদাকান্ত মিত্র	“
মণিমোহন সরকার	“
কুমার ব্রজেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর	ধন্যবাদ
“ আনন্দকৃষ্ণ “	সম্পাদক
প্যারীমোহন দাস (বৈষ্ণব)	সহকারী সম্পাদক

৭ এই প্রকৃত অভিনয়ে ছোটলাটের ব্যবস্থা-বল বাজাইয়াছিল।

এতদ্বিন্ন কতকগুলি কর্মচারী ছিলেন,—

কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর	রঙ্গমঞ্চাধ্যক্ষ
রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ
কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণ	শিল্পক
রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	
প্যারীমোহন দাস	
রূপলাল মিত্র	মুদ্রায়ত্ত-সংক্রান্ত কর্মচারী
কুমার অমরেন্দ্রকৃষ্ণ	
বরদাকান্ত মিত্র	
প্যারীমোহন দাস	একতান-বাগিন-সম্প্রদায়ের নেতা
রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	
কুমার হরেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র বাহাদুর	
বরদাকান্ত মিত্র	"হলে"র তত্ত্বাবধায়ক
কুমার হরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর	
কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণ " "	
কুমার ত্রৈলোক্যকৃষ্ণ " "	সামগ্রিকের তত্ত্বাবধায়ক
বরদাকান্ত মিত্র	
রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	
অতুলকৃষ্ণ দেব	অভ্যর্থনাকারক
চন্দ্রকালী বোষ	
রূপলাল মিত্র	
বরদাকান্ত মিত্র	কর্মচারী-প্রধান
কালীকমল লস্কর	
জীবনকৃষ্ণ দেব	
অতুলকৃষ্ণ দেব	
যশিনোহন সরকার	

প্রতি মঙ্গল, শুক্র ও রবিবারে ইহাদের নাট্যাভ্যাস হইত। ১৮৭৭/১১ ফেব্রুয়ারী হিন্দু পেট্রিয়টে এই অভিনয়ের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হয়। এই অভিনয়ে প্রসিদ্ধ নাট্যকার ত্রিগিরিশচন্দ্র বোষ উপস্থিত ছিলেন মাত্র, নাট্যসম্প্রদায় তুচ্ছ ছিলেন না।

এই অভিনয়ে ষাঁহার। যে ভূমিকা লইয়া অভিনয় করেন, তাহার বিবরণ,—

হৃদয়ধার	ক্ষেত্রমোহন বসু
ভীষসিংহ	বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়
বলেন্দ্রসিংহ	প্রিয়মাধব বসু মল্লিক

সত্যদাস
জগৎসিংহ
নাগায়ণ মিশ্র
ধনদাস
দুত
ভূতা
রুকুমারী
অহল্যাবাই
তপস্বিনী
মদনিকা
১ম সহচরী
২য় সহচরী

কুমার আনন্দরুক দেব বাহাদুর
কুমার উপেন্দ্ররুক দেব বাহাদুর
বেণীমাধব ঘোষ
মণিমোহন সরকার
বেণীমাধব ঘোষ
জীবনরুক দেব
কুমার ভজেন্দ্ররুক দেব বাহাদুর
কুমার অমরেন্দ্ররুক দেব বাহাদুর
কুমার উদয়রুক দেব বাহাদুর
রামকুমার মুখোপাধ্যায়
শ্রীহীরলাল সেন
নকুড়চন্দ্র মুখোপাধ্যায়

পাথুরেঘাটার রাজবাড়ীতে বিদ্যাস্বন্দরের অভিনয়ের ঠিক পুরেই পটলডাঙ্গা আড়-পুলিতে “আড়পুলি-নাট্যসমাজ” স্থাপিত হয়। এখানে প্রথমে “মহাশেতা” পরে “শকুন্তলা” ও “বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁটা” অভিনীত হয়। কেহ কেহ বলেন, এই দুই নাটক ছাত্ত-বাবুর বাড়ীতে অভিনীত নাটক নয় হইতে বিভিন্ন এবং এই সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তি কর্তৃক রচিত। ১২৭৩ সালের বৈশাখ মাসে (১৮৬৯ খ্রষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে) এই সম্প্রদায়ের প্রথম অভিনয় হয়। ইহার পর এই দলে শ্রীযুক্ত নিমাইচরণ শীলের “চন্দ্রাবলী” নাটক ও “এঁরাই আবার বড় লোক” নামক প্রহসন অভিনীত হয়। “প্রাণীবৃত্তান্ত” প্রণেতা শ্যামকৃষ্ণ দত্ত এই দলের সম্পাদক (ম্যেজিষ্টার) ছিলেন।

যে সময়ে বাগবাঁজারে নগেন্দ্রবাবুদিগের বাজনার দল খুব জোরে চলিতেছিল, সেট সময়ই সিমলা শুড়ীপাড়ায় শুড়ীদিগেরই বাড়ীতে পদ্মাবতী অভিনয়ের এক অল্পমান হইয়াছিল। বাগবাঁজারের বাজনার দলের নগেন্দ্রবাবু আসিয়াই এখানে শিক্ষকতা ও নিজের কল্কী সাজিয়া অভিনয় করিতেন। উত্তরকালের জ্ঞানানাল থিয়েটারের অন্ততম প্রতিষ্ঠাতা নগেন্দ্রবাবুর প্রথম অভিনয়ের পরিচয় এই। ১২৭৩ সালের প্রথমে (১৮৬৬ খ্রষ্টাব্দেই) এই দলের প্রথম অভিনয় হয়।

এই সময়ে কলিকাতায় নাট্যমোদের একটা প্রবল স্রোতঃ বহিয়াছিল। প্রায়প্রত্যেক পরীতেই নাট্যাভিনয়ের চেষ্টা হইয়াছিল। তন্মধ্যে সকল সম্প্রদায়ের বিবরণ সংগৃহীত হয় নাই, হওয়াও সুসাধ্য বা সম্ভবপর নহে। এই সময়ে কলিকাতার উপকণ্ঠে ভবানীপুত্র এবং শিবপুরেও নাট্যাভিনয়ের চেষ্টা হইয়াছিল।

পাথুরেঘাটার বিদ্যাস্বন্দর অভিনয় হইবার সময়ে জোড়াসাঁকোর ৬৭৪কানানথ ঠাকুরের মধ্যম পুত্র গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ীতে এক নাট্যসমাজ স্থাপিত হয়। ইহার নাম “জোড়াসাঁকো অবৈতনিক নাট্যসমাজ”। গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদয় পুত্র

৬গণেশনাথ ও গুণেশনাথ ঠাকুর তাহার পৃষ্ঠপোষক। কেশবচন্দ্র বেনের কমিটি ভাতা কৃষকবিহারী সেন ও প্যারীচাঁদ মিত্রের পুত্র হীরলাল মিত্র এবং গুণেশনাথ পরামর্শ করিয়া মাইকেলের কৃষ্ণকুমারী অভিনয়ের প্রস্তাব করেন। আগড়াই ও রসমক প্রভৃতি আরম্ভ হয়। শেষে গণেশনাথ প্রস্তাবে কোন সমাজহিতকর নাটক অভিনয়ের করণা হয়। সুশীল-হৃদয়বিধ বিবাহ-বিবাহ প্রভৃতি নাটকের জায় নতুন কোন সামাজিক নাটকের জায় ইহার চোঁটা করেন। শেষে কেশবচন্দ্র বিজ্ঞানায়ন মণ্ডলীর পরামর্শে ২০০১ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়া বহুবিবাহ স্বর্গদে নাটক লেখাইবার ব্যবস্থা করা হয়। তখনকার অগ্রণী নাটককার রামনারায়ণ তর্করত্ন “নবনাটক” লিখিয়া আনেন। ১২৭৩ সালের ২৩ বৈশাখ তারিখে প্রকাণ্ড সভায় তাঁহাকে পুরস্কার দেওয়া হয়। ৬প্যারীচাঁদ মিত্র সভাপতি ছিলেন। ইহার পর গণেশনাথ ও গুণেশনাথ একটা কমিটি করিয়া সেই নাটকের অভিনয় করিতে অগ্রসর হইলেন। কমিটিতে গণেশনাথ ঠাকুর, গুণেশনাথ ঠাকুর, ৬মহর্ষি দেবেশনাথ ঠাকুরের ছোট পুত্র প্রসন্ন সাহিত্য: রণী শ্রীযুক্ত শিবেশনাথ ঠাকুর, ৬ঐনাথ ঠাকুর (৬বারকানাথ ঠাকুরের ছোট ভাতা ৬রাধানাথ ঠাকুরের পৌত্র), শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত নীলকমল মুখোপাধ্যায় ছিলেন। ১২৭৩ সালের ২২ পৌষ (১৮৬৭৫ই জ্যৈষ্ঠ) ইহার প্রথম এবং ১২৭৩১২ কাল্কান (১৮৬৭১২০ কেরুয়ারী) ইহার শেষ বা নবম অভিনয় হয়।

অভিনেতৃবর্গের নাম,—

গবেশবাবু	অক্ষয়কুমার মহম্মদার
সুধীর	সারদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
বিদ্যবাসীশ	আনন্দচন্দ্র বেদান্তবংশী
চিত্তভোম	যতুনাথ মুখোপাধ্যায়
গ্রাম্য	শৈলেন্দ্রনাথ ঠাকুর
মোখো	ঐ
নাগর	নীলকমল মুখোপাধ্যায়
নট	ঐ
দণ্ডাচার্য্য	তুবনমোহন চট্টোপাধ্যায়
কৌতুক	মতিলাল চক্রবর্তী
স্ববোধ	বিনোদলাল গঙ্গোপাধ্যায়
সাবিত্রী	সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়
চন্দ্রলেখা	অমৃতলাল গঙ্গোপাধ্যায়
অচলা	ধাক্ষুষণ মুখোপাধ্যায়
কমলা	দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়
বিমলা	রাধাবিনোদ চট্টোপাধ্যায়
চপলা	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

চম্পকলা নাট্য

মণিলাল মুখোপাধ্যায়
রায়গোপাল মজুমদার

এই অভিনয় এ পর্যন্ত অভিনীত সমস্ত পুণ্ড্রের অভিনয় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও হুমসত হইয়াছিল। ত্রিমুক্ত অর্ধেকশেষের মুহূর্ত্তী মহাশয় বলেন, এই অভিনয় দেখিয়াই তাঁহার অভিনয় সম্বন্ধে যাহা কিছু দেখিবার, শুনিবার ও জানিবার বাকী ছিল, তাহা সম্পূর্ণ হইয়া গেল। এই অভিনয়ের স্ফুর্তি কলিকাতার সর্বত্র প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল।

ইহার পর বটতলায় ৬জুন্টাম মিট্রের পুত্র ত্রীপাচকড়ি মিট্রের উজোগে ৩:৯ নম্বর চিংপুর রোডের বাড়ীতে “পদ্মাবতী” অভিনয়ের অনুষ্ঠান হয়। ১২৭৪ সালের ৩০ ডাঃ (১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ১৪ সেপ্টেম্বর) শনিবার এই বাড়ীতে ইহার প্রথম অভিনয় হইয়াছিল।

অভিনেতাদের নাম,—

ইন্দ্রনীল

বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়

মন্ত্রী

সারথি

কল্লুকী

অস্ত্রী

কলি

বিদূষক

নাগরিক ১ম

এ ২য়

সারবান ১ম

এ ২য়

পত্নী

গৌতমী

মুরজা

পদ্মাবতী

বহুমতী

পরিচারিকা

গিরীশচন্দ্র ঘোষ

ভীবনকৃষ্ণ সেন

মণিমোহন সরকার

চণ্ডীচরণ ঘোষ

পূর্ণচন্দ্র ঘোষ

কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

কানীকুমার লস্কর

হেমচন্দ্র ঘোষ

পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

ঈতলচন্দ্র বসু

শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

হরিদাস দাস (বৈষ্ণব)

অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

বিহারীবাবু অভিনয় শিক্ষা দিতেন। গায়ক জোয়াল গ্রন্থাদ ও বাদক নিতাই চক্রবর্তী (রামাৎ বৈষ্ণব) সঙ্গীত শিক্ষক ছিলেন। দুই একটা অভিনয়ে মাইকেল উপস্থিত ছিলেন। বাগবাজার নিবাসী শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (যিনি কালানাল বিয়েটারে “নীলামর্পণে” দেওয়ান সাজিতেন, তিনি) এই দলে ছিলেন, কিন্তু কোন অংশ গ্রহণ করেন নাই। পদ্মাবতীর অভিনেতা শিবাবু স্বতন্ত্র ব্যক্তি।

এই সময় চোরবাগানে “চোরবাগান অবৈতনিক থিয়েটার” স্থাপিত হইয়াছিল। কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তি এই থিয়েটারের প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। “উষা অনিচ্ছ নাটক” অভিনীত হয়। এট অভিনয়ে পাণ্ডুরিয়াঘাটার ঠাকুর-বংশের এক শাখা (কামলাল ঠাকুরের দৌহিত্র) হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (৩মছবি হেমেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় নামাভা) ও “আপনার মুখ আপনি দেখ” প্রণেতা ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। চোরবাগানের রুক্মবাহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে (কানাইবাবুদের বাড়ীতে) এই সমিতির অভিনয় হইত। এই অভিনয় দেখিয়া ভোলানাথবাবু হেমেন্দ্রবাবুর নিকট প্রস্তাব করেন, যদি অভিনয় করিতে হয়, তবে এসকল যাত্রার উপযোগী বিষয় অভিনয় করিয়া ফল কি? বাহাতে দেশাচার সশোভিত হয়, এরূপ সামাজিক বিষয়ের অভিনয় করাই উচিত। তাহার পর পরামর্শ দিই হইল, হেমেন্দ্রবাবু অভিনয়ের উদ্যোগ করিবেন, ভোলানাথবাবু একখানি উপযুক্ত পুস্তক লিখিয়া দিবেন। এই স্বত্রে ভোলানাথবাবু “বুঝলে কিনা” গ্রন্থখন লেখেন। এই সময়ে পাণ্ডুরিয়াঘাটা-ঠাকুর-বংশের একশাখা উপেন্দ্রবাহন ঠাকুরের পুত্র অতীন্দ্রনন্দন ঠাকুর স্বীয় বাতীতে (১০নং পাণ্ডুরিয়াঘাটা ষ্ট্রাটে) একটী একতান-বাগানের ২ল গঠন করেন। একদিন অতীন্দ্রবাবুর বৈঠক ভোলানাথবাবু “কিছু কিছু বুঝি” নামে নতুন গ্রন্থখন লইয়া উপস্থিত হইলেন। উহা অভিনয় করাই স্থির হইল। কয়লাঘাটার (রতন সরকার গার্ডেন ষ্ট্রীট, ঘোড়াশীকো) বৈঠকনাথ বল্লভের ডাড়াটিয়া বাড়ীতে (যে বাড়ীতে হেমেন্দ্রবাবুর থাকিতেন সেই বাড়ীতে) অভিনয় করিবার ব্যবস্থা হয়। হেমেন্দ্রবাবু ও অর্কেন্দ্রেশ্বর মুস্তকীর উপর দল গঠনের ভার পড়িল। নাট্যাভিনয় কার্যে অর্কেন্দ্রবাবুর এই হাতেখড়ি। চোরবাগানের কানাইবাবু থেতেটারী হইলেন। ইহাদের সন্ধু বাটারানিহাসী মনুস্বদন মুখোপাধ্যায় নামক একজন অয়েল পেটার, ইহাদের নাট্যশালা চিত্রণের ভার পাইলেন। অতীন্দ্রবাবু, হেমেন্দ্রবাবু বাতীত ৩৭মানাথ ঠাকুরের পৌত্র শমীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহাদের একজন পৃষ্ঠপোষক হইয়াছিলেন। জন্মশঃ এই দলের আয়োজন হইল। মুস্তকী মহাশয়ের বরভঙ্গী ও অম্বকরণপটুতাই তাহার শিক্ষকতার অমূল্য হইল। ১২৭৪ সালের ১৭ কাশিক (১৮৬৭/২৪ নভেম্বর) সন্নিবারে ইহার প্রথমঅভিনয় হয়। মুস্তকী মহাশয়ের সঙ্গে তাহার বাল্যবন্ধু সুপ্রসিদ্ধ রসমকাধাঙ্ক ত্রিভুক্ত ধর্ম্মদাস হুই এই দলে যোগদান করেন। তিনি রসমক নির্মাণের ভারপ্রাপ্ত হন। এই কার্যে তাহারও এই হাতেখড়ি, তিনি ইহাতে ত্রীচরিত্রের অভিনয় করিয়াছিলেন। অভিনেতাদের নাম,—

নট	গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
খড়োতেব্বর	বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়
দত্তবন্ধু	অর্কেন্দ্রেশ্বর মুস্তকী
মুরাদ আলী	" "
চন্দনবিলাস	" "
গুরুদ্বী	শশিভূষণ দা

কলু	বেণীমাধব মিত্র
বিনোদ	যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
চন্দনবিলাসী	ধর্মদাস হর
বরদা	পূর্ণ মৃগোপাধ্যায়
বৈকুণ্ঠী	কান্তিকলাল মিত্র

এতদিন যেখানে যত প্রহসনের অভিনয় হইয়াছিল, এই প্রহসনের অভিনয় সে সমস্ত অপেক্ষা মনোরম হইয়াছিল। এই অভিনয়ে অর্কেন্দুবাবু তিনটি বিভিন্ন অংশের অভিনয়ে বিশেষ কৃতিত্ব প্ৰদর্শন করেন। বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন ভঙ্গীতে সুসঙ্গত প্রকারের অভিনয়ে তাঁহার নিপুণতা এই সময়েই পূর্ণ বিকশিত ও প্রদর্শিত হইয়াছিল। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইচার এক অভিনয়ে উপস্থিত ছিলেন। তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিয়াছিলেন, “মুস্তিকের বাবা মুস্তিকে” অর্থাৎ অন্য সকলকে মাটি করিল। দৃষ্টান্ত মচাশয় ও ধর্মদাস হরের এই প্রথম অভিনয়, এই অভিনয়েই তাঁহাদের জীবনের গতি ফিরিয়া গেল।

এই স্থানে বাঙ্গালার সাধারণ নাট্যসমাজের প্রধান অভিনেতৃগণের ও ব্যাপিগৃহগণের কে কবে প্রথম কোথায় কি অভিনয় করেন, তাহার একটা তালিকা দিতেছি,—

নাম	সময়	পুস্তক	ভূমিকা	স্থান
৷বিহারীলাল	১২৬০	কুলীন-কুল-	স্বীচরিত	চড়কডাঙা
চট্টোপাধ্যায়	ফাস্তন	সর্ব্বত্র		অম্বরাম বসাকের গলি
৷শরচ্চন্দ্র ঘোষ	ঐ	শত্ৰুহত্যা	"	ছাত্তাবাবুর বাড়ী
গিরীশচন্দ্র ঘোষ	১২৭১	নলদময়ন্তী	কনি	বাগবাঙ্গার
(স্থলকায়)				মদনমোহনের বাড়ী
নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১২৭৩	পদ্মাবতী	ককুদী	ভূড়ীপাড়
ভীবনচন্দ্র সেন	১২৭৪ ভাদ্র	"	কলি	বটতলা
অর্কেন্দুশেখর	১৭ কান্তিক	কিছু কিছু	দস্তবন্দ, দুরাণ	কয়লাহাটা
মুস্তকী	১২৭৪	বুঝি	আলী, চন্দনবিলাস	
ধর্মদাস হর	ঐ	ঐ	চন্দনবিলাসী	

গিরীশচন্দ্র ঘোষ (প্রসিদ্ধ নাট্যকার), অম্বতলাল বহু, রাধামাধব কর, মতিলাল হর, মহেন্দ্রলাল বহু প্রভৃতি স্বনামগাত অভিনেতার কেহই এত অধিক পূর্ণ নাটো মিলিত হন নাই।

“কিছু কিছু বুঝি” অভিনয়ে মাইকেল ব্যতীত শরচ্চন্দ্র ঘোষ, গৌরদাস বসাক, কালীপ্রসাদ ঘোষের পুত্রগণ, নবীনচন্দ্র মৃগোপাধ্যায় (খতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ভগিনীপতি) উপস্থিত ছিলেন। এই অভিনয়ে নিম্নলিখিত গানটি গীত হয়—

ওরে নেশাতে ঢুলু ঢুলু করে ছনয়ন।

রাবণ মারিল রামে কীদে দুর্ঘোষন।

না বুঝে করেছি নেশা
 কোথায় আমার রৈল পেশা
 এলোকেশে এলো কেশা, করিবারে রণ ।
 দময়ন্তী ভয়ে কেঁচো,
 পদীরে পেয়েছে পেঁচো
 বিস্তে হল গর্ভবতী, ঠাকুরের লিখন ॥
 শিবের ঘরে কেঁটাল মেয়ে,
 পেঁচার মত রৈল চেয়ে,
 শকুনি ঢাকা গলায় নেয়ে কবুলে পলায়ন ॥
 খেয়েছি অসহ্য মদ,
 দিয়েছি কার লেগে পদ,
 এতো নহে কম বিপদ, কামড়ে মা এখন ॥
 এ কি হল গাঁতের জালা,
 লোকালয়ে বিঘম জালা,
 কানেতে করিল কালা, বিকট বদন ॥

এই গানটি হুপ্রসিদ্ধ “এরে নেশাতে ঢুলু ঢুলু করে দুঃখন, কোথায় রহিল আমার সে বিধু বদন ॥” (ইত্যাদি) গানের সুরে ও তাহারই স্বেষ (Parody) রূপে রচিত । ভোলানাথ বাবুই গানটির রচয়িতা । তখন কবি, পাঁচালী, খেউড়ের আমোদে দেশ পরিপূর্ণ । কবিতায় স্বেষ বিদ্রূপ পাইলে লোক আমোদে নাচিয়া উঠিত । এতদ্ব্যতীত তখন যুবক এবং ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে অতিরিক্ত মজ্ঞপান, বিলাস এবং আমোদের শ্রোত এমন অস্বীকৃত হইয়া পড়িয়াছিল যে, মজ্ঞপান করি না বলিতে লোকে লজ্জাবোধ করিত । এ সময়ে যে সকল নাট্যসম্প্রদায় গঠিত হইত, প্রত্যেক সম্প্রদায়েই মদের শ্রোত বহিয়া যাইত । মদের অকাবর বায় করিতে না পারিলে তখন দল জমান দুকহ হইত । অনেক দলে এই মদের ভরা অভিনয়ের সময়েও অনেক বিশৃঙ্খলা ঘটিত । যখন সেনের জঁচির এই অবস্থা, তখন ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় (ইনি তখনকার খাজা পাঁচালী, তরকার ছড়া ও পালা বাঁধিতেন) গ্রন্থকার হওয়াতে অত্যন্ত ভাবে এই গানটি “কিছু কিছু বুঝি”র দলে গীত হইয়াছিল । গানটিতে পূর্ববর্তী কয়েকটি অভিনয়ের প্রতি কটাক্ষ ছিল, গালি ছিল না ।

“এলোকেশে এলো কেশা” — শ্রীযুক্ত (মহারাজ) যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়ীর নাট্যশিক্ষক কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে লক্ষ্য করিয়া লিখিত ।

“দময়ন্তী ভয়ে কেঁচো” — বাগবাজারের নলদময়ন্তীর অভিনয়ের প্রতি লক্ষ্য ।

“পদীরে পেয়েছে পেঁচো” — বটভায়া পাচকড়ি বা পকানন মিত্রের উত্তোষে দ্বাবতীর যে অভিনয় হয়, তাহার প্রতি লক্ষ্য ।

“বিশেষ হল গর্তবতী ঠাকুরের লিপন” — যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়ীর বিশ্ণুস্বপ্নের অভিনয়ের প্রতি লক্ষ্য।

“শিবের ঘরে কেটার মেয়ে” — শোভাবাজারের রাজা শিবকৃষ্ণের বাড়ীতে কৃষ্ণ-কুমারীর অভিনয়কে লক্ষ্য করিয়া লিখিত।

“শকুনি ঢাকা গঙ্গায় নেয়ে” — ঐ সময়ে গঙ্গার অপর পারে শকুন্তলার অভিনয় এইবার উন্মোচন হইতেছিল। সেই দলের প্রতি স্নেহোক্তি।

“থেকেছি অসহ মদ” — সাধারণতঃ মদ্যপ অভিনেতার প্রতি লক্ষ্য।

“একি হল দাতের জালা” — শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রতি লক্ষ্য।

এই স্নেহের পরিণাম বড় বিষম দাঁড়াইল। কিছুদিন পরে বাগধাজারে রাজবল্লভ-পাড়ায় ৬৭তমাব্দ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীতে একটি নাট্যসম্রদায় গঠিত হয়। হোগল-কুড়িয়ার প্রিয়মাধব বহুমলিক (শোভাবাজারের রাজবাড়ীর অভিনেতা) ইহার শিক্ষক। যদুবাবু নিজেও ত্রিযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়ীর একজন অভিনেতা। এই দলে “রত্নাবলী” ও একখানি প্রহসন অভিনীত হয়। এই প্রহসন প্রিয়বাবুর লিখিত। প্রিয়বাবু একজন লুকাবি ছিলেন, ডাক্তার ও প্রভাকরের কবিতায়ুগে ইহার অনেক কবিতা থাকিত। এতদ্বির যাত্রার পালাবাঁধিয়া দেওয়া, হাফ্ আঞ্চড়াইএর গান বাঁধা প্রভৃতি কার্যে তিনি পটু ছিলেন ও সর্বদা তাহাতে লিপ্ত থাকিতেন। ১২৭৪ সালের শেষার্ধ্বে এই অভিনয় হয়। এই অভিনয়ে (রাজা) শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর উপস্থিত ছিলেন। এই অভিনয়ে প্রহসনের মধ্যে দুইটি গান ছিল,—

আমি থিয়েটারের হিষ্ট্রী।

ঐশ চন্দ্রা নাকে দিয়ে গো,

দেখি ঐশকমের মিস্ত্রী।

রান্না রান্না ছেলেগুলি সপি সাজে সব

করে নারীর মতন রব

তাদের আকার দেখলে আশ্চর্য গুড্রুম

ইচ্ছে হয় কিস্ করি।

• • • • •

জয়খুড়োর বাড়ীতে মাঝে হল একটা ঘুম,

তনে হয় নি রেতে ঘুম,

এল রাজার বাড়ীর বৃন্দো হন ইন্দ্রনীলের সাজ পরি।

দুকাণ কাটা বিদূষক সে লাড়েলি সরকার,

ডিস্‌বাণ্ডেড মদনিকা কলি অবতার,

এই পাচপেচোতে পোয়য় পেলে

বল একবার হরি হরি ॥

ও তোর কেলো তুলোর মুলো।

অথরামে জলে মরি ॥

পানের খিলির দোকানেতে হল একটা একুট

বলছি তারই ক্যান্ট

হল যুগীর পোলা দময়ন্তী

এমন পিছেটারে গড় করি ॥

“কিছু কিছু বুঝি”র গানের উত্তর দিতে গিয়া প্রিয়মাদব যন্ত্রিক এই গানে বিশেষ কিছু বলেন নাই, বরং ভোলানাথবাবুর গানে যে গানি ছিল না, এখানে সেই গানি — অতি অসভ্য গানি প্রবেশ করিয়াছে।

“গ্রীণরুমের মিট্রী” — অবশ্য গ্রীণরুমো (সাফরোর) ভিতর অভিনেতাদিগের মদের জটলার কথা।

“রাঙ্গা রাঙ্গা হেলেন্ডলি” — হেলেন্ডলির মাথা পাওয়ার কথা বলিলে ক্ষতি হইত না, কিন্তু “তাবের আকার” বেশিরা “কিন্” করিবার ইচ্ছা অভ্যস্তচিত্ত অসহ্য কুক্ষি মাত্র।

“জয়ধ্বজের বাড়ীতে” — এষ্ট সময় ৬জয়রাম মিত্রের বাড়ীর পদ্মাবতীর অভিনয়।

“এল রাজার বাড়ীর বুড়ো হনু” — শোভাবাজার রাজবাড়ীর অভিনেতা প্রাণকুমার ঘোষের প্রতি গানি। বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় এই পদ্মাবতীতে ইঞ্জিনীলের অংশ লইয়াছিলেন।

“রাজার বাড়ীর বিদুষক” — শোভাবাজার রাজবাড়ীতে কৃষ্ণকুমারীর অভিনয়ে ধনদাসের অংশ মণিমোহন সরকার অভিনয় করেন। প্রথমতঃ এই অভিনয় প্যারীমোহন দাসের করিবার কথা হইয়াছিল, তিনি কাঁসারীপাড়ার দলে যোগদান করায় মণিবাবু অভিনয় করেন। মণিবাবুর প্রথমে “মদনিকা” অভিনয়ের কথা ছিল। এই ঘটনার উল্লেখ এষ্ট গানে ডিন্‌ম্যাওড মদনিকা বলা হইয়াছে।

“ও তোর কেলো তুলোর মুলো” — ইহা অতি অশ্লীল কুংসিত রসিকতা। তুলো — ভোলানাথবাবু।

“পানের খিলির দোকানেতে” — বাগবাজারের নলদময়ন্তী অভিনয়ের প্রতি লক্ষ্য। এই দলে শেষে শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরিবর্তে কপূর্ণিমাটোলা-নিবাসী যুগ্মদিগের একটি বালক দময়ন্তীর অংশ অভিনয় করিত।

এই প্রহসনে প্রিয়বাবুর আরও দুইটা গান ছিল,—

১। ওরে হায়রে দেশের পিয়েটার।

আগে পদ্মফুলের মতন তোমার শোভা ছিল চমৎকার।

কয়লাহাটার ময়লাহাটায় হল তোমার ঠাই,

কি ছিলে কি হলে তুমি মনে ভাবি তাই,

পড়ে হাড়হাণাতে তুলোর হাতে

গেলে তুমি ছারখার।

২। 'ভালা ভালা ভালা মোর বাপ'রে।

তুই গোড়ার দলে কপনি পরিস, আপনি কলির কাপ'রে।

রাজার বাড়ী বুঝলে কিনা,

ও তার বুদ্ধি কাচকলা, ও তোর আর না ওগ বলা,

কিছু কিছু বুদ্ধি বলে, লাগলো তোর হাপ'রে।

এ গানটিও কেবল গালাগালি। কেহ কেহ বলেন, এই গালাগালি তিনিয়া ত্রিযুক্ত শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর সঙ্গীত হইয়াছিলেন, তাহা সত্য নহে। একপ ওগপনাহীন গালাগালিপূর্ণ গানে রাজা সার শৌরীন্দ্রের ছায়া রসজলোকের তৃপ্তি হইতে পারে না। বাগ-বাঝারের এই রত্নাবলীর অভিনয়ে নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনয় করেন। শ্রীধা-নাথব করের একতান-বানন-সম্প্রদায় বাঝাইয়াছিল।

এই সময়ে জগদ্রাম বধাকের বাড়ীতে "ভালারে মোর বাপ" নামক প্রহসন অভিনীত হয়।

এই সময়ে বহুবাজারে একটা নাট্যসমাজ গঠিত হইয়াছিল। এই সম্প্রদায় প্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীযুক্ত মনোমোহন বহুর "শতী নাটক" ও "রামাভিষেক" নাটক অভিনয় করেন।

বাজারে নাটকের এই আর এক যুগ। ইহার প্রথম যুগে "কুলীন-কুলসর্গৎ" ও "শকুন্তলা", দ্বিতীয় যুগে "পদ্মাবতী" এবং তৃতীয় যুগে "রামাভিষেক নাটকে"র অভিনয়ের গ্রাহ্যতা হইয়াছিল। রামাভিষেক নাটকের অভিনয় কলিকাতার দক্ষিণ বিভাগে সে সময়ে অনেক স্থলে ঘটিয়াছিল। এমন কি দক্ষিণাংশে এইখানি নাট্যমোদের একমাত্র অবলম্বন স্বরূপ হইয়া পড়িয়াছিল। কোন রসজ্ঞ ব্যক্তি এইজন্য ইহাকে "বর্ণপরিচয়-নাটক" বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন।

যাহা হউক বাগবাজারের রত্নাবলীর দল ডাকিয়া গেলে নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রামাধিবর আবার বাজনার দল লইয়া পড়িলেন, কিন্তু তখন তাঁহাদের আমোদের কুখ্যার বাজনাঘ মিটিতেছিল না। সহরের সর্বত্র বাগবাজারের বাজনার দলের স্রাব্যতা বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, কাজেই তাহা পুরাতন বোধ হইতে লাগিল। আমোদের নতুন নতুন হইলে আর তৃপ্তি হইতেছিল না ও ভাল লাগিতেছিল না। এই অবস্থায় নগেন্দ্রবাবু নিজে একটা খিয়েটারের দল বসাইবার পরামর্শ করিলেন। বাগবাজার হরলাল মিত্রের গলিতে (মুখ্যে পাড়ায়) ত্রিযুক্ত অরুণচন্দ্র হালদারের বাড়ীতে প্রথমে দল বসিল। নগেন্দ্রনাথের বাজনার দলের কেহ কেহ এই দলে যোগ দিলেন। ইহার বন্ধুবান্ধবের মধ্যে নাট্যাভিনয়ে কৃতকর্ম্য তখন এক নগেন্দ্রনাথ নিজে আর তাঁহার বাল্য-বন্ধু অর্কেন্দ্রশেখর মুখার্জী এবং ধর্মদাস সূর। নগেন্দ্রনাথ কয়লাহাটার খিয়েটারে এই দুই বন্ধুর কৃতিত্ব ও বশ দেখিয়া তিনিয়া আসিয়াছিলেন। অর্কেন্দ্রবাবুর শিক্ষকতার প্রাশংসা তখনই মাইকেলের ছায়া ব্যক্তিবর্গের যুগে ধরিত না, সুতরাং নগেন্দ্রবাবু তাঁহাকেই শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। কয়লাহাটার দল দেখিয়া নগেন্দ্রনাথ

আরও বৃদ্ধি। আসিয়াছিলেন যে, বিশেষ কোন ধর্মীয় আশ্রয় না পাউলেও, তাঁহার আপনাতঃ চেষ্টা করিয়া একটা থিয়েটারের হল চালাইতে পারিলেন এই ভরসায় তিনি নিজেরা বাজনার দল হইতে ন্যেক সংগ্রহ করিয়া দল বসাইলেন। ধর্মসাম হর, রাধা-মাধব কর, মহেশ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, আপাল বিবাস, টেশানচন্দ্র নিয়োগী, অক্ষয়চন্দ্র হালদার, মহেশ্রনাথ দাস, নগেশ্রনাথ পাল, নীলকণ্ঠ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি এই দলে যোগ দিলেন। অর্দ্ধেকশেষের মৃত্যু তখন অল্প কক্ষে ব্যাপ্ত থাকায় নগেশ্রবাবুর আগ্রহ সবেও আশা পূর্ণ হইল না, তিনি যোগ দিতে পারিলেন না। শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ নগেশ্রনাথের আর একজন বাল্যবন্ধু। গিরিশবাবু ইহারের অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ও বিখ্যাত বলিয়া নগেশ্রনাথ তাঁহাকেও এই দলে আঙ্গান করিলেন। নাট্যশালায় সহিত গিরিশবাবুর লব্ধ এইরূপে প্রথম স্থাপিত হয়। নগেশ্রবাবুর ঘটটা আশা ও সাহস ছিল কারো নামিয়া ততটা কল পাইলেন না। অর্থাৎ বন্ধুবান্ধবের নিকট তেমন সাহায্য পাইলেন না, কাজেই যে সকল নাটকে রাজা রাণী ইত্যাদি সাজিবার প্রয়োজন, পোষাক পরিচ্ছদের ব্যয় মিলাবে না বলিয়া সে সকল নাটক পরিত্যক্ত হইল। শেষে গিরিশবাবুর পরামর্শে দীন-বন্ধু বাবুর নব প্রকাশিত "সধবার একাদশী" অভিনয় করা হইল। নগেশ্রবাবুও কৃত-কর্ম্য ব্যক্তি, তিনিই প্রথমে শিকড়ার লইলেন, কিন্তু কার্যকালে তাহা গিরিশবাবুর একচেটে পড়িল। গিরিশবাবুর নির্বাচনে এইরূপ পাত্র বিভক্ত হইল,—

নিমটার	শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ
অটল	নগেশ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়
নকুড়	শ্রীমহেশ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়
কাকন	শ্রীরাধামাধব কর
জীবনচন্দ্র	টেশানচন্দ্র নিয়োগী
কেনারাম	শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র হালদার
রামমাণিকা	নীলকণ্ঠ গঙ্গোপাধ্যায়
কুহুনি	আপালচন্দ্র বিবাস
দৌদামিনী	মহেশ্রনাথ দাস
নটী	নগেশ্রনাথ পাল

দীনবন্ধুবাবুর লেখায় নটনটী লইয়া একটা প্রস্তাবনা ছিল না। তখনকার প্রথার উপর নির্ভর করিয়া গিরিশবাবু নটনটী দিয়া একটা প্রস্তাবনা লিখিয়া দেন। ক্রমে শিক্ষা চলিতে লাগিল। ১২৭৫ সালের আষাঢ় বা আশ্বিন (১৮৬৮ জুন বা জুলাই) মাসের এক-দিন ইহার। পুরা নাটকখানির আখড়াই দিবেন স্থির করিলেন। ঘটনাক্রমে সেই সময়ে শ্রীঅর্দ্ধেকশেষের মৃত্যুর সহিত নগেশ্রবাবুর দেখা হয়। তিনি মহা আনন্দে ও আগ্রহে তাঁহাকে আখড়াই দেখিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। বধাসময়ে আখড়াই আরম্ভ হইল। নগেশ্রবাবুর বাড়ীতে বৈঠকখানার হলে একা অর্দ্ধেকবাবু দর্শক বা শ্রোতা আর তাহার

পাশবর্তী চৌকিরের দরজার সম্মুখে অভিনেতার উপস্থিত হইয়া আশুতি করিতে লাগিলেন। যথাকালে অভিনয় শেষ হইল। গিরিশবাবু আদিয়া অর্কেন্দ্রবাবুকে ধোবন্ত বিচার করিতে বলিলেন। অর্কেন্দ্রবাবু বলেন — অটল, নিমটাল ভাল হয়েছে, আর কিছু ভাল হয় নাই, ভীষনচন্দ্র একেবারে পারাপ হয়েছে। ইহাতে অনেকেরই মতের মিল হইল। নগেন্দ্রবাবু ও গিরিশবাবু মহা আগ্রহে অর্কেন্দ্রবাবুর সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। অর্কেন্দ্রবাবু সেসকল একরূপ প্রস্ততই ছিলেন, প্রস্তাব হইয়ামাত্র তিনি সন্মত হইলেন। নগেন্দ্রবাবু অর্কেন্দ্রবাবুকে শিক্ষাভার লইতে বলিলেন, তিনি স্বীকৃত হইলেন এবং কয়টির অংশ বরলাইয়া দিলেন। রামমাণিক্যের অভিনেতা নীলকণ্ঠ গঙ্গোপাধ্যায় নিজে বিকল্প-পুরানারী হইলেও নাটকের ভাব দিকাল করিতে পারিতেন না। অর্কেন্দ্রবাবু এই রাম-মাণিক্যের অংশ রাখামাধব করকে এবং কাঞ্চনের অংশ নন্দলাল ঘোষকে, কুমুদিনীর অংশ অবুতলাল গুপোপাধ্যায়কে ("কাপ্তেন বেল" নামে উত্তরকালে ইনি পরিচিত হন। [দিলেন] এবং নিজে কেনারামের অংশ লইলেন।

এই সময়ে আখড়াইএর আড্ডা অংশবাবুর বাড়ী হইতে উঠিয়া ২৮নং হরলাল মিত্রের দ্বীপে যায় এবং কিছুদিন পরে সেখান হইতে ৫৭নং রামকান্ত বহুর দ্বীপে নগেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে যায়। এই সময়ে শিক্ষাদানকাণ্ডটা গিরিশবাবু ও অর্কেন্দ্রবাবুর মধ্যে ভাগাভাগি হইয়া চলিতে লাগিল। উভয়েই শিক্ষা দেন। গিরিশবাবু তখন এটকিলন্ টিল্টনের বাড়ীতে নিজ জ্ঞানক প্রকাশ দেবার অধীনে কার্য্য করিতেন। তাহার অবসর অল্প ছিল। অর্কেন্দ্রবাবুই প্রকৃত প্রস্তাবে শিক্ষাদাতা ছিলেন, তিনি আখড়ায় সর্বদা উপস্থিত থাকিতেন এবং যখন যাহাকে পাইতেন, তখনই তাহাকে শিক্ষা দিতেন। অর্কেন্দ্রবাবু ১৩০৭ সালের এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, — "আমি আমার বুদ্ধি বিবেচনা অহুসারে প্রত্যেক অভিনেতাকে অভিনয়ের ধরনধারণ, ভাবভঙ্গী, চলাফেরা ইত্যাদি ব্যাপারগুলি স্বচ্ছভাবে শেখাতে লাগলুম। যা দেখেছিলেন, তাতে এইগুলোরই বেশী অভাব ছিল।" ক্রমে দল বেশ সাজিত ও লিপ্ত হইয়া উঠিল। ১২৭৫ সালের আখিন (১৮৬৮ অক্টোবর) মাসে পূজার সময় সপ্তমীপূজার দিন রাত্রিতে মুখ্যো পাড়ার গোপাল নিয়োগীর গলিতে ৬ প্রাণকণ্ড হালদারের বাড়ীতে এই দলের প্রথম অভিনয়ের নিমন্ত্রণ হয়। এই সময় দলের নাম The Bagbazar Amateur Theatre রাখা হয়।

এই সময়ে জাম্বাজারের ৯নবন্ধক নিয়োগীর পুত্র হুপ্রসিদ্ধ বাঈ বাজিয়ে ত্রিলাক্সে নাম নিয়োগী একটা একতান-বাগনের দল বসাইয়াছিলেন। ইহারাই বাজাইবার জগ নিবন্ধিত হন। যথাসময়ে অভিনয় হইল, কিন্তু এই রাত্রিতে কতিপয় অভিনেতা উচ্ছ্বাস হইয়া পড়ায় অভিনয় ভাল হয় নাই। তাহার পর কোকাগরী পুণিমায় রাত্রিতে গিরিশবাবুর বঙ্গরাজ্যে অভিনয়ের ব্যবস্থা হইল। এই অভিনয়ে অর্কেন্দ্রবাবু, গিরিশবাবু, নগেন্দ্রবাবু ও রাখামাধববাবু বিশেষ সূখ্যাতি লাভ করেন। এই অভিনয়ের পর রত্নমক ঘেরামতি হিসাবে ৪০ টাকার গোলমাল হয়। সেই গোলমাল লইয়া গিরিশবাবু রত্নমক আটকাইয়া রাখেন। এই সময়ে গিরিশবাবুর সহিত সমগ্র দলের

বিবাদ হয় এবং গিরিশবাবু দল ছাড়িয়া গেলেন। এই অভিনয়ের পর গড়পারে অপরাজিতের বাড়ী ইংল্যান্ডের তৃতীয় অভিনয় হয়। এই অভিনয়ের জন্য রঙ্গমঞ্চের অভাব হয়। শিবপুরে তখন রঙ্গমঞ্চারীরা অভিনয় হইত। সেই দলের রঙ্গমঞ্চ ক্রয় করিয়া আনিয়া অভিনয় করা হিত হয়। গিরিশবাবু এই সংবাদ পাইয়া নিজে আসিয়া নিমিষ্ঠান অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হইলেন। খলাসময়ে অভিনয় হইয়া গেল। ১২৭৫ সালের মাঘ মাসে দশমী পূজার দিন (১৮৬২ কেরকারী এই সম্প্রদায়ের ৬র্থ অভিনয় তোলা-পানার দেওয়ান ৮রায় রামপ্রসাদ মিত্র বাসাজুরের বাড়ীতে হয়। এই অভিনয় বিশেষ রূপে উল্লেখযোগ্য। এইদিন ইহাদের রঙ্গমঞ্চের মুখপটের উপর লেখা হইয়াছিল, "He holds the mirror up to nature"। এইদিন অভিনয়ে আরও অভিনেতা পরিবর্তন হইয়াছিল,— অর্কেন্দ্রবাবু জীবনচন্দ্রের ও অনিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কেনারামের অংশ লইয়াছিলেন, আর সপ ঠিক ছিল। এইদিন দর্শকের মধ্যে প্রথকার দীনবন্ধুবাবু উপস্থিত ছিলেন। তিনি অভিনয় দেখিয়া এত সন্তুষ্ট হন যে গিরিশবাবুকে তাহার নিমিষ্ঠান অভিনয়ের প্রশংসা করিয়া বলেন, নিমিষ্ঠান কোন তোমার জন্যই লেখা হইয়াছিল। ২য় দৃশ্যের পর যখন জীবনচন্দ্র "আমি তোকে ত্যাক্সাপুত্ব করেন" বলিয়া প্রস্থান করে, অভিনেতা অর্কেন্দ্রবাবু সেই সময় অটলক্ষে একটা হুঁ পদাঘাত করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। ইহাতে দীনবন্ধুবাবুর এবং সমগ্রদর্শকের মধ্যে এত হুল্লর ভাবোদয় হইয়াছিল যে, দীনবন্ধু অভিনয়ের পর জীবনচন্দ্রের অভিনেতাকে দেখিতে চাহেন এবং দেখিয়া বলেন, "আপনি ব্রাহ্মণ পায়ের ধূলা দিন, You have improved the author." সদস্যরা একাদশীর ২য় সংস্করণে আমি ২য় দৃশ্বে এই পদাঘাতটুকু লিখিয়া দিব।" এই দিনই দীনবন্ধুবাবুর "বিয়ে পাগলা বুড়ো"ও ইহার অভিনয় করেন।

রাণীমুখোপাধ্যায়	শ্রীঅর্কেন্দ্রেশ্বর মুস্তফী
রতানাশ্রুত	শ্রীরাধামাধব কর
পেঁচোর মা	গোপালচন্দ্র দাস
কনের ভগিনী	৮শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শিবাবাবুর এই প্রথম অভিনয়। গিরিশবাবু একটা কবিতায় ইহার একটা প্রস্তাবনা লিখিয়া দিয়াছিলেন, তাহা রঙ্গমঞ্চে পঠিত হইয়াছিল। তাহার পর এই সম্প্রদায়ের আর পাচটা অভিনয় হয়। ৬ষ্ঠ অভিনয় হয় বিদ্যাপুরে নন্দলাল ঘোষের বাড়ীতে দুর্গা পূজার সময় (১২৭৬ আশ্বিন ১৮৬১ অক্টোবর)। ইপ্রসিদ্ধ অভিনেতা মহেন্দ্রলাল বসুর সহিত এই অভিনয় উপলক্ষে এই সম্প্রদায়ের আলাপ হয়। মহেন্দ্রবাবুর নিকট একটা পেশোয়ার ছিল, কাকনকে পরাইবার জন্য, ইহার। তাহা চাহিয়া লয়েন।

প্রস্তাবনাটি এই—

হাত লাম্বীটে ফুরিয়ে গেল, দেখুন বুড়োর রঙ ।
বাসরঘরে টোপর প'রে কিবা বিয়ের ঢঙ ॥

আয়না নলে, রতা কোথা যা পারিস তা বল ।

কমা করিবেন দোষ, রসিক মওল ।

আসছে এবার ছোড়ার দল, তুবনো নশে রতা ।

সভাগণ নমস্কার, চুরানো আমার কথা ॥

এই সময়ে আর একটা ঘটনা ঘটে ছিল । বহুপাড়ায় গতিনাথ দত্তের বাড়ীতে একটা সাথের যাত্রার দল ছিল । সেখানে শম্ভিটার পালা গাওনা হইত । এই যাত্রার দলের এক ব্যক্তি একদিন অর্ধেন্দুবাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলেন — “এত আর রঙে গোলাক পরে, রঙ করা পরদার আড়াল থেকে শুনে শুনে চীংকার আর লাফালাফি করা নয়, এতে রীতিব্রত নাচগান বাজনা হ্রর ভাল জানা চাই,” অর্ধেন্দুবাবু উত্তরে বলেন — “বেশ আঙ হতে ১৫ দিন পরে তোমাদের এই নাচগান হ্রর ভাল গওয়া যাত্রা শুনিয়ে দেব, কিন্তু তোমরা এক মাসে আমাদের মত একটা থিয়েটার কর দেখি ।” সেইদিনই নগেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে যাত্রা করার পরামর্শ ঠিক হইয়া গেল । মণিমোহন সরকারের “উষা-অনিরুদ্ধ” নাটকে গান জুড়ে পালা বাধা হইল । গিরিশবাবু ২৬ থানা গান বেঁধে দিলেন । ঠনঠনিয়ানিবাসী নিতাইচাঁদ চক্রবর্তী ইহাদের দলে বাজিয়ে হলেন । বর্তমান আমোদ-পুরের স্বগায়ক উমাচরণ চক্রবর্তী ও তাহার ভাগিনেয় কথক দুর্লভচন্দ্র গোস্বামী এই দলে জুড়ীর গায়ক হলেন । হিঙ্গুল থা নাচগান শিখাইতে লাগিলেন । ১৫ দিনের মধ্যে পালা প্রস্তুত হয়ে গেল । মহেন্দ্রবাবুর নিকট যাত্রার উপযুক্ত পোশাক ছিল । নগেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে ১২৭৬ সালের স্বগন্ধাজী পূজার পর এই যাত্রার প্রথম আসর গাওনা হয় । এই যাত্রার দলের অজুঠানের সময় প্রসিদ্ধ অভিনেতা মতিলাল হ্রর এই দলে যোগ দেন । এই যাত্রা গাওনার দিনে শম্ভিটার দলও বহুপাড়ার মাঠে শম্ভিটার এক আসর গাইলেন, শেষে উভয় দলে সঙ্ঘ দিবার ছলে গান বেঁধে উভয় দলকে রেল বিক্রয় করেন । তাহার পর চার পাঁচ আসর যাত্রার গাওনা হইয়া যাত্রার দল বন্ধ হইয়া গেল । ইহার পরও দু একবার সধবার একাদশীর অভিনয় হইয়াছিল । এই সকল অভিনয়ে গাণবাজার অবৈতনিক নাট্যসম্প্রদায়ের সহিত গিরিশবাবুর কোন ঘনিষ্ঠতা ছিল না । তিনি নিমটাদের অংশ মাত্র অভিনয় করিতেন । পুর্নোক্ত শম্ভিটা যাত্রার গানগুলিও গিরিশবাবুর রচিত এবং ইহাই তাহার প্রথম রচনা । কিছুদিন পরে অর্থাভাবে ঐ নাট্যসম্প্রদায় ভাঙ্গিয়া যায় ।

যখন “কিছু কিছু বৃক্ষ”র অভিনয় হয়, সেই সময় মাইকেল মধুসূদন দত্ত অর্ধেন্দুবাবুকে টিকিট বেচিয়া থিয়েটার করিতে অহুরোধ করিয়াছিলেন । এখন অর্থাভাবে দম গেল দেখিয়া অর্ধেন্দুবাবু টিকিট বেচিয়া অভিনয় করিবার উদ্দেশে আবার দল গড়িতে উত্তোপ করিতে লাগিলেন । এই দলে অর্ধেন্দুবাবু “লীলাবতী” অভিনয় করিবেন বলিয়া শিক্ষা দিতে লাগিলেন । নগেন্দ্রবাবুর বাড়ীতেই আগড়াই চলিত, নিয়মমত চলিত না । অল্পে অল্পে কার্য অগ্রগত হইতে লাগিল । শেষে একটা দুঃসাধ্য ব্যাপার উপস্থিত হইল । “অরবিন্দ” ও “যোগদীবন” সাক্ষিবার উপযুক্ত একাকৃতি দুইটি লোকের আবশ্যক হইল ।

সহজে তেমন লোক পাওয়া গেল না। সে অহুঃসাহের সব্বায় তেমন আগ্রহ করিয়া খোঁজাই বা কে? কাজেই খেটু কু আখড়াই চলিতেছিল, তাহাও বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল।

এই সময়ে শ্রামপুত্রে ব্রজনাথ দেব (গিরিশবাবুর জালক) নিজ বাড়িতে একটা থিয়েটারের দল বসাইয়া, অর্ধেন্দুর হস্তে তাহার শিক্ষাভার দিলেন। গিরিশবাবুর সহিত এই দলের সংগ্রহ ছিল না। কৃষ্ণকুমারীর আখড়াই চলিতে লাগিল। ব্রজবাবুর সংস্কল্প ছিল, কোন স্থানে একটা রঙ্গমঞ্চ স্থায়ীভাবে বান্ধিয়া নিয়মিতভাবে অভিনয় চালাইবেন। ব্রজবাবু তখন জন-এটকিন্সনের বাড়ীর বুককিপার ছিলেন। সেপানকার দালানদের নিকট হইতে টাঙ্গা তুলিয়া এই উদ্দেশ্যে কিছু টাকাও তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই অর্থে শ্রামপুত্রে নগোপাধ্যায়ের বাড়ীর উঠানে স্থায়ী মঞ্চের আয়োজন হইতে লাগিল। পাটাতন পর্য্যন্ত হইলে ব্রজবাবু সাম্মান্তিক নীড়ায় শয্যাগত হইলেন, সব বন্ধ হইয়া গেল।

ব্রজবাবুর দল ভাঙিতে ভাঙিতে শ্রামপুত্রে যুবকদিগের আগ্রহে সেই দল হইতেই লোক সংগ্রহ করিয়া এক যাত্রার দল বসান হয়। অর্ধেন্দুবাবুও যোগ দিলেন। তাহার আগ্রহে নিতাই চক্রবর্তী, উমাচরণ চক্রবর্তী, দুর্ভাষা গোস্বামী, হিঙ্গুল গা প্রভৃতি গাইয়ে, নাকিয়ে ও নাচিয়ে ওহাদেরা যোগ দিলেন। পাথুরেঘাটার রাজবাজার বিজ্ঞানভবনের বিনি মালিনী সাজেন, সেই কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা “শকুন্তলা” প্রথমণ্ডা ওনা চয়। তাহার পর এই দলে “দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ” গাওনা হইয়াছিল। তাহার পর উমাচরণ চক্রবর্তীর সাহায্যে আমোদপুরের যাত্রার সাট নীতার বনবাস আনাইয়া গাওনা হইয়াছিল। এই যাত্রার দল ও ইহার পূর্ববর্তী উবা অনিচ্ছক যাত্রার দলে এই সকল থিয়েটারের অভিনেতারা এবং অর্ধেন্দুবাবু শিক্ষক থাকায় যাত্রার ঘটকালীর বা বক্তৃতার স্বর বদলাইয়া সহজভাবে বা থিয়েটারী ঢঙে কতকটা পরিবর্তিত হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার পর যাত্রার দল ভাঙিতে থাকে।

যখন এই শকুন্তলা যাত্রার দল বাগবাঙ্গারে চলিতেছিল, সেই সময়ে চড়কভাষায় অন্নরাম বসাকের বাড়ীতে আবার একটা থিয়েটারের দল বসে। সেখানে ভোলানাথ নগোপাধ্যায়ের রচিত “ভালারে মোর বাপে” নামক প্রহসন অভিনীত হইবে বলিয়া আখড়াই চলিতেছিল। অবশেষে এই দল আহীরীটোলায় জনাইএর নগোপাধ্যায় মহাশয়দিগের বাড়ীতে উঠিয়া যায়। অতুলচন্দ্র নগোপাধ্যায় ও পূর্ণচন্দ্র নগোপাধ্যায় এই দলের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১২৭৬ সালের দোলের রাত্রিতে (১৮৭০ ফেব্রুয়ারীতে) নগোপাধ্যায়দিগের বাড়ীতে ইহার অভিনয় হয়। নগেন্দ্রবাবু ও রাধামাধবাবু এই অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন। ইহা দেখিয়া আসিয়া তাহার। “ভালারে মোর বাপে”র উত্তর দিবার জন্য একটুকু থিয়েটারের দল গঠন করেন। “রত্নাবলী”র আখড়াই আরম্ভ হয়। প্রিয়মাধব বসু হরিক “ভালারে মোর বাপে”র উত্তরে এক প্রহসন লিখিয়া দেন। অর্ধেন্দুবাবু তখন যাত্রার দলে নিবিষ্ট ছিলেন, এই ক্ষুদ্র থিয়েটারের দলে যোগ দেন

নাই।^১

এই রত্নাবলীর অভিনয় বাগবাজার রাজবল্লভ পাড়ায় হয়। শ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর দর্শক ছিলেন। শ্রিয়বাবুর প্রহসনে ডোলানাথবাবুর নাথে স্নেহাত্মক গান ছিল। ডোলানাথবাবু তত্বতরে প্রডাক্ট করে শ্রিয়বাবুর নামে কবিতা লিখিতেন। শ্রিয়বাবুও প্রডাক্টরেই আবার তাহার উত্তর দিতেন। শ্রিয়বাবুর কবিতাই বেশী সরস হইত।^২

অর্কেন্দুবাবু দুইবার যাত্রা করিয়া এই সময়ে বাজনার প্রতি একটি বেশী আকৃষ্ট হইয়া পড়েন এবং শকুন্তলার যাত্রার দল ডাকিয়া গেলে, প্রথমে ধর্মদাসবাবুর বাড়ীতে তাহার পর ১৭২নং আপার চিংপুর রোডে একটি একতান-বাদনের দল গঠন করেন। নগেন্দ্রবাবু, রাধামাধববাবু, ধর্মদাসবাবু, হিন্দুল থা, নন্দবাবু, যোগেন্দ্রবাবু এই দলে যোগ দেন। এই বাজনার দলেও অর্কেন্দুবাবু একটা নৃতন প্রথা প্রবর্তন করেন। এতদিন যত কন-সার্টের দল হইয়াছে সবাই “ডি” হয়ে বাজাইত। অর্কেন্দুবাবু নিজের দলে একবারে “এফ” বাজনার প্রথা প্রবর্তন করেন। চড়াহুরে বাজাইবার খাতিরে এই দলের বিশেষ আদর ছিল। ১২৭৭ সালের রাসপূর্ণিমার দিন শোভাবাজার বেণেটোলায় কাকিচন্দ্র ভট্টাচার্যের বাড়ীতে হাওড়া ব্যাটারার এক নাট্য-সম্প্রদায় “প্রভাবতী” অভিনয় করেন। “প্রভাবতী” সেকেন্দ্রিয়ারের “মার্কেট অফ ভিনি” অবলম্বনে লিখিত। এই অভিনয়ের সঙ্গে অর্কেন্দুবাবুর এই বাজ্যসম্প্রদায় বাজাইয়াছিলেন। এই সময়ে হাটখোলার প্রসিদ্ধ মহাজন ব্রজেন্দ্রকুমার সাহা ওরফে দিগু সাহার গদীর কর্ণচারী শ্রীগোবিন্দনাথ গঙ্গোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তির সহিত নাট্যসম্প্রদায়ের আলাপ হয়। আখড়ার খরচ চালাইতে স্বীকৃত হওয়ায় অর্কেন্দুবাবু আবার থিয়েটারের দল গড়িতে প্রবৃত্ত হইলেন।

পূর্বে যে হরলাল মিত্রের ট্রুটে শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র হালদারের বাড়ীতে বাগবাজার “অবৈতনিক নাট্যসম্প্রদায়” সধবার একাদশীর আখড়া দিতেন, সেই ট্রুটের ২৮নং বাড়ী গোবিন্দবাবুর খণ্ডর বাড়ী। ইহার উত্তর পূর্বে কোণে বড় বৈঠকপানায় এবার দল বসিল। এই দলের প্রতিষ্ঠাতা নগেন্দ্রবাবু, অর্কেন্দুবাবু, রাধামাধববাবু ও ধর্মদাসবাবু। এইবার যে দল বসিল, ইহাই স্থপরিচিত দ্রাশ্যশালা থিয়েটারের মূল।

এই দলের প্রতিষ্ঠাতা চারিজন ব্যক্তিত্ব “সধবার একাদশী”র সময়কার হিন্দুল থা, যোগেন্দ্রবাবু প্রভৃতি সকলেই যোগ দিলেন। কেবল গিরিশবাবু যোগ দিলেন না। উবা অনিরুদ্ধ যাত্রা হইতে মডিলাল হুর এবং সধবার একাদশীর অভিনয়ের সময় হইতে মহেন্দ্রলাল বহু ইহাদের সহিত মিশিয়াছিলেন, তাহারও এই দলে রহিলেন। এতদ্বির বদুনাথ ভট্টাচার্য, শ্রীক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, কাকিচন্দ্র পাল

১ এই প্রবন্ধের পূর্বে “সিদ্ধ কিত্তি হুরি” অভিনয়ের পর বাগবাজার রাজবল্লভ পাড়ায় শ্রিয়বাবু বহু মন্ত্রকের যাত্রা “সঙ্গবলী” অভিনয়ের যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা ভুল। ১২৭৬ সালের এই অভিনয়ের কথাই ভুলিয়া দেখানে লেখা হইয়াছে। ইহা অর্কেন্দুবাবুর ১৩৭৭ সালের বক্তৃতায় ঘোষণা হইয়াছিল।

২ এই অভিনয়ের বিবরণ ও গীতিগুলি পূর্বেই এই প্রবন্ধেই প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রভৃতি কতকগুলি নতুন লোক এই দলে যোগ দিলেন। ধর্মদাসবাবু বিশেষ উৎসাহে কার্য্য পট্টচালনা করিতে লাগিলেন। ১২৭৭ সালের পৌষ মাসে (১৮৭১ সালের প্রথম) এই দল বসে। অর্দ্ধেন্দুবাবু শিক্ষাদাতা হইলেন। লীলাবতীর আপড়াই চলিতে লাগিল।

গোবিন্দবাবু যে সাহায্য করিতেন, তাহাতে আপড়া পরচ চলিত মাত্র। তাহাতে রঙ্গমঞ্চ বা পোষাক পরিচ্ছদাদি হইবার আশা ছিল না, স্বতরাং অর্দ্ধেন্দুবাবু প্রস্তাব করিলেন, এরকমে অর্থ নষ্ট না করিয়া, কোন টের ডাড়া করিয়া আনিয়া টিকিট বেচিয়া অভিব্যক্তি করা হউক। বিক্রয়ের অর্থে শেবে কোথাও একটা স্থায়ী মঞ্চ প্রস্তুত করা যাইবে। এই পরামর্শ গৃহীত হইল। অবশেষে ১২৭৮ সালের বৈশাখ (১৮৭১ এপ্রিলে) নগেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে একদিন পরীক্ষার্থে অভিনয় (Dress-Rehearsal) হইল, এই অভিনয়ে ধর্মদাসবাবুই লনিজের অংশ অভিনয় করিয়াছিলেন। অভিনয়ের স্থপাত্তি রাষ্ট্র হইলে গিরিশবাবু আসিয়া যোগ দিলেন। টিকিট বেচিয়া অভিনয় করার প্রস্তাবে তিনি কোন মতেই সম্মত হইলেন না। শেষে তিনি বলিলেন, মাইকেলের প্রস্তাব মত বরং পাচ হাজার টাকা তুলিবার চেষ্টা কর। "কিছু কিছু বৃষ্টি"র অভিনয়ের সময় মাইকেল অর্দ্ধেন্দুবাবুকে বলিয়াছিলেন, এক্ষণে ব্যক্তি বিশেষের অর্থস্বত্বের উপর নির্ভর করিয়া কোন থিয়েটার চলিবে না।

যাহা হউক অতঃপর চাঁদার পাতা প্রস্তুত হইল, একখানি খাতায় সাধা সাধবাবাবু, ধর্মদাসবাবু, নগেন্দ্রবাবু ও অর্দ্ধেন্দুবাবু প্রত্যেকে ২০ করিয়া সহি করেন। তাহার পর মতিবাবু ও গোলাপবাবু এই পাতা লইয়া প্রথমেই নাট্যামোদী ত্রিযুক্ত বতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়ী যান। সেখানে কোন ফল হইল না, বরং স্নেহ বাক্য শুনিয়া তাঁহারা ফিরিয়া আসেন এবং আর কোনও বড় লোকের দ্বারস্থ হইবেন না, এইরূপ ভয় করা হয়। পরে প্রতিবেশী গৃহস্থগণের নিকট হইতে দুই এক টাকা করিয়া ৩০০ টাকা চাঁদা সংগ্ৰহিত হইয়াছিল। ইহার পর ২৫০ টাকা মাত্র আদায় হয়। তাহা লইয়াই রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুত আরম্ভ করা হয়। গোবর্দ্ধন পোটো একখানি রাজপথের দৃষ্ট আঁকিয়া দিলে টাকা ফুরাইল। রং ও কাপড় কেনা ছিল। পোটো বিদায় করিয়া ধর্মদাসবাবু নিজেই তুলি ধরিলেন। এই সময় আবার গোবিন্দনাথবাবু দেশে যান। অর্থাভাবে আপড়াই প্রায় বন্ধ হইয়া আসিল। মতিবাবু, মহেন্দ্রবাবু, নগেন্দ্রবাবু ও অর্দ্ধেন্দুবাবু মাঝে মাঝে ১০ টাকা ২০ টাকা দিয়া দল বজায় রাখিলেন। অর্দ্ধেন্দুবাবু এই সময় অর্থাভাবে ঘুচাইবার জন্য একদিন টিকিট বেচিয়া অভিনয় করিবার প্রস্তাব করিলেন। গিরিশবাবু কিছুতেই সম্মত হইলেন না। শেষে পীড়াপীড়ি করায় তিনি আবার দলভাগ করিলেন। বাগবাজার ট্রাটের উপর এখন যেখানে বাজার হইয়াছে, উহারই একাংশে এক কামারের ডিটায় স্থায়ী মঞ্চ বাধিবার চেষ্টা হইতে লাগিল। ব্রজনাথ দেবের উত্তোগে স্ত্রামপুত্রে গোলাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে যে মঞ্চ প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহার কাঠকাঠরা তখনও বর্তমান ছিল। ব্রজবাবু তখনও শয্যাগত। অর্দ্ধেন্দুবাবু ব্রজ

বাবুর নিকট এই কাঠকাঠুরী প্রার্থনা করায় তিনি আনন্দিত হইয়া তাহা দান করিলেন। তখন এই দলের এত অর্থকষ্ট যে মুটে ডাড়া দিয়া ঐ সকল কাঠ আনিবার পয়সা ছিল না। গভীর রাত্রিতে এই সকল ভগ্নসম্ভার আপনারা কাঠ কাঁধে করিয়া শ্রামপুত্র হইতে বাগবাড়ারে আনিয়া ফেলিতেন; যৎসামান্য পরচ করিয়া ইহার। জমিটুকু বিক্রিয়া তাহার মধ্যে কাঠকুটে রাখিলেন বটে, কিন্তু রক্ষক অভাবে টুকরো কাঠ চুরী যাইতে লাগিল। এই সময়ে মাকলীন নামে একটা নিরালস্য অগ্রহীন ইংরাজ নাবিক ডিঙ্ক করিতে বাগবাড়ারে আসিত। ধর্মদাসবাবু ও রাজেন্দ্রবাবু তাহাকে পাইতে দিতে স্বীকৃত হওয়ায় উহাকেই রক্ষক রাখা হইল। লোকটা জাহাজে থাকায় রং প্রস্তুত করিতে পারিত। কিছুদিন তাহার দ্বারা রং বাটা, মুটের কাজ ও দারবানের কাজ বেশ চলিল। তারপর কিছুদিন পরে লোকটা ৬০০ ককিশোর নিয়োগের কোচম্যান হইল। তিনি তাহাকে এক প্রহর ইংরাজী বস্ত্রাদি দিলেন। বস্ত্রাদি পাইয়া সে একদিন কোপায় চলিয়া গেল, আর আসিল না। এদিকে দৃশ্যপট আঁকা ও প্লাটকর্ম তৈয়ারী যখন অর্ধেক হইয়াছে, তখন ইহাদের মধ্যে একব্যক্তি শত্রুতা করিয়া উহা পুড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই ব্যক্তি ইহাদের মধ্যে গদ্যোচ্ছোষ্ট ছিলেন, মধ্যে মধ্যে দলে আসিয়া অভিনয়াদি করিতেন। অভিনয়ে তিনি স্বগ্যাতি পাইয়াছিলেন, কিন্তু টিকিট বেচিয়া বিয়েটার করিতে তাহার আপত্তি ছিল বলিয়া তিনি দল ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তাহার অভাবেও যখন বেগিলেন এই সম্প্রদায় বজ্জনে রক্তমকে প্রস্তুত করিয়া তুলিতে লাগিল, তখন তিনি দ্রোণপর্বণ হইয়া এই কুৎসিত উপায় অবলম্বন করিবেন স্থির করিলেন, অর্ধেন্দুবাবু, নগেন্দ্রবাবু ও ধর্মদাসবাবু এত পরিশ্রমে সংগৃহীত কাঠগুলি অনান্যদেয়ে ভস্মীভূত হইবে এই ভয়ে সংবাদ পাইবামাত্র সেইদিনই সমস্ত খুলিয়া শ্রামবাড়ারে ৬০০ আশন পালের বাড়ীতে লইয়া আসিলেন। বৃন্দাবনবাবুর পোখপুত্রে রাজেন্দ্রবাবু ইহাদের বাল্যবন্ধু। তিনি সাহায্য করিতে স্বীকার করায় তাহার দুই-উঠানে মক বাধা হইতে লাগিল। এই সময় ধর্মদাসবাবু ও কান্তিকচন্দ্র পাল এক প্রকার ২৪ ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া কার্য করিতে লাগিলেন। রাজেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে আশ্রয় লওয়ায় আবার ইহা-দিগকে টিকিট বেচিবার আশা ত্যাগ করিতে হইল। নগেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে আশ্রয় হইতে লাগিল। টিকিট বেচা হইবে না শুনিয়া গিরিশবাবু আবার দলে মিশিলেন। সম্প্রদায় তাহা হইতে উত্তিপূর্ণে নানারূপে উৎপীড়িত হইলেও চম্ভলজায় পড়িয়া তাহাকে গ্রহণ করিলেন। ১২৭৮ সালের বর্ষাকালে শ্রীরাজেন্দ্রনাথ পালের বাড়ীতে নতুন মঞ্চ লীলাবতীর প্রথম অভিনয় হইল। এই সময় হিন্দুমেলার ৩নং গোপাল মিত্র ইহাদের দলে ভোগ দিয়াছিলেন। ইহারই প্রস্তাবে এই সম্প্রদায়ের নাম The Calcutta National Theatre রাখার কথা হয়, শেষে মতিবাবুর প্রস্তাবে Calcutta টুকু নাম দিয়া The National Theatre রাখা হইয়াছিল। প্রথম দিন হইতেই এই নামে অভিনয় হয়। এই অভিনয়ে নিম্নলিখিতরূপে পাঁচ পাঁজী সাজানো হইয়াছিল,—

হরবিলাস ও ঝি	ঐর্ধেন্দ্রনাথের নৃত্যকী
ললিত	ত্রিগিরিশচন্দ্র বোস
নদের টাঙ্ক	ত্রিগোপেন্দ্রনাথ গিরি
হেমচাঁদ	নগেন্দ্রনাথ নন্দোপাধ্যায়
ভোজনাপ	মহেন্দ্রলাল বসু
ত্রিনাথ	শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
বেলো খুড়ো	মতিলাল গুপ্ত
লীলাবতী	ত্রিহরেশচন্দ্র মিত্র
ক্ষীরে/দবাসিনী	ত্রিরাধামাধব কর
সারলাসুন্দরী	অমৃতলাল নুপোপাধ্যায় (বেলবাঁহ)
রাজলক্ষী	ত্রিগোপেন্দ্রনাথ গিরি
রঘু উড়ে	হিঙ্গুল খাঁ
যোগজীবন	বজ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

অর্ধেন্দ্রনাথ “ঝি” নাট্যটি তাহার ভাষা বদলাইয়া দিয়াছিলেন। গ্রন্থকার তাহার ভাষা এই দেশীয় লোকের মত রাখিয়াছিলেন। অর্ধেন্দ্রনাথ অভিনয়কালে মেদিনীপুরের ভাষা ব্যবহার করিয়াছিলেন। রাজেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে প্রতি পনিবারে ৪৫টা অভিনয় হয়। তাহার পর বর্ষায় বন্ধ হয়। শেষে বন্ধক ওয়ালা মথুরামোহন বিশ্বাসের বাড়ীতে (এখন D Biswas & Co) পুত্রার সময় অভিনয় হয়। রাজেন্দ্র বাবুর বাড়ীর অভিনয়ে দীনবন্ধু বাবু, ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকার প্রভৃতি দর্শক উপস্থিত হইতেন। দু’একটা অভিনয়ের পর বুঝা গেল, হিঙ্গুল খাঁ দ্বারা উক্তের অভিনয়ে সুরবিধা হইতেছে না। তখন অর্ধেন্দ্রনাথ শশিলাল দাস নামক এক নতুন ব্যক্তিকে শিক্ষা দিলেন। এই লোকটা এত জ্বমার উদ্ভেদকথা বলিতেশিপিও যে দলের মধ্যেইহার নাম “বিশাউড়ী” হইয়া গেল। ১২৭৮ সালের আশ্বিনে মথুরামোহন বিশ্বাসের বাড়ীই স্থাপনাল থিয়েটারের অবৈতনিক ভাবে শেষ অভিনয়। এই সময়ে আবার অর্থকষ্ট ঘটিল। রাজেন্দ্রবাবুর উঠানে বর্ষায় ভিজিয়া হেজ খারাপ হইতে লাগিল। অর্ধেন্দ্রনাথ আবার টিকিট বেচিবার প্রস্তাব তুলিলেন। গিরিশবাবু আবার নাকিয়া বলিলেন। তিনি এবার বলিলেন, যদি ছাত্রবাবুর মাঠে প্যাডলিয়ন (নাট্যশালা) নীতিতে পার সম্মত আছি, তখনকার পক্ষে এ অসম্ভব প্রস্তাব তুলিয়া সকলে চম্কাইয়া উঠিল। গিরিশবাবু আবার দল ত্যাগ করিলেন। রাজেন্দ্রবাবুর বাড়ীর উঠান এত বড় নয় যে তাহাতে টিকিট বেচিয়া দর্শকের স্থান ফুলাইতে পারা যায়, কাজেই ইতিকর্তব্যতা ভাবিতে ভাবিতে দিনও চলিয়া গেল, হেজও পচিয়া গেল, দলও ভাঙ্গিয়া গেল। নগেন্দ্রবাবু, ধর্মদাসবাবু, মতিবাবু ও অর্ধেন্দ্রনাথ অতি নিকট প্রতিবেশী ছিলেন। ইহারা নতুন পন্থা চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ইতিপূর্বে টাঙ্গা আদায় করে ইহারা কয়েকজন ব্যক্তির সহায়ত্বে পাইয়াছিলেন। ত্রিগোপেন্দ্রনাথ পাল, ত্রিগোপেন্দ্রনাথ পাল (২য়) ওরফে বুধো পাল, অমৃতলাল পাল,

ত্রিবিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় ইন্সপেক্টার, ব্রজনাথ চট্টোপাধ্যায়, নন্দোপাশাল নিয়োগী (পরে এটর্নী) ফটিক ওরফে হরকুমার গঙ্গোপাধ্যায় (যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাজীর অভিনেতা), নগেন্দ্রবাবুর বড় ভাই দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও পিসিতো ভাই কালী-প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় — ইহারা এই শেষে এই নাট্যদলপ্রদায়ের অস্তিত্ববাক্যে দেখা দেন করিতেন ও পরামর্শ দিতেন ।

চাঁদা আদায়ের সময় ৩০সিকমোহন নিয়োগীর প্রথম পোতা ত্রিভুবনমোহন নিয়োগী ইহাদের কিছু চাঁদা দেন । শেষে এই ব্যক্তি ইহাদের দুর্ভাগ্যের সময়ে সাহায্য করিতে আসনা হইতে প্রবৃত্ত হইলেন । ভুবনবাবু তখন কিশোর বয়স্ক । তাঁহার ভরসা পাইয়া অর্কেন্দ্রবাবু আবার দল গড়িতে প্রস্তুত হইলেন । স্থানের কথা বলায় ভুবনবাবু স্বীয় পিতামহ-প্রতিষ্ঠিত অন্নপূর্ণার ঘাটের চাঁদনীর উপর বারঘারী বৈঠকখানা ছাড়িয়া দিলেন । ১২৭০ সালের শীতকালে ১৮৭২ সালের প্রথমে এই বাড়ীতে দল বসিল । গিরিশবাবু ব্যতীত লীলাবতীর দলের সকলেই আসিয়া জুটিলেন । পূর্ণোজ্জ্বল বন্ধুবান্ধব-গণের যত্নে এবার কার্যের একটা শৃঙ্খলা স্থাপিত হইল । নগেন্দ্রবাবু সম্পাদক (ম্যেজিষ্টারী), ধর্মদাসবাবু কন্ঠাধ্যক্ষ (ম্যানেজার), কান্তিকবাবু বেশকারী (ড্রেসার) আর অর্কেন্দ্রবাবু পরিচালক ও শিক্ষক (Director ও Teacher) হইলেন । আদি ব্রাহ্ম-সমাজের গায়ক বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায় আবৃত্তক মত নেপথ্য হইতে গান গাইতেন । এই সময় হইতে ত্রিভুবনচন্দ্র মিত্র, ত্রিভোগেন্দ্রনাথ মিত্র, ত্রিলাল ঘোষ, ত্রিমহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজন আর থিয়েটার করিবেন না বলিয়া ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন । ইহার পর ক্রামবাক্যের বৈদ্যমাধব মিত্র এই দলের সভাপতি হন । অর্কেন্দ্রবাবুর প্রভাবে “নীলদর্পণ” অভিনয় করা হইল । আখড়াই আরম্ভ হইল । অতি উৎসাহে কার্য শীঘ্র শীঘ্র অগ্রসর হইতে লাগিল । বেগীবাবুও অতি বদ্ধ সহকারে ইহাদের কার্য পরিদর্শন করিতে লাগিলেন ।

এই সময়ে গিরিশবাবু একটা সপের যাত্রার দল বসাইয়া দিলেন । এই দলে তিনিই একটা সপের পালা বাঁধিয়া দেন । তাহা একটা গানে প্রয়াগের লুপ্ত বেণী ত্রিধারা ভাগীরথী বর্ণনাস্বক একটা বড় হুম্মর গান ছিল । ঐ গানটিতে অর্কেন্দ্র বাবুদিগের নাট্য-সম্প্রদায়ের সভাপতি হইতে গ্রন্থকর্তা দীনবন্ধু মিত্রের নাম পর্য্যন্ত এমন কৌশলে গাথা যে, ভনিলে গিরিশবাবুর কবিত্বশক্তি ও শব্দচয়ন ক্ষমতার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না । রাধামাধববাবু এই সময়ে কোন কারণ বশতঃ বিদেশে যান । বিদেশ হইতে আসিয়া তিনি গিরিশবাবুর দলে যোগ দেন । তিনিই গিরিশবাবুর এই গানটি গাইতেন,—

দুগ্ধবেণী ব'লে উরো ধার ।

তাতে পূর্ণ-অর্ক-ইন্দু-কিরণ, সিঁদুর মাথা মতির হার ।

নগ হতে ধারাদ্বার সরস্বতী কণিকার,

বিবিধ বিগ্রহ ঘাটের উপর শোভা পায়,

শিব নহু'হুত মহেশ্বাদি অবতার ।

অলঙ্কারে নিষ্কৃ করে গান, কিবা ধর্মক্ষেত্র স্থান,

অবিনাশী মূনিকবি করুছে বসে ধ্যান,

সবাই মিলে ডেকে বলে ধীনবন্ধু কর পার।

কলঙ্কিত শব্দ হ্রসবে অমৃত বরষে,

জান হয় নীনের গৌরব যায় নৃসিং খসে।

স্থানমাহাত্ম্যে ছাড়ী ভঁড়ী পদমা দে দেখে বাহার।

কিবা বালুময় বেল, পালে পালে রেতের বেল

তুবনমোহন চরে করে গোপালে খেলা।

মিলে যত চাষা ক'রে আশা নীলের গোড়ায় দিচ্ছে সার।

এই গানটির বর্ণিতার্থ সহজেই বুঝা যাচ্ছে। ইহার ফলিতার্থ এইরূপ,—“নৃপবেণী” — সভাপতি বেলীমাধব মিত্র, “তেরো ধার”—১২১৩ জন পৃষ্ঠপোষক ও অভিভাবক, “তাতে পূর্ণ-অর্ধ-ইন্দু”—পূর্ণচন্দ্র মিত্র, শ্রী বর্জেন্দ্রশেখর মুনসী ও কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। “সিঁদুর-মাখা মতির হার”—মতিলাল হার। “নগ চতে ধারাদার”—নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সেক্রেটারী, তাঁহা হইতেই দল চলিতেছে। “সরস্বতী কীপকান”—সকলেরই বিজ্ঞাত্য। “বিবিধ বিগ্রহ”—অরপূর্ণার ঘাটের উপর এই সকল বিগ্রহ অর্থাৎ উচ্ছ্বল যুবক ছুটিয়াছে। “শিবশঙ্কর মহেশ্বরী অবতার”—শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কান্তিকচন্দ্র পাল, মহেন্দ্রলাল বহু প্রভৃতি। “অলঙ্কারে গান”—ফিফাবু নেপথ্য হইতে গান গাইতেন। “কিবা ধর্মক্ষেত্রস্থান”—ঐশ্বর্যদাস হার ও শ্রীক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়। “অবিনাশী”—অবিনাশ-চন্দ্র কর। “ধীনবন্ধু কর পার”—ধীনবন্ধু মিত্রের পুত্রক অবলম্বন “কলঙ্কিত শব্দ”—শশিলাল দাস রেবাস্বক নাম বিসাড়ী হইয়া কলঙ্কিত। “অমৃত বরষে”—অমৃতলাল পাল একজন অভিভাবক। “পদমা দে দেখে বাহার”—টিকিট বিক্রয় করিবার প্রত্যাশের প্রতি লক্ষ্য। “বালুময় বেল”—অমৃতলাল মৃগোপাধ্যায় ওরফে (কাপেন) বেলবাবু। “পালে পালে”—রাজেন্দ্রনাথ পাল, কান্তিক পাল প্রভৃতি পাল উপাধিধারী ব্যক্তিগণ। “তুবনমোহন-চরে”—শ্রীতুবনমোহন নিয়োগী তাঁহার গদ্যভীরুর বারবারী বৈঠকখানায়। “গোপালে খেলা”—গোপালচন্দ্র দাস। “মিলে যত চাষা”—সদগোপ জাতীয় অভিনেতা ও বন্ধুবান্ধবগণ। “নীলের সার”—নীলদর্পণ লইয়া আখড়াই চলিতেছে।

গিরিশবাবুর এই গান রেবাস্বক হইলেও ইহা লইয়া উভয় পক্ষে কোন শত্রুতা ঘটে নাই।

যাহা হউক এইরূপ আয়োজ আয়োজ উৎসাহের মধ্যে জ্ঞানানাল থিয়েটার-সম্প্রদায় অরপূর্ণার ঘাটের উপর তুবন নিয়োগীর বৈঠকখানায় দৃঢ় অধ্যবসয়ে ও মহাযত্নে নীল-দর্পণের আখড়াই চালাইতে লাগিলেন। ১২৭২ সালের কা্তিক মাসে (১৮৭২ নবেম্বরে) জগদ্ধাত্রী পূজার দিন নগেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে ইহাদের ড্রেস রিহার্সাল হইয়াছিল। এই অভিনয়ের কিছুপূর্বে হুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার ব্রীজকৃত কুমুদলাল বহু এই সম্প্রদায়ে যোগদান করেন। তিনি তৎপূর্বে কাশীতে হোমিওপ্যাথী ডাক্তারী করিতেন। এই সময়ে তিনি

কলিকাতায় আসিলে অর্ধেকশতাব্দের আগ্রহে নাট্যসম্প্রদায়ের যোগদান করেন। অমৃত-বাবুর পূর্বে যখন পট্টাচার্য্য “দৈরিক্তী”র অংশ লইয়াছিলেন। তিনি দীর্ঘজন্ম পুরুষ ছিলেন বলিয়া তাহাকে বধু সাজাইলে মানাইত না। অমৃতবাবু সেই অংশ লইলেন। অমৃত-বাবুর নিজের মুখে শুনা গিয়াছে যে অর্ধেকশতাব্দের নিকট তাহার থিয়েটারের হাতে পড়ি হইল। নবীনমাধবের মৃত্যুশয্যার দূরে দৈরিক্তীকে যে “মড়াকান্না” কানিতে হইত, অমৃতবাবু সহজে তাহা আদৃত করিয়া উঠিতে পারেন নাই। শেষে অমৃতবাবু নিজ বাড়ীর পার্শ্ব একটা খালি ভাঙ্গা বাড়ীতে প্রত্যাহ হুপ্রহর বেলায় গিয়া এট জনমন শিপিবার কত সাধনা করিতেন। অর্ধেকশতাব্দ সেখানে গিয়া কানিতে পিথাইতেন, উভয়ে গলা মিলা-টয়া কাহা অভ্যাস করিতেন। আট দশ দিন এইরূপ কঠোর সাধনায় অমৃতবাবু “মড়াকান্না” আদৃত করিয়া লইয়াছিলেন। তাহাদের প্রত্যাহ এই সাধনার বিষয় পরীক্ষা-সাক্ষ্যেরা জানিত না, কাজেই রটিয়া গেল যে ভাঙ্গা বাড়ীতে স্মৃতে রোজ কাটে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে অভিনয়টিকে সর্বপ্রকারে সহজ এবং ভাবস্বচ্ছ করিবার কত এই সম্প্রদায় কিরূপ যত্ন ও পরিশ্রম করিতেন। ১৩০৭ সালের ২২ অগ্রহায়ণ তারিখে অর্ধেক-বাবু বাগলা থিয়েটারের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে এইরূপ নানা ঘটনার উল্লেখ করিয়াছিলেন। ফল কথা, যতদিন প্রত্যেক কথায় প্রত্যেক শব্দের উপযুক্ত উচ্চারণভঙ্গী অভিনেতাদের হৃদয়ঙ্গম ও আয়তীকৃত না হইত, ততদিন তাহারা ছাড়িতেন না। উক্ত অভিনয়ে নিম্নলিখিত দর্শন ও কৃত্যোদর্শনের কতই তাশানান থিয়েটারের অভিনেতৃবর্গ ঘাং শিক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা নাট্যকলা-কোশল প্রদর্শনে সঙ্গতো-ভাবে উপযুক্ত হইয়াছিল। এই ব্যক্তিগণ এইরূপ অংশ লইয়াছিলেন,—

গোলক বহু	ঐ-অর্ধেকশতাব্দের মৃত্যু
উদ্‌সাহেব	“
জনৈক রাইয়ত	“
নবীনমাধব	নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
বিশ্বনাথ	কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
তোরাপ	মতিলাল হর
রাইচরণ	“
গোপ	“
নীলকরদিগের মোক্তার	“
সাদুচরণ	মহেন্দ্রলাল বহু
মাজিষ্ট্রেট	“
রোগ সাহেব	অবিনাশচন্দ্র কর
গোপীনাথ দেওয়ান	শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
নবীনমাধব মোক্তার	গোপালচন্দ্র দাস
কবিরাজ	শশিলাল দাস

লাঠিয়াল
রাখাল
খান্দানী
সাবিত্রী
সৈরিন্জী
সরলতা
রোবতী
পদ্মী ময়রানী
খুঁতী
আতুরী

শ্রীপূর্বচন্দ্র মিত্র
যজ্ঞনাথ ভট্টাচার্য্য
গোলোকনাথ চট্টোপাধ্যায়
শ্রীঅর্কেন্দ্রশেখর মুনস্কী
শ্রীমম্বতলাল বহু
শ্রীক্ষেত্রমোহন গগৈপাধ্যায়
তিনকড়ি মাস্তা
মহেন্দ্রলাল বহু
অবিনাশচন্দ্র কর
গোপালচন্দ্র দাস

নগেন্দ্রবাবুর বাড়ী ড্রেস রিহার্সাল হইয়া থাইবার পর অভিনয়ের অতিমাত্র তপাতি হইয়াছিল। এই উৎসাহে আর কাল বিলম্ব না করিয়া টিকিট বেচিয়া অভিনয় করিবার জন্ত চেষ্টা চলিতে লাগিল। অবশেষে পাণ্ডুরিয়াবাটার মোড়ে মনুহদন সাক্ষ্যালের বৃহৎ বাড়ী পাওয়া গেল। এই বাড়ী এখন জোড়াসাঁকোর ঘড়ীওলাবাড়ী নামে প্যাত। সাক্ষ্যালহিণের তখন ভয়দশা তাহার। মাসিক ৩০ টাকা ভাড়ায় উঠানটা ছাড়িয়া দিলেন। দর্শকদাস ৩২ উঠানে শেতল বাধিতে লাগিলেন। ১২৭২ সালের ২৩ অগ্রহায়ণ (১২৭২ ৭ই ডিসেম্বর) শনিবার এখানে টিকিট বেচিয়া প্রথম অভিনয় হইবে স্থির হইল। বেলা চারিটার সময় হইতে টিকিট বিক্রয় আরম্ভ হয় এবং সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে সমস্ত টিকিট বিক্রীত হইয়া গিয়াছিল। সহরের অধিকাংশ ধনী রিজার্ভ-সিটের টিকিট লইয়াছিলেন। তখন নাচের মজলিসে লোকে ঘেমন পোষাক পরিধান করিয়া থাইত, এই থিয়েটার দেখিতেও সেইরূপ পোষাক পরিয়া দর্শকেরা আসিয়াছিলেন। এমনকর মত যথেক্রমে তখন কোন মজলিসে যাওয়া যুগাকর ছিল। সেদিন যে একতান বাজ্ঞ বাজিয়াছিল, তাগতে কালিদাস সাক্ষ্যাল হারমোনিয়ম, নিমাই ওহাদম্বী, নোরদাস বাবাজী ও বহুপাড়ার হুবিপাত রাজাবাবু বেহালা বাজাইয়াছিলেন, এবং জামপুতুরের শ্রীবেগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ঢোল বাজাইয়াছিলেন। নীলদর্পণের ইহা প্রথম অভিনয় নহে। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে যখন ঢাকায় ইহা প্রথম মুদ্রিত হয়, তখন এম্বকারের উৎসাহে ঢাকাতেই ইহার অভিনয় হইয়াছিল। যাহা হউক, প্রথম রাত্রিতেই ৭০০ টাকা বিক্রয় হওয়ায় স্কাশনাল থিয়েটারের উৎসাহ বাড়িয়া গেল। পরে ইংলিসম্যানের ছাপাখানা (জোন্স কোম্পানীর ছাপাখানা) হইতে দস্তর মত কেবল ইংরাজীতে প্র্যাকার্ড ছাপান হইয়াছিল। ৩০শে অগ্রহায়ণ শনিবারে নীলদর্পণ অভিনীত হইল। বিক্রয় বাড়িয়া গেল। পর সপ্তাহে অর্থাৎ ৭ই পৌষ শনিবারে ইহার “জামাই বারিক” অভিনয় করেন। দুই রাত্রির উৎসাহে তৃতীয় সপ্তাহে নতন অভিনয় করিবার ইচ্ছা হয়। অর্কেন্দ্রবাবুর প্রস্তাব মত জামাই বারিক গৃহীত হয়। নীলদর্পণের অভিনয়ে দর্শকে কাদিয়া হাঁপাইয়া উঠিত, জামাই বারিকের অভিনয়ে হাসিয়া গড়াইয়া পড়িত, আবার ককণ রসে আর্দ্র হইয়া পড়িত। বুধবার রাত্রি হইতে শনিবার

প্রাতঃকাল পর্যন্ত প্রত্যহ তিনবার রিহার্সাল দিয়া জামাই বারিক খেলা হয়। নীল-দর্পণের রিহার্সাল এক বৎসর চলিয়াছিল। এম রাত্রিতে নবীন তপস্বিনী খেলা হয়। ইহাও আড়াই দিনের পরিশ্রমে অভিনীত হইয়াছিল। বুধবারে ১২ খানা নবীন তপস্বিনী আনিয়া প্রধান প্রধান অভিনেতারা অভ্যাস করেন। এইরূপে ত্রাশানাল থিয়েটারের এই মঞ্চ একে একে দীনবন্ধুর নীলদর্পণ, জামাই বারিক, নবীন তপস্বিনী ও বিয়েপাগলা বুড়ো অভিনীত হয়। তাহার পর মাইকেলের “কৃষ্ণকুমারী” অভিনীত হয়। কৃষ্ণকুমারীর অভিনয়ের পূর্বে পর্যন্ত গিরিশবাবু এই দলে মিলিত হন নাই এবং তিনি “Fathers” এই গুপ্ত নামে Indian Daily News-এ ত্রাশানাল থিয়েটারের বিক্ষিপ্ত ক্রমাগত প্রবন্ধ লিপিতেন। ১৩১০ সালের বক্তৃতায় অর্ধেন্দুবাবু বলিয়াছিলেন,— “নীলদর্পণ ও জামাই বারিকে সাময়িক ও সামাজিক ছবি দেখাইয়া থিয়েটারের অভিনয়ে আদর্শের সমান অল্পকৃতি না হইলে যে জনগ্রাহী ও সঙ্গত হয় না, তাহা আমরা বেশ বুঝিয়া নিয়াছিলাম এবং থিয়েটারে সামাজিক কুপ্রথার নাটক অভিনয় করিলে যে তাহা সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে, তাহাও বুঝিতে নিয়াছিলাম। তাহার পর নবীন তপস্বিনী দর্শককে কল্পনা সাহায্যে একটু উচ্চ আদর্শের প্রতি লক্ষ্য করিতে অবসর দিলাম। তাহার পর কৃষ্ণকুমারীতে এই আদর্শ আরও উচ্চ করা হইয়াছিল। পুস্তক-নির্বাচনের এসকল হেতু আমারই মনে মনে থাকিত, এ সকল কথা নিয়ে কাহারও সহিত কোন দিন পরামর্শ করিতাম না।”

ইহার পর “কৃষ্ণকুমারী”র আখড়াই বসিয়াছিল। এই সময়ে গিরিশবাবু আশিয়া যোগ দিয়াছিলেন। তিনি ভীমসিংহের অংশ গ্রহণ করেন। নাটোরের রাজা চন্দ্রনাথের পরামর্শে পোষাকের আদর্শ প্রস্তুত হইল। রাজা চন্দ্রনাথ এই সময়ে কলিকাতায় ছিলেন। তিনি প্রতিদিন অভিনয় দেখিতে আসিতেন এবং ইহার হিঁতবী ছিলেন। তিনি কয়েকটা পোষাক, কয়েকখানি তলোয়ার, আর একটা মছলম্ব দান করেন। গিরিশবাবু প্রথমদিন “ভীমসিংহ” অভিনয় করিয়াই বিনা কারণে দল ত্যাগ করেন। দ্বিতীয়দিনের অভিনয়ে অর্ধেন্দুবাবু একাই “ভীমসিংহ” এবং তাহার নিজের অংশ “ধর্মদাস” অভিনয় করেন। এই অভিনয়ে এক ব্যক্তি দ্বারা যুগপৎ দুই বিরোধী রস — করুণ ও হাস্যরসের অভিনয় দেখিয়া রাজা চন্দ্রনাথ মুগ্ধ এবং বিম্বিত হইয়া অর্ধেন্দুবাবুকে উপহার দিয়া-ছিলেন। তখন সহরে যে সকল প্রাত্যহিক ঘটনা ঘটিত, তাহা হইতেই অভিনয়ে বিষয় নির্বাচিত হইত। ইহার স্রষ্টা পূর্বে হইতে বিশেষ আয়োজন করা হইত না। অনেক বিষয় লিখিয়া লিপিবদ্ধও করা হইত না। অর্ধেন্দুবাবু, অমৃতবাবু, গিরিশবাবু, মহেন্দ্র-বাবু প্রভৃতি প্রধান প্রধান অভিনেতারা কোন একটা বিষয়ে আপন আপন বক্তব্য স্থির করিয়া লইয়া টেবিল বাহির হইয়াপড়িতেন। এইরূপে “চারিটেবল ডিম্পেন্সরী” “মডেল স্কুল” ক্যাথলিক সাহেবের “সাবডেপুটি এক্সামিনেশান” “পাবলিক সর্কিউলার লিট”, “গ্রীকরম অফ এ প্রাইভেট থিয়েটার” “বিলাতী বাবু” “মুন্সেবী সাহাবকা পাক্সা তামাসা” “ভারতে যবন” “পরীধান” ইত্যাদি বিষয় অভিনীত হইয়াছিল। এই গুলিতে অর্ধেন্দু

বাবু ও অমৃত বাবুকে সর্বাপেক্ষা খাটিতে হইত। এই সময়ে রাজা চন্দ্রনাথের স্ত্রায় সার ডব্লিউ ডব্লিউ হাণ্টার ইহাদের আর একজন হিঠৈতনী বন্ধু হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি প্রতিলোকে ইংরাজ দর্শক সংগ্রহ করিয়া আনিতে, এক মঙ্গলবারে তখনকার বড়লাট সাহেব নিজে বিয়েটার দেখিতে আসেন। তিনি পূর্বে কোন সংবাদ না দিয়াই অভিনয়ের প্রাক্কালে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একেবারে দরজায় গাড়ী আসিয়া লাগিলে, সকলে জানিতে পারিলেন, বড়লাট সাহেব আসিয়াছেন। এই সময়ে সংবাদপত্রের সম্পাদকেরাও ইহাদের বিশেষ হিঠৈতনী হইয়াছিলেন। তাঁহারা আত্মীয়তা, ঘনিষ্ঠতা করিতেন বটে, কিন্তু কখনও দোষ প্রদর্শনে ফটী করিতেন না বা কেবল প্রশংসামূলক সমালোচনা ছাপিতেন না। এই সময়ে অমৃত বাবুকে প্রকৃত প্রস্তাবে ম্যানেজার বা অধ্যক্ষের কার্য্য করিতে হইত। ১২৭২ সালের বর্ষার প্রাক্কালে (১৮৭৩ মার্চ) জাশানাল গিয়েটার অভিনয় বন্ধ করিতে বাধ্য হন। বন্ধ হইবার কিছু দিন পূর্বে গিরিশবাবু আবার আসিয়া যোগ দিয়াছিলেন। যেদিন গিয়েটারের শেষ অভিনয় হইল, সেই দিন গিরিশবাবুর রচিত নিম্নলিখিত গানখানি গাইয়া নাট্যসম্প্রদায় সে সময়ের জ্ঞাত বিদায় লইলেন। গানটী বিয়েটারের উক্তিভে লেখা। বন্ধ হইবার কিছু পূর্বে গিরিশবাবু বঙ্কিম-চন্দ্রের কপালকুণ্ডলা নাট্যকারে পরিবর্তন করিয়া দেন। উপক্ৰান্ত হইতে নাট্য গঠন এই প্রথম। ইহার অভিনয় হইয়াছিল।

কাতর অন্তরে আমি চাহি বিদায়।
সাধি ওহে স্বধীভ্রম তুল না আমায়।
এ সভা রসিকে মিলিত,
হেরিয়ে অধীন-চিত, আশ পুলকিত,
আধ হৃদয়ে শুকায়।
অন্তগামী দিনমণি,
বেষতি হেরি নলিনী অভিমান-বিমলিনী,
আধ হাসি চায়।
মমপ্রতি কতুপতি,
হৃদয়ে নিদয় মতি, হাসাইছে বহুমতী,
আমারে কাঁদায়।

নিখাইয়ে নাট্যায়, আরজিব অভিনয়।

সাক্ষাৎসিঙ্গের বাড়ীতে জাশানাল বিয়েটারের অভিনয় দেখিতে আসিয়া ৬ আঙতোষ দেবের (ছাত্তুবাবুর) দৌহিত্র ৮শরচ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় সাধারণ বিয়েটার করিতে প্রস্তুত হন। ছাত্তুবাবুর বাড়ীতে ইহার আখড়াই বসে। অনেকগুলি মান্যগণ্য, সম্ভ্রান্ত লোক এই দলের হিঠৈতনী ও পরামর্শবাহ্য ছিলেন। বাইকেল মধুসূদন বসু, ব্রীউমেনচন্দ্র দত্ত (O. C. Dutt Esqr.) পণ্ডিত ঐক্যব্রত সায়লনী প্রভৃতি। অভিনেতার মধ্যে

শরচ্চন্দ্র ঘোষ, বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ (স্থলকায়), দেবেন্দ্রনাথ মিত্র, বটরক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষেত্রমোহন ঘোষ, শ্রীমক্ষয়চন্দ্র মজুমদার, শ্রীমহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অখিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি ছিলেন। বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, অখিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং শরচ্চন্দ্র ঘোষই ইহার প্রধান উদ্ভোক্তা। ছাত্রগোলের মহান্নদিশের মধ্যে অনেকে এই দলের পৃষ্ঠপোষক হইয়াছিলেন। ছাত্রবাবু পাড়ীর সম্মুখের মাঠে ৪০ টাকার ভ্রমী ডাড়া লইয়া শরৎবাবু গোলার ঘরে এই নাট্যশালা স্থাপন করেন। ১২৮০ সালের ১লা ভাদ্র (১৮৭৩ আগষ্ট) বেঙ্গল থিয়েটারের প্রথম অভিনয় হয়। “শমিষ্ঠা” এখানকার প্রথম অভিনীত পুস্তক। প্যারীমোহন রায় ইহার ধনাধ্যক্ষ ছিলেন। শমিষ্ঠার অভিনয়ে ইহারের হ্রবিধা হয় নাই। শেষে মাইকেলের “মায়াকানন” ও “বিষ কি ধ্বংস” নামক দুইখানি নতুন নাটকের গ্রন্থস্বত্ব ক্রয় করিয়া লওয়া হইয়াছিল। শমিষ্ঠা অভিনয়ের সময় মাইকেল জীবিত ছিলেন না। নতুন নাটকের গ্রন্থস্বত্ব তাহার পুত্রেরই ক্রীত হইয়াছিল। নতুন থিয়েটার হইলেও বেঙ্গলে মাইকেলের মৃত্যুর পর একদিন তাহার নামে সাহায্যরত্নের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। উমেশবাবু, পণ্ডিত সভাস্বত্ব ও মাইকেলের পরামর্শে বেঙ্গল থিয়েটারে প্রথম হইতেই ব্যাপকতা লইয়া স্বীচরিত্র অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। ছাত্রবাবুদিগের বাটার দেওয়ান রামচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের যাত্রার দলে স্বী অভিনেত্রী দেখিয়া শরৎবাবু এ বিষয়ে সাহসী হইয়াছিলেন। প্রথমে চারিটা মাত্র স্বীলোক লওয়া হইয়াছিল। এই চারিজন ব্যতীত আবশ্যকমত পুরুষেও স্বীচরিত্র অভিনয় করিত। শমিষ্ঠার স্থায় “মায়াকানন”ও বেঙ্গল থিয়েটার হ্রবিধা করিতে পারিলেন না। অখিলবাবু মায়াকাননের প্রকাশক হইয়াছিলেন। এই সময়ে এলোকেলী-মোহান্ত-বিজাট লইয়া দেশে মহা গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। বেঙ্গল থিয়েটার এই চক্রে “উঃ মোহান্তের এই কি কাম” নামে একখানি নাটক অভিনয় করেন। ইহা হইতেই এই দলের খেটে প্রতিপত্তি হয়। তাহার পর বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় বন্ধিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী নাটকাকারে গঠিত করিয়া দেন। দুর্গেশনন্দিনীর অভিনয়েই বেঙ্গল থিয়েটারের যশঃ বিস্তৃত হইয়া পড়িল। দুর্গেশনন্দিনী নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ প্রথমে অভিনয় করেন,—

অভিরাম স্বামী	বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়
ভগৎসিংহ	শরচ্চন্দ্র ঘোষ
ওসমান	হরিশাস দাস (বৈষ্ণব)
নিমলা	গোলাপ
তিলোত্তমা	ভগতাসিণী
আসমানী	এলোকেলী
আয়েসা	চোয়ে, ওরফে চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

ইহার পর ১২৮০ সালের ফাল্গুন মাসের শেষে (১৮৭৪। ২৮ ফেব্রুয়ারী) বেঙ্গল

থিয়েটারে “রত্নাবলী” ও “এঁরাই আমার বাঙ্গালী সাহেব” নামে প্রহসন অভিনীত হয়। এইদিন বহুসংখ্যকের অঐতনিক একতান-বাহন-সম্প্রদায় বাজাটয়াচ্ছিলেন। ইহার পর চৈত্র মাসে (১৫ মার্চ তারিখে) “নিজামুল্লহ” ও “গেমন কর্ত্ত তেমনি ফল” অভিনীত হইয়াছিল। মহারাজ নর্ত্তীক্ৰমোহন ঠাকুর, পার্শ্বলাল শীল, চন্দ্রনলাল রায় প্রভৃতি এই দিন উপস্থিত ছিলেন। এই দিন ত্রিযুক্ত মহারাজ স্বতীক্ৰমোহন ঠাকুরের বাড়ীর অভিনেতৃ-সম্প্রদায়ের হুজুফন অভিনেতা অঐতনিক ভাবে এই অভিনয়ে যোগ দিয়াছিলেন।

জ্ঞানলাল থিয়েটার ভাঙ্গিবার পর দুইটা দল হইয়া যায়। একদলে ধর্ম্মদাসবাবু প্রভৃতি ও অপর দলে অর্কেন্দুবাবু প্রভৃতি।

ধর্ম্মদাসবাবু ২২এ মার্চ তারিখে টাউনহলে ট্রেজারীয়া জ্ঞানলাল থিয়েটার নাম দিয়া “দেশীয় হাস্যপাতালের সাহায্যার্থনী” বলিয়া “নীলদর্পণ” অভিনয়ের বিজ্ঞাপন দিলেন। এই সময় হইতে গিরিশবাবু রীতিমত সাধারণ নাট্যশালায় মিশিলেন। ধর্ম্মদাসবাবুর দলে গিরিশবাবু উড সাহেবের অংশ লইয়াছিলেন। বিজ্ঞাপনে লেখা হইয়াছিল,—“The National Theatre will reopen for the benefit of the native Hospital at the Town Hall.” ২৮, ২৯, ১এ ডিন প্রকার মূল্যে টিকিট বিক্রয় হয়। এই অভিনয় উপলক্ষে উক্ত হাস্যপাতালের সাহায্যার্থ ইহার ৫০০ টাকা দান করেন। ৫ই এপ্রেল তারিখে আবার অভিনয় করেন। এই দিন বিজ্ঞাপনে লেখা হইয়াছিল,—“For the benefit of the charitable section of the Indian Reform Association.” এই দিন “সধবার একাদশী” ও “ভারতমাতা”র অভিনয় হইয়াছিল।

টাউনহলে ধর্ম্মদাসবাবুর দলকে অভিনয় করিতে দেখিয়াই অর্কেন্দুবাবুর দলও লিওর ট্রীটে “অপেরা হাউস ভাড়া লইয়া হিন্দু জ্ঞানলাল থিয়েটার” নাম দিয়া অভিনয় করিয়াছিলেন। ৫ই এপ্রেল তারিখে ইহাদের অভিনয় আরম্ভ হয়। মাইকেলের “শমিষ্ঠা” অভিনীত হয়, সঙ্গে সঙ্গে “মডেল স্কুল” “বিলাতীবাবু” “উপাধির বিতরণ”, “মৃত্যু সাহেবের পাক্কা ভাষা” ও অভিনীত এবং ব্যায়ামবীর অধিলবাবুর জাঁড়া প্রদর্শিত হইয়াছিল।

অর্কেন্দুবাবুর দল অপেরা হাউসে দুই রাত্রি অভিনয় করিয়াই ঢাকায় গমন করেন। ধর্ম্মদাসবাবুর দল ২ই মে শুক্রবার শোভাবাগার নাট্যমন্দিরে কপালকুণ্ডলা অভিনয় করিয়াই ঢাকায় যান। ঢাকায় এই সময়ে “পূর্ববঙ্গ-রঙ্গভূমি” নামে একটি বাঁধা নাট্যশালা ছিল, অর্কেন্দুবাবুর দল এই নাট্যশালায় অভিনয় আরম্ভ করেন।

কিছুদিন পরে উভয় দল কলিকাতায় আসেন, কিন্তু মিলন হয় নাই। তাহার পর দীবাণতিয়ায় কুমার (এখন রাজা) প্রমথনাথ রায়ের অপ্রশাসন উপলক্ষে দীবাণতিয়ায় বাইবার জ্ঞানলাল থিয়েটারের বায়না হয়। এই উপলক্ষে উভয় দল একত্র হয়। পূর্ণদল দীবাণতিয়ায় চারি রাত্রি অভিনয় করে, পরে বহরমপুরে আসে।

এই সময়ে বেঙ্গল থিয়েটারে “মোহাছের এই কি কাজ” অভিনীত হইতেছিল। একদিন ধর্মদাসবাবু আর ভুবনবাবুতে এই অভিনয় দেখিতে যান। পথে ইহাদের সঙ্গে নগেন্দ্রবাবু মিলিত হন। সেদিন এত লোক হইয়াছিল যে চারি টাকার টিকিট আট টাকা দিয়াও ইহার কিনিতে পান নাই। এই বিকৃত পোশা ভুবনবাবু উত্তেজিত হইয়া উঠেন। বেঙ্গল থিয়েটারের সম্মুখে পাড়াটয়া তিনজন পরামর্শ দিবার করেন, একটা নাট্যশালা গাঁথিতেই হইবে। ভুবনবাবু তখনও নাবালক হইলেও টাকা দিতে প্রস্তুত হইলেন। ইহার পর একটা ছোট দল লইয়া ধর্মদাসবাবু চুঁচুড়ার ব্যাংককে আশানাল থিয়েটার নাম দিয়া “মোহাছের এই কি কাজ” অভিনয় করেন।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ২২ সেপ্টেম্বর সোমবারে গ্রেট আশানাল থিয়েটারের ভিত্তি স্থাপিত হয়। ধর্মদাসবাবু তখনকার লুইস থিয়েটারের (বর্তমান রয়াল থিয়েটারের আদর্শে) এই নাট্যশালা প্রস্তুত করান। ভিত্তিস্থাপনের দিন সভা হইয়াছিল, অনেক মান্তগণ্য লোক উপস্থিত ছিলেন।

তাহার পরে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর শনিবার গ্রেট আশানাল থিয়েটার খোলা হয়। ইহার কিছুদিন পূর্বে ৭ই ডিসেম্বর তারিখে আশানাল থিয়েটারের প্রথম বার্ষিক অধিবেশন হয়। রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর সভাপতি হইয়া ছিলেন। নবগোপাল মিত্র, মনোমোহন বসু ও অর্কেন্দ্রবাবু বক্তৃতা করিয়াছিলেন; তখনও উভয় দল স্বতন্ত্র ছিল। অর্কেন্দ্রবাবু একা ধর্মদাসবাবুদের সঙ্গে যোগ দিয়া গ্রেট আশানাল থিয়েটার নাম গ্রহণ করেন এবং মতিবাবু, গেলবাবু প্রভৃতি আশানাল থিয়েটার নামে স্বতন্ত্র রহিলেন। বার্ষিক উৎসব একত্র হইল বটে, কিন্তু কার্যাবলীর মধ্যে স্বতন্ত্র ভাবে উভয় দলের নাম উল্লিখিত হইয়াছিল। গ্রেট আশানাল থিয়েটারের পক্ষ হইতে সংস্কৃত স্লোকে আশীর্বাদ পাঠ এবং আশানাল থিয়েটারের পক্ষ হইতে সঙ্গীত দ্বারা কার্যারম্ভ হইয়াছিল।

তাহার পর ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গল থিয়েটারের অহুসরণে গ্রেট আশানালে স্বী-অভিনেত্রী লইবার প্রস্তাব হয়। এই সূত্রে অর্কেন্দ্রবাবু ও মতিবাবুর মধ্যে মতভেদ হওয়ায় অর্কেন্দ্রবাবু স্বতন্ত্র দল করিয়া টাকা, বগুলা, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থানে গমন করেন। পরে ভুবনবাবুর আগ্রহে উভয় দল একত্র হইয়া গেল। তখন বেঙ্গল অভিনেত্রী লওয়া হইয়া গিয়াছে। ১২ সেপ্টেম্বর (১৮৭৪) “সত্য কি কলঙ্কিনী” গোলা হয়। এই থিয়েটারে প্রথমে ছয়জন অভিনেত্রী লওয়া হইয়াছিল। তখন ম্যানেজার ধর্মদাসবাবু সেক্রেটারী নগেন্দ্রবাবু, শিক্ষক অর্কেন্দ্রবাবু।

কিছুকাল পরে দশচক্রে ভুবনবাবুর অবস্থা বিপর্যয় ঘটিলে গ্রেট আশানাল থিয়েটার উঠিয়া যায়। নাট্যশালা ভাড়া দেওয়া হয়। প্রথমে গিরিশবাবু, তাহার পর তাহার কালক দ্বারকানাথ দেব, তাহার পর কেশবনাথ চৌধুরী, তাহার পর মহেন্দ্রলাল বসু, তাহার পর কৃষ্ণধন বল্লভাধার্য ভাড়া লইয়াছিলেন। তাহার পর উহা বিক্রীত হইয়া গেল, প্রতাপচাঁদ অধীকৃত করেন। গিরিশবাবু ম্যানেজার হন। প্রতাপ অধীর আমলেই

গিরিশবাবু নাটক লিখিতে আরম্ভ করেন। তাহার প্রথম নাটক রাবণ-বধ। তাহার পর নগেন্দ্রবাবুর আভা। কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা প্রলোভিত হইয়া গুরুবরায় নামক এক ব্যক্তি থিয়েটার করিতে প্রস্তুত হইলে গিরিশবাবু, অমৃতবাবু প্রভৃতি কয়েকজন মিলিত হইয়া ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ঠার থিয়েটার (৬৮ নং বীডন ষ্ট্রীটে) স্থাপন করেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুলাই ঠার থিয়েটার গোলা হয়। গিরিশবাবুর দক্ষণাঙ্ক নাটক এখানে প্রথম অভিনীত হয়। গুরুবরায়ের মৃত্যুর পর ঠার থিয়েটারের প্রধান অভিনেতা শ্রীমদন্তলাল বহু ও শ্রীমদন্তলাল মিত্র, কথোদ্যক্ষ শ্রীহরিপ্রসাদ বহু ও ধর্মদাসবাবুর ভাগিনেয় শ্রীদাহচরণ নিয়োগী এই চারিজননে ঠার থিয়েটারের নাট্যশালা ক্রয় করিয়া লয়েন। তাহার পর যখন বাবু গোপাললাল ঈল এমারল্ড থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন, তখন ইহারা ঠার থিয়েটারের বীডন ষ্ট্রীটের নাট্যশালা বেচিয়া কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের বর্তমান নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করেন। ঠারের বর্তমান নাট্যশালার জমি ও বাটী উভয়ই থিয়েটারের সম্পত্তি। এই নতুন বাটী হইতেই অমৃতবাবু ইহার অধ্যক্ষতা করিতেছেন। “নদীরাম” এখানকার প্রথম অভিনীত পুস্তক। ঠারে কর্তৃত্ব লইয়া কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। তবে গিরিশবাবু উত্তরকালে নানা নতুন থিয়েটারে ব্যতাস্রাত করায় এবং মধ্যে মধ্যে ঠারে ধোণ দেওয়ায় কিছু দিন এই সম্প্রদায়ে হৃশ্চন্দ্রে কার্য্য করিবার পক্ষে অনেক বাধা ঘটয়াছিল। ঠার বরাবর সমান আদর পাইয়া প্রতিপত্তির সহিত হৃশ্চন্দ্রে কার্য্য করিয়া এখন বর্তমান রহিয়াছে।

ঠার থিয়েটার যখন বীডন ষ্ট্রীটে ছিল, সেই সময়ে স্ত্রাশানাল থিয়েটারের নাট্যশালা ভুবনবাবু আর একবার গ্রেট-স্ত্রাশানাল থিয়েটার নাম দিয়া অভিনয় করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কুমারসম্ভব ও আনন্দমঠ অভিনয় করিয়া এই চেষ্টা পুনরায় লুপ্ত হয়। ঠার থিয়েটার — দল পরে ঐ নাট্যশালা ক্রয় করিয়া উহা ভাঙ্গিয়া ফেলেন। স্ত্রাশানাল থিয়েটারের চিহ্ন এইরূপে লুপ্ত হয়।

গ্রেট-স্ত্রাশানাল থিয়েটার স্থাপনাবধি বেঙ্গলে বিশেষ পরিবর্তন হয় নাই। গ্রেট-স্ত্রাশানালের নানা পরিবর্তনের ঘাতপ্রতিঘাতে বেঙ্গলেও কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটয়াছিল। শেবে প্রতাপ জহরীর হস্তে স্ত্রাশানাল থিয়েটার কিছু দিনের অল্প স্থির হইলে বেঙ্গলও স্থির হইয়া কার্য্য করিয়াছিল। এই সময়ে থিয়েটারের একটা যুগ-পরিবর্তন। ডাল নাটকের অভাব হওয়ায় থিয়েটারের অধ্যক্ষেরা নাটক লিখিতে আরম্ভ করেন। স্ত্রাশানালে গিরিশবাবুকে ও বেঙ্গলে বিহারী বাবুকে কলম ধরিতে হয়। উভয়েরই প্রথম নাটক রাবণ বধ। এই সময় হইতে অভিনে হৃগণের মধ্যে সাহিত্য প্রবেশ করে। বেঙ্গল থিয়েটারে বতই পরিবর্তন হউক, বিহারী বাবুর কর্তৃত্ব বরাবর অব্যাহত ছিল বলিয়া বেঙ্গল বিশেষ কোন বিপ্লবলায় পড়ে নাই। শেবে ১৩০৮ সালে বিহারীবাবুর মৃত্যু ঘটিলে বেঙ্গল থিয়েটার লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। মধ্যে যুবরাজ আলবাট ডিউর যখন কলিকাতায় আসেন, সেই সময়ে তাহার অভ্যর্থনা উৎসবে বেঙ্গল থিয়েটারের অভিনয় হয়, তদবধি বেঙ্গল থিয়েটার “রয়েল” এই বিশেষণবিশিষ্ট হইবার অধিকার পাইয়াছিলেন।

ধঃসকাল পর্যন্ত বেঙ্গলের এই নাম ছিল।

হুবিলাীর বৎসরে বাবু গোপাললাল ঝিল নাট্যশালা স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র মিত্র ও শ্রীযুক্ত অর্কেন্দ্রেশ্বর মুখার্জীর স্বতঃ বল গঠিত হয়। অতুল বাবুর “ভীষ্মের পরশব্যা”র আগড়াই বসে। অবশেষে বীভিন ট্রুটের ঠার থিয়েটারের বাটী এবং জমি ক্রীত হইলে, কেমারনাথ চৌধুরী ইহার অধ্যক্ষ হন এবং তাহার রচিত “শাওব-নিবাসন” অভিনীত হয়। থিয়েটারের এই আর এক যুগ। এক গিরিশ বাবু ও অমৃত বাবু বাহীত আর সমস্ত পুরাতন অভিনেতাকে অর্কেন্দ্রবাবু এই সম্প্রদায়ভুক্ত করিয়াছিলেন। এই থিয়েটারের ব্যয়ভূষণ যেমন হইয়াছিল, অভিনয়ও সেইরূপ হইয়াছিল। কিন্তু গোপাল-বাবুর বৃহদায়ে সমস্ত নষ্ট হইয়া গেল। চক্রান্তে পড়িয়া গোপালবাবু ছয় মণ্ডা পহেই কেমারবাবুকে ত্যাগ করিয়া গিরিশবাবুর হস্তে অধ্যাক্তা সমর্পণ করিলেন। গিরিশবাবু আনিয়াই কেমারবাবুর পুস্তক বন্ধ করিয়া নিম্ন রচিত “পূর্ণচন্দ্র” অভিনয় করাইলেন। পরে ক্রমশঃ নানা বিশৃঙ্খলা ঘটতে ঘটতে কাল এমারল্ড থিয়েটার ধ্বংস হইল। শেষে গ্রেট স্ক্যানালারের স্ক্রায় ইহাও ভাঙা দেওয়া হইতে লাগিল। প্রথমে হরিশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, মতিলাল সুর, ব্রজনাথ দাস ও মহেন্দ্রলাল বসু ভাড়া লন, তাহার পর মহেন্দ্রলাল বসু ও অতুলচন্দ্র মিত্র, তাহার পর মহেন্দ্রলাল বসু একা, তাহার পর অর্কেন্দ্রবাবু, অতুলচন্দ্র মিত্র, মতিলাল সুর ও নিমাইচরণ বসু, তাহার পর বেদ্যারসী দাস ভাড়া লইয়াছিলেন। এক্ষণে অমরেন্দ্রনাথ বসু এই নাট্যশালা ভাঙা লইয়া ক্যানিক-থিয়েটার নামে এক সম্প্রদায় গঠনপূরক যোগ্যতার সহিত অভিনয় চালাইতেছেন।

এমারল্ড থিয়েটারের পতন হইলে গিরিশবাবুর স্বস্তে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের নেতৃত্বে শ্রীনাগেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় স্ক্যানাল থিয়েটারের জমিতে ১৮২০ খৃষ্টাব্দে মিনার্ভা থিয়েটার নামে নতুন নাট্যশালা স্থাপন করেন। গিরিশবাবুর “ম্যাকবেথ” ও “মুন্সলমুন্সার” এখানকার প্রথম অভিনীত পুস্তক। অর্কেন্দ্রবাবু এখানকার নাট্যশিক্ষক ছিলেন। শ্রীদেবকী বাগচী এখানে সঙ্গীতাদ্যাপক হন। মিনার্ভা থিয়েটারের ধ্বংস ৩ বৎসরের মধ্যে ঘটে। এই সময়ে গিরিশবাবু কিছু দিন ধরে, কিছুদিন মিনার্ভায়, এইরূপে কাটায়েতেন। এক্ষণে শ্রীযুক্ত মদনমোহন পাণ্ডে মিনার্ভা থিয়েটার চালাইতেছেন। বুল অধিকারী নগেন্দ্রবাবুর হাত হইতে এই সম্পত্তি অনেক দিন বিক্রীত হইয়া গিয়াছে।

যখন এমারল্ড ধ্বংস হয়, সেই সময়ে কবি ব্রজব্রহ্ম রায় মেছুয়াবাজার ট্রুটে বীণা রত্নকুমারী নামে নাট্যশালা স্থাপন করিয়া বালক অভিনেতা বারী অভিনেত্রীর কার্য্য চালাইয়া ব্যবসা করিতে প্রবৃত্ত হন। তিনি সফলকাম হন নাই। শেষে চারি পয়সা করিয়া টিকিট বেচিয়াও হুবিধা করিতে পারেন নাই। পরে স্ত্রী-অভিনেত্রীও লওয়া হয়। কিছুতেই বীণা পাড়াইল না। ব্রজব্রহ্ম বাবু ঋণগ্রস্ত হইয়া বেচিয়া ফেলিলেন। সেখানে শ্রীনীলমাধব চক্রবর্তী (স্ক্যানাল থিয়েটারের অভিনেতা) সিটি থিয়েটার স্থাপন করেন। তাহাও অল্প দিন চলিয়াছিল। অবশেষে এক্ষণে এখানে এক হল পারদীপ নাট্য-সম্প্রদায় উদ্ভূত অভিনয় করিতেছেন। এখন বাঙ্গালার সকল জেলায় সখের রত্নকুমারী

কুট্ট হয়। সর্বত্রই থিয়েটারের আদর।

বঙ্গালীর নাট্যশালার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এট পর্য্যন্ত। এই সকল নাট্যশালা দ্বারা বঙ্গালী নাট্যসাহিত্য পরিপুষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু আভি ও নাট্যকলার বিশেষ উন্নতি হয় নাট। সময় ও বিষয়োচিত বেশ ভূষার পারিপাট্য হয় নাট, ইংরাজীতে যাহাকে মেক্ আপ্ (make up) বলে, তাহার কিছুই নাট। দৃশ্য পটাদির উন্নতি হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও তাহার যথোৎসৃষ্টি আসে নাই। প্রাকৃতিক পরিবর্তন দেখাইতে, দৃশ্য বোজন্যর কেন্দ্র সম্পাদন করিতে, দৃষ্টবিস্ত্রম ও বিশ্ব উৎপাদনের তত্ত্ব নানাক্রম যন্ত্রসাহায্য ও বৈজ্ঞানিক ব্যাপারের অমুদ্রাণ হইতেছে বটে, কিন্তু ইংলণ্ডের নাট্যশালার তুলনায় সে সকল বিষয়ে বঙ্গালার নাট্যশালা বহু পশ্চাৎপদ রহিয়াছে। সর্বাংশে একটি লক্ষিত হয় অভিনয় কলায়। এখন বঙ্গালী নাট্যশালায় দুইটা রীতিতে অভিনয় হইয়া থাকে। একটাকে গিরিশবাবুর দুল অর্থাৎ রীতি ও অপরটাকে মৃত্তকীর (অর্কেন্ বাবুর) দুল বা রীতি বলে। গিরিশবাবুর রীতিতে কি পদ্ম অভিনয়ে কি গল্প অভিনয়ে অভিনেতার। যেন একটা কবিতার সুর ধরিয়া শ্রোতৃস্বকর উপায়ে অভিনয় করিতে থাকে। ইহাতে সুরের উন্নয়ন ও অবনয়ন অতি ক্ষুদ্রতম নিম্পন্ন হয়। মৃত্তকীর রীতিতে কি গল্প কি পদ্ম কথোপকথনের সুরে অভিনীত হয়, কেহ কোনরূপ নকল সুর অবলম্বন করিয়া আগৃহীত করে না। ইহাতে আগৃহীত গুণে শ্রোতৃস্বকর করিবার দিকে দৃষ্টি দেওয়া অপেক্ষা বক্তব্য বিষয়ের ভাবের প্রতি বেশী লক্ষ্য রাখা হয়। গিরিশ-বাবুর রীতি আঙ্গকাল বহু বিস্তৃত। মৃত্তকীর রীতি তত বিস্তৃত হইবার অবকাশ পায় নাই। গিরিশবাবু বহু নাটক রচনা করিয়া এক্ষণে প্রধান নাট্যকার ও বঙ্গীয় গায়িক বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। আর অমৃতলাল বহু মহাশয় অভিনয়োপযোগী সামাজিক নাট্যরচনা করিয়া প্রসিদ্ধ হইনবন্ধু মিত্রের আসন লাভ করিয়াছেন। গিরিশ-বাবুর রীতি সহজে অভ্যস্ত হয় বলিয়া অল্পবয়স্ক অভিনেতার সংখ্যা আঙ্গকাল অনেক বেশী। পুরুষ অভিনেতা অপেক্ষা আঙ্গকাল স্ত্রী অভিনেত্রীরা বেশী উন্নতিপ্রয়োগিনী ও শিক্ষাপ্রিয় হইয়া থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

১

৭ ডিসেম্বর ১৮৭২ সালে কলকাতার আপার ডিংপুর রোডের সান্তাল বাড়ির (বর্তমান রবীন্দ্র সরণীর সন্নিকট বাড়ি) উঠানে জ্ঞানানাল থিয়েটার দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ নাটকের অভিনয় করেন। ঐ দিন সাধারণ দর্শকেরা টিকিট কিনে থিয়েটার দেখার সুবিধা ও সুযোগ সর্বপ্রথম লাভ করেন। সর্বসাধারণে এই দিনটিকেই বাঙালির নিম্ন স্বসাধারণ রঙ্গালয়ের জন্মদিন হিসাবে গণ্য করেন। পরের বছর এই দিনেই জ্ঞানানাল

থিয়েটারের দ্বিতীয় অঙ্গদ্বয়ের অঙ্কন পালন করা হয়। বিগত পঞ্চাশ বছর আগেও ঠিক এই মিনে কলকাতায় নাট্য-সম্প্রদায় মহাসমারোহে বাঙালির রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠার স্বর্ণ-জয়ন্তী পালন করেন। তখন প্রথম অভিনয়-রঙ্গমণ্ডির অভিনেতা রসরাজ অমৃতলাল বসু জীবিত। গত বছর ৭ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে বাঙালির রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার শত বৎসরের পূর্তি উৎসব আমাদের সামনেই অঙ্কিত হয়েছে।

বিগত উনিশ শতক ছিল বাঙালির নবজাগরণের দিন। এই সময়ে কলকাতা ও বাংলাদেশে অল্প সময়ের ব্যবধানে বিস্ময়করভাবে বাঙালি মনীষা দিক্‌দেশ ব্যাপ্ত করেছিল। এই সময়েই বাংলা নাটক প্রকাশ, প্রচার ও অভিনয় আরম্ভ হয়। জনসাধারণের অল্প সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠাও এই সময়ে।

রসরাজ অমৃতলাল বসু (১৮৫৩-১৯২৯) তাঁর স্বতিকথায়, ('ভুবনমোহন নিয়োগী' : মাসিক বঙ্গমতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪) বাঙালির সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার মূলে থাকা ছিলেন, সে বিষয়ে স্বতিচারণায় বলেছেন : 'আমি পেছন দিকে ফিরে যত বারই ভেবেছি, তত বারই আমার মনে হয়েছে যে, সে সময়ে ৪টি লোক না থাকলে এ দেশে সাধারণ নাট্যশালা স্থাপিত হতে পারত না। সেই ৪টি লোক হচ্ছে নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়— স্বতঃসিদ্ধ বোগাড়ে অর্থাৎ অর্গানাইজ করবার অধিতীয় ক্ষমতাসালী এবং এক জন বিশিষ্ট নট। ধর্মদাস সুর—বোগাড়ে নগেনের সহায় এবং হাতের কাজে বিশেষ পটু। অর্ধেন্দ্রশেখর মৃত্তকী—বিধাতার হাতেগড়া একটার ও অভুলনীয় নাট্য শিক্ষক। অর্ধেন্দ্র ছিল সেই রকম হাস্টার, যিনি কখন কোন ছেলেকে বলেন না যে, তোর কিছু হবে না, একটা ছ-কথার পাটের ডিতরেও মনে রাখবার মতন ছবি মুটিয়ে দিতে সমর্থ। আর ভুবনমোহন নিয়োগী—যার সাহায্যে প্রথম একটা দল বঙ্গাবার জায়গা পাই ও পরে বার টাকায় বিডন স্ট্রীটে একটি স্বপুঙ্খ নাট্যশালা স্থাপিত হয়।'

রসরাজ অমৃতলালের এই মন্তব্যে নিশ্চয়ই কেউ ভিন্নমত পোষণ করবেন না। বাংলা রঙ্গালয়ের অল্পতম প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে অর্ধেন্দ্রশেখর মৃত্তকী (১৮৫০-১৯০২) পরিচিত। বিনোদী থিয়েটারে ৭ ডিসেম্বর ১৯০০ সালে 'বাংলা সাধারণ নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার অষ্টাবিংশ সাপ্তাহিক-উৎসব উপলক্ষে' যে অধিবেশন হয়, তাতে বাংলা সাধারণ নাট্যশালায় ইতিহাস পর্যালোচিত হয়। এই অঙ্কনানে মহেন্দ্রনাথ রায় বিজ্ঞানিধি (১২৬০-১৩১২) ও অর্ধেন্দ্রশেখর মৃত্তকী যে বক্তৃতা করেন, সেটি পরে 'রঙ্গকুমি' ১৩০৮ সালে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকা অত্যন্ত দুস্রাপ্য। পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর, অমৃতচরণ বিজ্ঞানভূষণ-সম্পাদিত 'পঞ্চপুষ্প' পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬ ও ১৩৩৭ সালের জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়— এই তিন সংখ্যায় 'প্রাচীন পতী' শিরোনামে 'বাংলা সাধারণ নাট্যশালায় ইতিহাস' মুদ্রিত করেন। সংগ্রাহকের মন্তব্যে ছিল : 'বাগবাজার মদনমোহনতলা নিবাসী প্রসিদ্ধ প্রাচীন নাট্যকার স্বর্গত গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় আমাকে একখানি পুরাতন কীটস্টে Cutting Book দিয়াছিলেন। 'বাংলা সাধারণ নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার অষ্টাবিংশ সাপ্তাহিক-উৎসব উপলক্ষে ১৯০০ খ্রষ্টাব্দে, ৭ নভেম্বর [ডিসেম্বর], শুক্রবার (১৩০৭

বঙ্গালয়, ২২ অগ্রহায়ণ) দিখিলে মিনার্ভা থিয়েটারে' হরুদর স্বর্গত মহেন্দ্রনাথ বিজ্ঞানিদি ও অর্ধেন্দ্রেশ্বর মৃত্যুগী মহাশয় কলিকাতায় থিয়েটার সঙ্ঘকে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা উক্ত পুস্তকপানিতে সন্নিবেশিত ছিল। সেই বক্তৃতার সারাংশ অবলম্বন করিয়াই এই নিবন্ধ লিখিত হইল—লেখক।'

বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস নানাভাবে লিখিত। কিন্তু ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি দিয়ে নিরপেক্ষ আলোচনা বোধহয় কেউই করেন নি। এই রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস লেখার আগে, অভিনয়ের আলোচনা, নটদের জীবনী, স্মৃতিচারণ প্রভৃতির মাধ্যমে কিছু কিছু তথ্যাদি পরিবেশিত হলেও যথাযথ কিছুই করা হয় নি। বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসের প্রাথমিক তথ্যাদি এইসব লেখার মধ্যে কিছু-কিছু পাওয়া যায় :

১. রঙ্গতুমির ইতিহাস, মহেন্দ্রনাথ রায় বিজ্ঞানিদি। 'পুরোহিত ও অতুলীন', ১৩০১-১৩০৪ সাল। এগুলি নিয়ে যে গ্রন্থ হয়েছে—দেটির নাম—'সম্পর্ক সংগ্রহ', ১৮২৭ সাল।

২. বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস। 'বিশেষজ্ঞ' লিখিত। 'রঙ্গালয়' ১৩০৭ ও ১৩০৮ সাল।

৩. বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস। 'রঙ্গতুমি', ১৩০৮ সাল।

৪. বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস। বোমকেশ মুস্তফী। 'ভারতী', আবণ-ভাত্র (যুগ সংখ্যা) ১৩১৪ সাল।

৫. বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস। বোমকেশ মুস্তফী। 'বসুনা', বৈশাখ ১৩১৭ সাল।

৬. বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস। বোমকেশ মুস্তফী। 'রঙ্গমঞ্চ', আবণ-ভাত্র ১৩১৭ সাল।

৭. বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস। প্রথম ভাগ। 'বিশেষজ্ঞ' লিখিত। আটটি প্রস্তাব। 'নাট্যমন্দির', অগ্রহায়ণ-চৈত্র ১৩১২ সাল।

এই 'বিশেষজ্ঞ' ছিলেন উত্তর কলকাতার বাগবাজারের ১ লক্ষী দত্ত জেন-নিবাসী ক্রিয়চক্র দত্ত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত তাঁর 'গিরিশচন্দ্র', (মার্চ ১২৪৪) গ্রন্থের নিবেদনে বলেছেন : 'কোন বিশেষ কারণে লেখককে ১৩০৭, ১৩০৮ সালে বঙ্গীয় নাট্যশালার (প্রাথমিক) ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া রঙ্গালয় নামক সাপ্তাহিক পত্রে ('বিশেষজ্ঞ' নামে) প্রকাশ করিতে হয়।...পরে নাট্যমন্দির সম্পাদক—নাট্যকার ও নাট্যরথী অমরেন্দ্রনাথ দত্তের অহরোধে পূর্বোক্ত বঙ্গীয় নাট্যশালার (প্রাথমিক) ইতিহাস... (নাট্যমন্দিরে)...বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়।'

উপরেরগুলি সবই ছিল সাময়িক পত্রে প্রকাশিত রচনা। এর পর বঙ্গীয় রঙ্গালয়ের প্রাথমিক ইতিহাস পাওয়া যায় :

১. 'গিরিশ গীতাঙ্গী' (১৩১০ সাল)। অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

২. 'বিশ্বকোষ' (১৩৬ খণ্ড। ১৩১২ সাল)। 'রঙ্গালয়' শব্দের পর 'রঙ্গালয় (বঙ্গীয়)'র মধ্যে বঙ্গীয় রঙ্গালয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আছে। রচনাটিতে লেখকের নাম নাই।

অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের 'গিরিশচন্দ্র' (১৩৩৪) গ্রন্থ পাঠে জানা যায়, অর্ধেন্দু-শেখর-পুত্র বোমকেশ মুস্তফী (১৮৬৮-১৯১৬) ইহার রচয়িতা। এই রচনাটির একটি-বিভূতি সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র যোব স্বয়ং বহু অর্ধেন্দুশেখরের স্মৃতিসভায় বরচিত প্রবন্ধ পাঠ কালে উল্লেখ করেন। সভায় উপস্থিত 'বিশ্বকোষ' সম্পাদক জানান যে, 'বিশ্বকোষে প্রকাশিত রঙ্গালয় প্রবন্ধটি অর্ধেন্দুশেখর পুত্র বোমকেশবাবু আমাকে লিগিয়া দেন।' অমৃতদাল বহুও বলেছিলেন, "একটু আঘট হুল আছে।"

সম্প্রতি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ত্রৈমাসিকোত্তীর্ষ দ্বাশ-সংকলিত সাহিত্য-সামগ্রী চরিত-মালায় 'বোমকেশ মুস্তফী'র জীবনী প্রকাশ করেছেন। অনবধানতাবশত লেখক বোমকেশের রচনাগুলির তালিকা সংকলনের মধ্যে 'বিশ্বকোষে' মুদ্রিত বোমকেশের এই অমূল্য রচনাটির উল্লেখ করেন নি, এমন কি বোমকেশের নাট্য-আন্দোলন সম্পর্কে বধ্যায্য অবস্থানের বিষয়ও দেন নি। বোমকেশের 'ভারতী' প্রাবণ-ভাত্র ১৩১৪ সালের লেখাটিও উল্লেখ করা হয় নি।

বড়ই আশ্চর্যের বিষয়, 'বিশ্বকোষে' প্রকাশিত বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসের এই প্রাথমিক উপকরণটি অত্যন্ত অবহেলিত হয়ে পড়ে আছে। প্রায় চল্লিশ বছর আগে ত্রৈমাসিক নাট্য-সমালোচনা নানা সাময়িকপত্র-উপকরণ সংগ্রহ করে বঙ্গীয় নাট্যশালার প্রাথমিক পর্যায়ের ইতিহাস-পুস্তক ভৈরাগী ১৩৪০ সালে প্রকাশ করেন। এর তৃতীয় সংস্করণে (ফাল্গুন ১৩৫৩) বর্তমান রূপ প্রকাশ পায়। বর্তমান প্রবন্ধকার ত্রৈমাসিকের সহায়করূপে যুক্ত ছিলেন ও এই সংস্করণ তাঁর সহায়তায় লিখিত।

ত্রৈমাসিকের সমকালে হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত *Indian Stage* ও 'ভারতীয় রঙ্গমঞ্চ' প্রকাশ করেন। এর আগে জামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় *Calcutta Review* পত্র (এর বাংলা অনুবাদ জামা প্রসাদ রচনাবলীতে আছে) প্রকাশ করেন। প্রভু গুহর্টাহরতার বিলাতে প্রকাশিত *Bengali Drama* ও এ-গ্রন্থে উল্লেখযোগ্য। তবে এ দুটিকে Examination Papers হিসাবে ধরতে হবে। আধুনিক কালে শ্রীশ্রী মিত্র (শ্রীঅরবিন্দ গুহ) 'সাক্ষর' (মাঘ ১৩৬৭) প্রকাশ করেছেন। সবশেষে শ্রীঅমল মিত্রের 'কলকাতায় বিদেশী রঙ্গালয়' (শ্রাবণ ১৩৭৪) উল্লেখযোগ্য।

ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফীই সর্ব প্রথম বঙ্গীয় নাট্যশালার প্রাথমিক ইতিহাস বিবৃত করেন। এর মধ্যে মহেন্দ্রনাথ রায় বিজ্ঞানিধি বিধিবদ্ধভাবে সাময়িকপত্রে ও পুস্তকাকারে নাট্যশালার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন ও, তিনি সহায়তা পেয়েছিলেন অর্ধেন্দুশেখর। বোমকেশ ছিলেন মহেন্দ্রনাথের প্রিয় ছাত্র ও স্নেহে আবদ্ধ। দেখা যায় মহেন্দ্রনাথ ও অর্ধেন্দুশেখর ১৯০০ সালে ৭ ডিসেম্বর বঙ্গীয় নাট্যশালার ২৮ বর্ষ-পূর্তি উৎসবে একত্রে পর-পর বঙ্গীয় সাধারণ রঙ্গালয়ের ইতিহাস লিখেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এর আদিকল্প ছিলেন অর্ধেন্দুশেখর। অর্ধেন্দুর পুত্র বোমকেশ মুস্তফী নাট্যশালার ইতিহাস লেখায় পিতার সহায়তা পেয়েছিলেন।

ক্রমে ভাগ্যান্বেষণে অর্ধেন্দুশেখর নানাভাবে তাঁর প্রাণ্য সম্মান থেকে বঞ্চিত হচ্ছিলেন,

সে সময়ে পিতার সপক্ষে বোম্বেকেন একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এটি 'বঙ্গীয় নাট্যশালা'। প্রকাশক নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত। প্রকাশকাল ১৩১৬ বঙ্গাব্দ। এটিতে অর্ধেন্দু-প্রসঙ্গ বিশেষভাবে উল্লেখ থাকায়, বাস্তবদের অহুরোধে বোম্বেকেন তাঁর নাম 'বঙ্গীয় নাট্যশালা'র উল্লেখ করেন নি।

বোম্বেকেন মৃত্যুঞ্জয় রচনাগুলি প্রকাশের পর বিপিনবিহারী গুপ্ত 'পুরাতন প্রসঙ্গ' দ্বিতীয় পর্বাণ (১৩১০) গ্রন্থে অমৃতলাল বসু ও রাধামাধব কর-এর স্বত্বিকথা নিপিবদ্ধ করেন। এগুলি প্রকাশিত হয়েছিল 'মানসী ও মর্ম্মবাকী'র প্রথম বৎসর (১৩২২-২৩) থেকে। এই স্বত্বিকথাগুলিতে বঙ্গীয় রঙ্গালয়ের প্রাথমিক ইতিহাস নিপিবদ্ধ হয়েছে। বঙ্গীয় রঙ্গালয়ের ইতিহাস আলোচনায় দুটি প্রয়োজনীয় মূল্যবান তথ্য সকলেই বাদ দিয়ে গেলেন।

১. মহাবি-ভবনে অল্পকাল কয়েক বৎসরের নাটকাদিনয়। 'বিবক্ষন-সমাগমে' এখানে কয়েকটি গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য অভিনীত হয়েছিল। এই অল্পকালের বৃত্তান্ত আমি সর্বপ্রথম একাদিক আলোচনায় প্রকাশ করি। স্বপ্নের বিষয় একমাত্র শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'রবীন্দ্র জীবনী'তে এটি উল্লেখ করেছেন। দ্বিবেশনাথ-জ্যোতিব্রহ্মনাথ-রবীন্দ্রনাথ ছিলেন 'বিবক্ষন-সমাগমে'র প্রাণস্বরূপ। এই সাক্ষ্যামণ্ডিত অল্পকালে অভিজাত সমাজের পুরুষ ও মহিলা ছিলেন।

১৮৭২ সালের ৭ ডিসেম্বরের সময় থেকেই সাধারণ রঙ্গালয়ের স্বচনা। কয়েক বছরের মধ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অভিনয়ের স্বচনা হতে থাকে। এটিকে কেউ ভালভাবে গ্রহণ করেন নি। অভিনেত্রী সমাগমে সাধারণ লোকে আতঙ্কিত হয়। মহাবি-ভবনের অভিনয়-সাক্ষ্যে দেশবাসী এতই আশঙ্ক হয়েছিলেন যে তাঁরা মহাবি দ্বেশনাথকে নাট্যশালায় পরিচালনার জ্ঞান অপ্রাপ্ত জানিয়েছিলেন। 'সোমপ্রকাশ' (২৩ কার্তিক ১২৮৮) সংখ্যায় বলা হয়েছিল : 'যেদিন মহাবি দ্বেশনাথ ঠাকুর মদন কোন মহাত্মা নাট্যশালায় নেতা হইলেন, সেই স্বপ্নময় দিন চইতে দেশীয় নাট্যশালাগুলি উন্নতিমার্গে পূর্ণার্পণ করিতে সমর্থ হইবে।...কিছুকাল গত হইল মহাবি দ্বেশনাথ ঠাকুরের আশ্রমে বিবক্ষন সমাগম উপলক্ষে বাম্পীকি প্রতিভা অভিনয়ে কবি রবীন্দ্রনাথ ও হুজুমারীর প্রতিভা আমাদের ক্ষণে সে বিশ্বাস দৃঢ় করিয়া দিয়াছে...'।

২. আর একটি বিষয়—বেঙ্গল থিয়েটার ১৮৭৩ সালে অভিনেত্রী সংযোগে অভিনয় আরম্ভ করেন। এতে তাঁরা দোহাই দেন, মাইকেল বহুসদনের পরামর্শে তাঁরা এ কাজে নেমেছেন। কৌতুকের বিষয় কোন অসুস্থদান না করে নাট্যশালায় লেখকরা এখাবৎ ঐ এক কথাই বলে আসছেন। ২২ বৈশাখ ১৮৮১ সালে 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশিত কৈলাস-চন্দ্র বহুর একটি প্রতিবাদে জানা যায় : 'রঙ্গকুমির অধাক যুকেরা কতকগুলি বেশ্য লইয়া রঙ্গবাণীর নিকাহ করেন বলিয়া সাধারণে তাঁহাদিগকে সর্কদাই নিন্দাবাদ করিয়া থাকেন। তাঁহারা স্ব স্ব দোষকালার্থে বা আপনাদের মত পুষ্ট করণার্থে কবির দম্ভজ মহাশয়কে ঐ কুসংসিদ্ধ ধাপারের প্রবর্তক ও উৎসাহদাতা বলিয়া প্রচার করেন।...'

তাহারা প্রকৃত সত্যের অপলাপ করিয়া, অমূল্যস্থলের পরিচয় দিতেছেন। এট যুগাকর, লক্ষ্যাকর এবং সমাজের সমধিক অনিষ্টকর ব্যাপারে প্রবৃত্তি উৎসাহ দেওয়া, সজন্ম মাইকেলের কার্য নহে।... একজন সর্বজন পরিচিত মৃত ব্যক্তির স্বক্ষে সেই দোষ চাপাইয়া দেওয়া হইতেছে।... বেতাভক্ত নটমণ্ডলীর কথা শুনিয়া, দত্ত মহাশয়কে এ-বিষয়ে দোষী মনে না করেন।'

এই কথা দুটি ত্রিবিধ্য ঘোষ সম্পাদিত 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র' চতুর্থ খণ্ডে (জুলাই ১৯৬৬) পাওয়া যাবে।

প্রসন্নত বলা যায়, পিতা অর্ধেক বলা হয় 'থিয়েটারের মিশনারি'। পুত্র বোমকেশ সাহিত্য-পরিষদের মিশনারি। তিনি বর্তমান সাহিত্য-পরিষৎকে রক্তমাংস দিয়ে প্রাণ-স্ফূর্ত করাইলেন।

'এক্ষণে' প্রকাশিত বোমকেশের লুপ্তপ্রায় রচনাটির পুনর্মুদ্রণে বর্তমান পাঠকগণ একটি বিম্বত অধ্যায়ের ইতিহাস পাবেন। এটিকে এভাবে পুনর্জীবন দান করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি।

সনৎকুমার গুপ্ত

২

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বহু (১৮৬৯-১৯৬৮) সংকলিত 'বিশ্বকোষ'-এর সম্পাদনা-ব্যাপারে বখেটে সহায়তা করেছিলেন সাহিত্যসেবী বোমকেশ মুস্তফী (১৯০৫-১৯২২ বঙ্গাব্দ)। কোষগ্রন্থের অনেক প্রগতি এবং শব্দের টীকা তাঁর লেখা। 'বিশ্বকোষ'ের প্রথম সংস্করণে স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেক প্রবন্ধলেখকের নামোল্লেখের রীতি ছিল না। সেই কারণে বোমকেশের রচনা সঠিকভাবে সনাক্ত করানো গেলেও সম্পাদকের নিজস্ব যুগবন্ধে (২২শ ভাগ) তাঁর এই অবদানের স্বীকৃতি আছে।

সেকালের অনন্য অভিনেতা ও পরিচালক অর্ধেকশেখর মুস্তফীর (১৮৫০-১৯০৮) জ্যেষ্ঠপুত্র বোমকেশ। রুতী পিতার অকৃত্রিম নাট্যাভিরাগ উপযুক্ত আধার সন্ধানের মধ্যে সকারিত হয়েছিল। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তত্ত্বচিত্র 'দীনবন্ধুর নাটকীয় প্রতিভা' (সাহিত্য, ১৩১০ কালিক), 'এ দেশের নট-জীবন' (সাহিত্য, ১৩১৫ অগ্রহায়ণ), 'যাত্রায় আবৃত্তি' (ভাষাবী, ১৩১৫ পৌষ), 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' (হুমু, ১৩১৭, বৈশাখ), 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' (রঙ্গমঞ্চ, ১৩১৭ শ্রাবণ ও ভাদ্র), 'নাট্যকার গিরিশচন্দ্র' (মানসী, ১৩১৮ চৈত্র) লিখক বহু প্রবন্ধে বোমকেশের অভিনয়শ্রীতির নজির মেলে। তাঁর এইসব রচনার সৃষ্টিভঙ্গি ও রচনাশৈলীর সঙ্গে মায়ুভা দেগে তৎকালে অনেকেই মনে করতেন যে 'বিশ্বকোষ' গ্রন্থাবলীর 'রঙ্গালয়' অংশ বোমকেশ মুস্তফীর লেখনীপ্রসূত (অথবা তথ্যসাহায্যপুষ্ট)। এবং তাঁদের অভিযোগ, পিতৃকৃত্য পালনের উৎসাহে তাঁর এই প্রবন্ধে কোথাও কোথাও সত্যের অপলাপ হয়েছে।

যে কোনো কারণেই হোক, পিতৃভক্ত বোমকেশের ধারণা হয়েছিল তাঁর প্রতিভা-
বান জনকের সহকর্মী বাহুবোরা এবং তৎকালীন সমালোচক ও ঐতিহাসিকগণ তাঁকে
(অর্ধেকশেখরকে) প্রাণ্য মর্যাদা দিতে কার্পণ্য করেছেন এবং সেই ত্রুটি কালধের
উদ্দেশ্যেই তিনি রত্নালয়ের ইতিবৃত্ত রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। তৎসংলগ্ন নাট্যালা-
সংক্রান্ত অজ্ঞাত প্রবন্ধেও অর্ধেকপ্রতিষ্ঠার হুম্ব প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত,
অধুনালুপ্ত ‘নাট্যমন্দির’ পত্রিকার চৈত্র, ১৩১২ সংখ্যায় ‘বিশেষজ্ঞ’ (কিরণচন্দ্র দত্ত)
লিখিত ‘বঙ্গীয় নাট্যাশালার ইতিহাস’ প্রবন্ধমালার উপসংহারে অভিযোগের তরে বলা
হয়েছে : ‘...অধুনা পরলোকগত পূজাপাদ পণ্ডিতবর মহেন্দ্রনাথ বিজ্ঞানিধি মহাশয়
তাঁহার ‘পুরোহিত ও অচ্যুতলন’ নামক মাসিক পত্রে (১৩০১।৪) নাট্যাশাল-সংক্রিয় যে
সকল প্রসঙ্গ লিপিত্যছিলেন—সেইগুলিতে, ‘রত্নালয়’ পত্রের সমসাময়িক ‘রত্নকৃষি’
নামক এক কুহায়তন অন্নদিন স্থায়ী সাপ্তাহিক পত্রে প্রকাশিত নাট্যাশালার ইতি-
হাসিক কুহ কুহ প্রত্যাগগুলিতে ও বহুবিস পরে ১৩১২ সালে প্রকাশিত ‘বিশ্বকোষ’
অভিধানের ১৬৭ ভাগের ‘রত্নালয়’ (বঙ্গীয়) শব্দে প্রকাশিত ইতিবৃত্তে আমরা একই
কথা বরাবর শুনিয়া আসিতেছি। অচ্যুতলনেও আমরা অবগত আছি যে ঐ সকল
তথ্যের সংগ্রাহক বা সাহায্যকারী একই ব্যক্তি। এবং ঐ সকল প্রত্যাগ উল্লিখিত
ভিন্মাখি পত্রে বা গ্রন্থে পাঠ করিলেই যে কোন পাঠক তাহা সহজে বুঝিতে পারিবেন
—ইহাই আমাদের ধারণা। পাঠকগণ দেখিবেন নটকুলচূড়ামণি অর্ধেকশেখরের নাট্যা-
কৃতিত্ব ও বঙ্গীয় নাট্যাশালার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ শ্রেষ্ঠরূপে প্রতিষ্ঠিত করাই ঐ সকল
প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য। আমরা আত্মবিশ্বাসেই অর্ধেকশেখরের গুণমুগ্ধ। তাঁহার অনন্ত-
সাধারণ নাট্যাশালা-প্রীতি, তাঁহার অসাধারণ নানা রসাদিনয়ে সমান যোগ্যতা, হাস্ত-
রসাদিনয়ে তাঁহার সর্বোপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব বঙ্গের নানা প্রাদেশিক ভাষার উচ্চারণ ও
নানাজাতীয় লোকের স্বরানুকরণ করিবার তাঁহার অসামান্য পটতা এবং প্রাণপাতী
পরিচর্য্যে অভিনয় শিক্ষাদানে তাঁহার অনন্তসাধারণ অধ্যবসায়ের কথা কাহারও
অবিদিত আছে বলিয়া বোধ হয় না। নানাগুণে তিনি দেববানী মায়েই প্রকৃতভাষন।
কিন্তু বঙ্গীয় নাট্যাশালায় তাঁহার সমকক্ষ প্রতিভাশালী দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই বা ছিল না,
কিন্তু সমসাময়িকগণের মধ্যে তিনিই অভিনয়-কলায় সর্বদিয়ে সর্বোপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং
তিনিই যে বঙ্গীয় নাট্যাশালার Father বা Founder অর্থাৎ জনক বা প্রতিষ্ঠাতা
একথা আমরা ঐ সকল প্রবন্ধে ও অজ্ঞাত স্থানে সে মাঝে মাঝে শুনিতে পাই বা পাঠ
করি, উহা কি ঠিক ? স্বার্থের গড় উচ্চাতে পাওয়া যায় না কি...বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে
প্রবৃত্তস্বাস্থ্যসঙ্কট পত পত মহাশয় থাকিতে বোমকেশবাবু যেখানে স্বার্থে ভুজিত সে
সকল ইতিবৃত্তের আবিষ্কারে বা উদ্ধারে তিনি নিজে ব্রতী হন কেন ?’

এই অর্ধেকপ্রীতির আধিক্যবশতই বোধকরি সে যুগের অল্পতম বিশিষ্ট অভিনেতা
ও পরিচালক রাধামাধব কর মন্তব্য করেছেন : ‘...বিশ্বকোষের লেখক ঐ ‘রত্নালয়’
প্রবন্ধের লক্ষ্য বালমঙ্গলা আমার নিকট হইতে কিছু সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু যে

কারণেই হউক, বাদ্যলার রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে অর্ধেকশতকের আবির্ভাবের পরবর্তী অংশটা লেখকের হস্তে বিকৃত হইয়া গেল।' (পুরাতন প্রসঙ্গ, নিপিনবিহারী ওপ্ত)

গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২), অমৃতলাল বসু (১৮৬৩-১৯২৯), রাধামাধব কর (১৮৬৩-?) প্রমুখ নাট্যকর্মী গারা আমাদের দেশে সাধারণ রঙ্গালয়ের গোড়াপত্তনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, তাঁদের অনেকেই নৃত্যিকথা বা বক্তৃতার মাধ্যমে সেমুণের ইতিহাস বর্ণনা করে গেছেন এবং তাঁদের বক্তব্যের সঙ্গে 'রঙ্গালয়ে' উল্লিখিত তথ্যাবলির কোথাও কোথাও মিল নেই। পূর্বোক্ত ত্রয়ী তো স্বার্থহীন ভাষায় লেখকের বিরুদ্ধে তথ্য-বিকৃতির অভিযোগ এনে ভ্রম-সংশোধনে তৎপর হয়েছেন। বর্তমান কালের নাট্যমোদীদের পক্ষে হাতে তালীস্বন নাটেতিহাস সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ধারণার উত্তরণ সহজসাধ্য হয়, এই উদ্দেশ্যে প্রাগুক্ত মঞ্চসেবীদের অভিচারণ থেকে সংশোধনী মন্তব্যগুলি পরবর্তী পর্বায়ে উদ্ধৃত হচ্ছে। আমাদের বিশ্বাস, ব্যক্তিপ্রাধান্যের বিতর্কিত অংশটুকু বাদে পুনর্মুদ্রিত 'রঙ্গালয়' ইতিহাসপাঠকের চাহিদা। বহুল পরিমাণে পূরণ করবে।

'রঙ্গালয়'-প্রণেতার ভুল তথ্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সব থেকে মূগর হয়েছিলেন রাধামাধব কর। হতরাং প্রথমে তাঁর বক্তব্যই উপস্থাপিত করা শ্রেয়। 'পুরাতন প্রসঙ্গ'র লেখক নিপিনবিহারী ওপ্তের কাছে 'লীলাবতী' অভিনয়ের উদ্যোগ পর্বের নৃত্যবর্ণনা উপলক্ষে তিনি জানিয়েছেন : 'লীলাবতী'র অভিনয় হইবে। . ব্রজবাবুর বাড়ীতে ঠেকের প্রাটকরম ও অস্ত্রাঙ্গ মালপত্র কিছু ছিল। তিনি তখন অস্ত্রাঙ্গ পীড়িত। আমরা তাঁহার বাড়ী হইতে ষ্টেজ সরাইয়া লইয়া খাইতে অল্পমতি প্রার্থনা করিলাম। তিনি সম্মত হইলেন। আমরা সেই রাত্রিতে সমস্ত মালপত্র ঘাড়ে করিয়া লইয়া হানাহুরিত করিলাম। বিশ্বকোষের লেখক বলিয়াছেন যে আমরা অর্থাভাবে নিজেরা ঘাড়ে করিয়া ছিন্দিবগুলি লইতে বাধ্য হইয়াছিলাম। কথাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমরা গোলযোগ না করিয়া চূপিচূপি কাজ সারিব মনে করিয়া ঐরূপ করিয়াছিলাম। বিশ্বকোষের 'রঙ্গালয়' প্রবন্ধের এই অংশে কত ভুল আছে দেখিবেন ? এই ভ্রমের ১৯০, ১৯১, ১৯২ পৃষ্ঠায় আপনাকে দেখাইয়া দিতেছি।

(১) গোবর্দ্ধন রাজপথ সীন-এ আঁকিয়াছিল, এইরূপ লেখা আছে। 'লীলাবতী'তে রাজপথের সীনই ছিল না।

(২) ধর্মদাস তুলি ধরিলেন। ঠিক কথা; কিন্তু একা নয়; কেহ ও আটতুলের অস্ত্রাঙ্গ ছাড়াও সীন আঁকিয়া দিয়াছিল।

(৩) মতিবাবু, মহেন্দ্রবাবু, নগেন্দ্রবাবু, অর্ধেন্দ্রবাবু কেহই টাকা দিয়া দল বজায় রাখেন নাই।

(৪) অর্ধেন্দ্রবাবু এ সময় টিকিট বেচিবার প্রস্তাব করেন নাই; মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারা এ প্রস্তাব পূর্বেই উপস্থাপিত হইয়াছিল।

(৫) শুধু অর্ধেন্দ্রবাবু নয়, দলের অস্ত্রাঙ্গ সকলেই ষ্টেজ ব্রজবাবু নিকট হইতে প্রার্থনা করেন।

(৩) অর্থ-কষ্টের জন্য আমরা ভিনিষগুলো বিক্রয় ঘাড়ে করিয়া আনিয়াছিলাম, ইহা মিথ্যা কথা। ধর্মদাস হরের বাড়ীর সম্মুখে একটা ছোট মাঠ ছিল, সেইখানে ঐ কাঠ-গুলো আমরা রাখিলাম। সেই মাটিফরমের উপরে আমাদের টেবল খাড়া হইল।

(৭) ধর্মদাস ও রক্তেশ মাফলিন্কে রাগে নাই; রক্তেশবাবুর সঙ্গে তখনও আমাদের দলের সম্বন্ধ গাঢ়িত হয় নাই।

(৮) বৃন্দাবন পালের বাড়ীতে টেবলের ভিনিষগুলো লইয়া ঘাটবার সময় অর্ধেকদুপুর কোনও কথাই বলেন নাই; এসকল ব্যাপারে তিনি মোটে কথাই কহিতেন না।

(৯) রক্তেশবাবুর বাড়ীতে আশ্রয় লইয়া আমাদের টিকিট বেচিবার আশা ত্যাগ করিতে হয় নাই।

(১০) ইহার বহুপূর্বে নবগোপাল মিত্র আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন।

(১১) Calcutta National Theatre নামকরণের প্রস্তাব আদৌ উল্লিখিত হয় নাই; নবগোপালের মূণ হইতে এরূপ অসঙ্গত নাম কখনই প্রস্তাবিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

(১২) হিন্দুল খার দ্বারা উড়িয়ার ভূমিকা সুবিদায়নক হইল না এমন কথা লেখকের কলম হইতে বাহির হইল কেমন করিয়া? উড়িয়ার ভূমিকায় হিন্দুল গা অধিষ্ঠিত ছিল।

(১৩) শশী বিশাড়ীকে অর্ধেক একশ কোথা হইতে পাইবেন? কথ বৎসর পরে সে ক্যান্ডাল বিয়েটারে আসিয়া ঘুটিল, লেখকের তাহা নিশ্চয়ই সজ্ঞাত।

(১৪) শশীকে অর্ধেক উড়িয়া ভাষা শিখাইবেন কি, শশী এমনি এতদ ছিল যে সে অর্ধেককে শিখাইতে পারিত।

(১৫) টেবলও পচে নাই, দলও ভাঙে নাই। রক্তেশ পালের দালানে এরকম চারটে টেবলের সমস্তই রাখিবার জায়গা ছিল।

(১৬) অর্ধেকদুপুর দল গড়িবেন কি? নগেনবাবুই দল গড়িলেন। অর্ধেকদুপুর ২নের লক্ষ্যকতা করিতেন; ওসব ভাঙ্গাগড়ার দিকেই ঘাইতেন না।

(৭) এই সময়ে গিরিশবাবু কোনও সপের ব্যতীর দল বসান নাই; কোনও সঙ্কল্পের পালা বাধেন নাই। উনি আপিসে বসিয়া 'লুপ্ত-বেণী' গানটি রচনা করিয়া আমাদের এই বাড়ীতে আসিয়া গানটি আমাদের দিকে গাইতে বলেন; এই বাড়ীতে বসিয়া ঐ গানের হর ধরা হয়।

(১৮) আমি গিরিশবাবুর দলে যোগ দিব কি, তাহার দল কোথায় ছিল? 'তৌপদীর বস্ত্রহরণ' ব্যতীর দুইটা সঙ্কল্পেও হইয়াছিল,—সাপুড়ে ও বাউল। নটবর, ওরফে নাটুদা, সাপুড়ে সাজিয়াছিল; আর আমি বাউল। বাউল সাজিয়া আমি ঐ গানটি গাইয়াছিলাম।

(১৯) 'অমৃত বরষে'—অমৃত পাল নয়, তুনি বোস [অমৃতলাল বসু।—শি. ব]।

বাক্, আর ছোট বড় কত ভুল আপনাকে দেখাইব? (পুরাতন প্রসঙ্গ, বিশিষ্ট-

বিহারী গুপ্ত। ২য় বিদ্যাবার্তী সংস্করণ, ১৩৭৩)।

কিন্তু এখানেই তাঁর তালিকা শেষ হয় নি। আরো একটি তুলের কথা রাখাযাব্ব কর উল্লেখ করেছেন স্মৃতিচারণের শেষে। সে একটি কালনির্ধৃত সংকল্প। তিনি বলেছেন : '১৮৭৪ খ্রষ্টাব্দের পূজার সময় লক্ষ্মীনারায়ণ দত্তের চোরগাগানের বাড়ীতে 'সধবার একাদশী' ও 'বিদ্যে পাগলা বুড়ো' অভিনীত হইল। গিরিশবাবু একটা নটনটীর Prologue রচনা করিয়া গেলেন। এই অভিনয়ের জন্য আমাকে মালদহ হইতে আসিতে হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে বিশ্বকোষের chronology আগাগোড়া ভুল।' (এ)

'লীলাবতী'র পরবর্তী অধ্যায়ে বাগবাজারের দল 'নীলদর্পণ' মঞ্চস্থ করে (৭ ডিসেম্বর, ১৮৭২)। আর তার ফলে আমাদের দেশে সাধারণ রঙ্গালয়ের জন্ম হয়। 'নীলদর্পণ' নাটকের অভিনয়প্রয়াসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন অমৃতলাল বহু। এই সময়কার ইতিহাস বর্ণনা প্রসঙ্গে 'রঙ্গালয়ে' সে সকল তথ্যবিব্রাঙ্তি ঘটেছে, 'পুরাতন প্রসঙ্গ' গ্রন্থে তিনি তাদের উল্লেখ করেছেন। অমৃতলাল বলেছেন : 'বিশ্বকোষ অভিধানে 'রঙ্গালয়' শীর্ষক প্রবন্ধে একটু অধটু ভুল রহিয়া গিয়াছে। প্রথম দেখুন—রেবতীর কুমিকা লইয়াছিলেন তিনকড়ি মুণোপাধ্যায়, তিনকড়ি মারা নহে। তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়ের আমরা 'ঠাকুরদা' বলিয়া ডাকিতাম, যদিও তাঁহার বয়স বেশী ছিল না। আবার, দেখুন, গিরিশবাবুর গানে আছে—'কলকিত শশী হয়বে, অমৃত বরবে' ; এখানে বিশ্বকোষের লেখক টকা করিয়াছেন—'অমৃত বরবে—অমৃতলাল পাল, একজন অভিভাবক।' অথচ সকলেই জানিতেন যে ঐ 'অমৃত' সৈরিক্তীবেনী অমৃতলাল বহু। সৈরিক্তীর অক্ষবর্ণনের উল্লেখ করিয়া 'অমৃত বরবে' লেখা হইয়াছে। আর অমৃতলাল পাল কোনও কালে 'অভিভাবক' অথবা থিয়েটারের ভাবুকও ছিলেন না। এই রকম ছোটখাট অনেক ভুল উক্ত প্রবন্ধে আছে। পুনশ্চ দেখুন, লেখক একস্থলে বলিতেছেন,—নবীনমাধবের মৃত্যুশয্যার দৃশ্যে সৈরিক্তীকে যে 'মড়াকালা' কানিতে হইত, অমৃতবাবু সহজে তাহা আয়ত্ত করিয়া উঠিতে পারেন নাই। শেষে অমৃতবাবু নিজ বাড়ীর পার্শ্বস্থ একটা পানি ডাক্তারবাড়ীতে প্রত্যাহ হুপ্রহর ধোয়া গিয়া এই ক্রন্দন শিখিবার জন্য সাধনা করিতেন। অর্ধেকশয্যা সেখানে গিয়া কানিতে শিপাইতেন, উভয়ে গলা মিলাইয়া কাশা অভ্যাস করিতেন। আটদশ দিন এইরূপ সাধনায় অমৃতবাবু মড়াকালা আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিলেন।...এই বর্ণনার কিছু গলদ আছে।... প্রত্যহ ঐ পোড়ো বাড়ীতে দ্বিপ্রহরে আমি মড়াকালা অভ্যাস করিতাম। একাকী করিতাম ; অর্ধেকশয্যা অথ কেহ আমার দোশর ছিলেন না। কয়েকদিন পরে আমি অর্ধেকশয্যা বলিলাম, 'একবার আমার কান্নার আয়গাটা শোনো দেখি।' মড়া-কান্নার অভিনয় দেখিয়া তিনি সানন্দে আমার হাত ধরিয়া বলিলেন—'বহৎ আচ্ছা ! বেশ হয়েছে।' আমার নাট্যজীবনে অর্ধেকশয্যা আমার প্রথম গুরু বটে ; কিন্তু এই কান্না সাধনায় আমি গুরুকে লুকাইয়া স্বয়ং সিঙ্ক্লাভ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। আমার নাট্যগুরু অর্ধেকশয্যার আশীর্বাদে সফলপ্রসন্ন হইলাম।...তাঁহার সম্বন্ধে ভুল ধারণা দাঁড়াইয়া বাইবে ইহা বাস্তবিক নহে। তিনি বাস্তবিক বাহা করিয়াছেন তাহাতেই

তাঁহার অক্ষয় কীর্তি থাকিবে। যাইবে। আমার সঙ্গে সেই পোড়ো বাড়ীতে গল। সাধেন নাই বলিয়া তাঁহার রুতিহের কিছুমাত্র পক্ষত। হইবে না।'

এর পর গিরিশচন্দ্রের বক্তব্য। 'রঙ্গালয়ে'র অনেক দিব্যাত্তর সঙ্গেই তিনি একমত হতে পারেন নি। অর্ধেক-যুক্তিসভায় প্রদত্ত ভাষণে গিরিশচন্দ্র সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে নিজস্ব ধ্যানধারণা নিখিঁদায় ব্যক্ত করেছেন। 'রঙ্গালয়'-লেখককে মূলপাত্র ধরে সেকালে তাঁর বিরুদ্ধে অর্ধেকবিরোধিতা ইত্যাদি বাণ্যরপ্রচলিত কিছু অভিযোগেরও উত্তর দিয়েছেন তিনি এই বক্তৃতার অবকাশে। তথ্যপ্রমাণ, যুক্তিনির্ভর এবং বিশ্লেষণাত্মক সেই দীর্ঘায়ত ঐতিহাসিক আলোচনাটি সম্পূর্ণক ইতিবৃত্ত হিসাবে বর্তমান পুনর্মুদ্রণের পাশাপাশি আদৃত উদ্ধৃত হওয়ার যোগ্য। কিন্তু পরিসর বহুতায় আমরা অপবিশেষের উপস্থাপনে বাধ্য হচ্ছি।

গিরিশচন্দ্র বলছেন : '...তনিতে পাই, 'বিশ্বকোবে' বঙ্গীয় রঙ্গালয়ের ইতিবৃত্তে লিখিত হইয়াছে, 'এখন বাঙ্গালী নাট্যশালায় দুইটা রীতিতে অভিনয় হইয়া থাকে।' লেখকের মতে দুইটির মধ্যে একটি অর্ধেকব্যবস্থার রীতি। ইহাতে বোধ হয়, বিশ্বকোষের এই লেখক বিশেষ বক্তৃতা ও অহুসন্ধান করিয়া লেখেন নাই। তিনি অর্ধেকুর অভিনয় ও দীক্ষাপ্রণালী বোধেন নাই। অর্ধেকুর কিত্তপ শক্তি, সংক্ষেপে তাহা জানাইবার চেষ্টা করিব। ...অর্ধেকুর অভিনয় এই; অর্ধেকুর কি ভূমিকা (Part) লইয়া রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়াছেন, অর্ধেকুর তাহা দর্শককে দেখিতে দিতেন না। দর্শক দেখিত অর্ধেকুরানু আসিয়াছেন। যতবার প্রবেশ করিতেন, ততবারই দর্শক আগ্রহের সহিত বলাবলি করিতেন—অর্ধেকুরানু আসিয়াছেন। দর্শক দেখিতেন অর্ধেকুর, কি ভূমিকা, তাহা নয়। ...কাহারও কাহারও ধারণা যে আমরা উভয়ে উভয়ের বিরোধী ছিলাম। এ ভুল অর্ধেকুর একটা কথাও দূর হইবে। অর্ধেকুর অনেকবার বলিয়াছেন, যে গিরিশ ঘোষ যদি আগে মরে, তাহা হইলে আমি ব্যতীত আর কাঁদিবার লোক নাই, আর আমি যদি আগে মরি, সে ব্যতীত আর কাঁদিবার লোক নাই।...গোড়াঙ্গীকোর ঠাকুরবাড়ীতেও বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করিয়া 'নব নাটক' অভিনীত হয়; অভিনয়-পারদর্শী অক্ষয়চন্দ্র সঙ্কুমার সেই অভিনয়ের নাটক। এই নাটক অভিনয় দেখাও অর্ধেকুর পক্ষে সহজ ছিল। 'বিশ্বকোবে' লিখিত আছে যে, এই অভিনয়দুটে অর্ধেকুর অভিনয় শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়। দেখিবার, জানিবার, শিখিবার আর কিছু বাকী রহিল না। এ হলে 'বিশ্বকোবে' ভ্রান্ত।

'পাথুরিয়াঘাটা' রাজবাড়ীর মালবিকায়িমিত্র, বিভাচন্দ্র, দেবদাস কণ্ঠ তেমনি ফল, বৃদ্ধলে কিনা? মালতীমাধব, উভয় সঙ্কট, চক্ষুমান, কল্লিত-হরণ, রঙ্গাবিকারহৃৎক ও গোড়াঙ্গীকোর 'নব নাটক' দেখিয়া যে নটের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়, ইহা যিনি নটের শিক্ষার কি প্রয়োজন, তাহার কিছুমাত্র আভাস পাইয়াছেন, তিনি সাধা কাগজে লিখিতেন না। নটের কার্য To give the airy nothing a local habitation and a name অর্থাৎ বাহুনির্মিত আকাশকুসুমকে নাম ও ধাম দেওয়া নটের কার্য। কল্লিত ও

সাংসারিক চরিত্র উপস্থিতি ব্যতীত নট কখনও প্রতিষ্ঠান্নাভ করিতে পারে না। বাহ্যিক ও আন্তরিক 'হৃদয়ঙ্গম' না থাকিলে নটের কার্য হয় না, যে অংশ অভিনয় করিবে, তাহা নট বুঝিতে পারে না। 'বিবাকোষ' উল্লিখিত শিক্ষা ভিন্ন অর্ধেকশুশ্রূষার অপর শিক্ষার নিশ্চয় প্রয়োজন হইয়াছিল। পুস্তক পাঠ বা শিক্ষিত ব্যক্তির মুখে চরিত্র বর্ণনা না শুনিলে অর্ধেকশু কদাচ প্রশংসা-ভাজন হইতেন না; Macbeth-এর Witch প্রভৃতির অভিনয় করা সামান্য শিক্ষার কার্য্য নহে।

‘...তাহারা রক্তাক্তের কথা আলোচনা করেন, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ অর্ধেকশু ও আমাকে লইয়া বাগদাহবাদ করিয়া থাকেন। তাহারা তাহাদের বাগদাহবাদ লইয়া থাকেন, তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই,—ও এতদিন ছিল না। কিন্তু সত্য ঘটনা মিথিতে গেলে, কাহারও বা বানের প্রতিবাদ হইতে পারে। তিনি মার্জনা করুন বা না করুন, কিন্তু সত্যপ্রিয় পাঠক বুঝিবেন, সত্য ঘটনা লিখিতে আমি বাধ্য।

‘সধবার একাদশী’ শেষ হইল। লীলাবতীর অভিনয় আরম্ভ হইল।...বহুদিন লীলাবতীর আকৃড়া চলে। প্রথম তথায় আমার বেশী ব্যতীয়া ছিল না, কিন্তু শেষে বাধ্য হইয়া বিশেষরূপে যোগদান করিতে হয়। চুঁচুড়ায় বন্ধিমচন্দ্র ও সাধারণীর সুপ্রসিদ্ধ অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও যজ্ঞান্ন কৃতবিদ্য ব্যক্তি একত্র হইয়া ‘লীলাবতীর’ সম্প্রদায় স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই সম্প্রদায়ের সুখ্যাতি অমৃতবাজারে প্রকাশিত হইল। বাগদাহজারে ‘লীলাবতী’ বসিয়াছে বটে, কিন্তু সকল অংশই অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। যদিও যজ্ঞান্ন কারণ মুহুর্তিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে দেখিতে পাই, আমার যোগদানের স্বরূপ কারণ বলিতে আমার বাধ্য হইতে হইয়াছে। উল্লিখিত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রিপুরা গোবিন্দচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, প্রতিভাশালী টেক্স ম্যানেজার ধর্ম্মদাস হুয়—সমবেত হইয়া আসিয়া অর্ধেকশু আমার নিকট বলেন,—‘চুঁচুড়ার দলের নিকট হারিয়া বাইব, তুমি কি বসিয়া দেখিবে?’ অর্ধেকশুরই সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ অহুরোধ।...এ সকল কথা বলিবার উদ্দেশ্য আমার এই, যে ‘বিবাকোষ’ আভাস পাই যেন এ সময় অর্ধেকশু আমার বিরোধী। না, তাহা নহে—সামর্য্য একত্রেই উদ্ভোগী। স্থাপত্যাল খিয়েটার কি নিম্নিত্ত স্থাপিত হইয়াছে, তাহার স্বরূপ বর্ণনা বহুতা বা লেখায় পাই না। অর্ধেকশুর জীবনীতে তাহা আবশ্যক, এই নিমিত্ত ‘লীলাবতীর’ প্রসঙ্গ স্থানোপযোগী।

‘...নীলদর্পণের শিক্ষা-সম্বন্ধে নানাবিধ তর্ক বিতর্ক শুনিতে পাই ও মুদ্রাক্রিত কাগজ দেখিতে পাই। সেই সব কাগজ ও কথার বিশেষ স্বত্ব, বাহাতে প্রতীয়মান হয় যে নীলদর্পণের রিহারসালে আমার কোন হস্তক্ষেপ ছিল না, কেবল অর্ধেকশুর শিক্ষাতেই সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল। আমার সংশ্রব ছিল বা না ছিল, তাহা জানাইবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু নীলদর্পণ সম্প্রদায় গঠিত করিয়াছিলেন, এ কথায় অর্ধেকশুর বিশেষ প্রশংসা হয় না। কারণ উক্ত সম্প্রদায়কৃত ব্যক্তিগণ দুইবার অতি উক্ত প্রশংসার সহিত ‘সধবার একাদশী’ ও ‘লীলাবতী’ অভিনয় করিয়াছে। নীলদর্পণে নাটককারের কৃতিত্ব ‘লীলাবতীর’ অপেক্ষা অধিক হইলেও ‘লীলাবতীতে’ নীলদর্পণ অপেক্ষা অধিক শিক্ষার

প্রয়োজন ছিল।...‘মৌলদর্পণ’ লইয়া আমার সহিত অর্ধেকশ্রম বিবাদ কেহ কেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহা অমূলক। আমি না থাকিবার কারণ কোনও বিবাদ নয়, মতের অনৈক্য মাত্র। আমার রচিত গান ‘লুপ্তবেগী বইছে ভেরোধার’ তাহার প্রমাণ। গানের স্বেব এই—‘হান সাহায়ে হাড়ী ভাঁড়ি পরসা দে দেপে বাহার।’ জ্ঞানান্তাল থিয়েটার নাম দিয়া, জ্ঞানান্তাল থিয়েটারের উপযুক্ত সাঙ্গ-দরজাম বাতীত, সাধারণের সম্মুখে টিকিট বিক্রয় করিয়া অভিনয় করা আমার অন্ত ছিল। কারণ একেই তেঁা তখন বাঙ্গালীর নাম তুলিয়া ভিন্নজাতি মুখ ঝাঁকাইয়া যায়, এতদ্ব্যতীত অন্য অসৎ জ্ঞানান্তাল থিয়েটারে দেখিলে কি না বলিবে—এই আমার আপত্তি।...বর্ধা আগমনে জ্ঞানান্তাল সাঙ্গাল বাড়ীর প্রাণে অভিনয় করা অসম্ভব হওয়ায় জ্ঞানান্তাল থিয়েটার বন্ধ হয়। প্রকৃত বিবাদ এই সময়। অজ্ঞিত অর্থ কোথায় থাকিবে, সাঙ্গ-দরজাম কে রাখিলে?—বিবাদ এই লইয়া। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিবাদ নয়, কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিবাদ, বক্তৃতা ও কাগজ-কলমে বহুবার প্রকাশিত।...অমূলক সংবাদের চতিবাদ অর্ধেকশ্রম জ্ঞানান্তাল উপযোগী বিশ্লেষণের স্বরূপ বর্ণনা করিলাম।’ বঙ্গীয় নাট্যশালায় নটচূড়ামণি বর্গীয় অর্ধেকশ্রমের মূল্য; গিরিশচন্দ্র ঘোষ। একম, ৫ম বর্ষ ২য় সংখ্যা ১৩৭৩। পুনর্মুদ্রিত।)

শিশির বসু

সংবাদ জন

‘গিরিশচন্দ্র’ নামোপাধায়-রচিত ‘গিরিশচন্দ্র (১৩৩৪) গ্রন্থের ১৩শ পরিচ্ছেদ ‘বিশ্বকোষ ও গিরিশচন্দ্র’ থেকে প্রাসঙ্গিক অংশগুলি মাত্র নিচে উদ্ধৃত হল (পৃ ২২-১০৭)।

‘...১৩১১ সালে [লিখিত, কিন্তু প্রকাশিত ১৩১২।—স এ] বিশ্বকোষে ‘রসালং’ শব্দের ব্যাখ্যা উপলক্ষে বঙ্গীয় রসালয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বাহির হয়। ইহাতে লিপিত আছে, অর্ধেকশ্রম বাঙ্গালী নাটকের রিহারসাল দেন এবং অজ্ঞানবাবু কাছে হেঁচের কাঠকঠরা চাওয়াতে তিনি অনালিত হইয়া অর্ধেকশ্রমকে তাহা দান করেন। ‘বিশ্বকোষে’ প্রকাশিত সংবাদের ধার্মা সম্বন্ধে অর্ধেকশ্রমকে জিজ্ঞাসা করি। তারণ—‘গিরিশ-গীতাঙ্গলী’তে মুদ্রিত অর্ধেকশ্রমবাবু লিখিত বিবরণ অবলম্বনে যাহা প্রকাশিত হয়—তাহার সহিত বিশ্বকোষের লেখায় সামঞ্জস্য নাই। অর্ধেকশ্রমবাবু গিরিশ-গীতাঙ্গলীর সেই অংশ পাঠ করিয়া যতঃপ্রযত্ন হইয়া উক্ত মুদ্রিতাংশ পৃষ্ঠার পার্শ্বে ‘Yes, my statement is correct’ লিখিয়া নাম সহি করিয়া দেন। আমি সেই পুস্তকখানি সম্বন্ধে রক্ষা করিয়া আসিতেছি। পাঠকগণের অবগতির জন্য সেই অংশ নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম :—

‘সম্ভার একাদশীর প্রথমদিনের রজনীর পর হইতে আমি, গিরিশবাবু কর্তৃক ঠেঙ্গ ম্যানেজার নিযুক্ত হই। পরে সম্ভার একাদশীর অভিনয় চলিতে থাকে। ইতিমধ্যে আমরা কয়েকজন টাঙ্গা তুলিয়া হারী রক্ষকের স্থাপন-মানসে একখানি Prospectus

ছাপাইয়া চীনা সংগ্রহ করিতে থাকি। দুই মাস চেষ্টা করিয়া আমরা অকৃতকার্য হই। এই সময় গিরিশবাবুর আলক জামপুকের সরকার বাটার জনবীনচন্দ্র দেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র ৬ত্ৰজনাব দেব [নাট্যমোদীপণের বিশেষ পরিচিত হুপ্রসিদ্ধ ত্রীমুক্ত নরেন্দ্রকৃষ্ণ, চুণীলাল ও নিখিলকৃষ্ণ দেব (সরকার উপাধি) ভ্রাতৃত্বের পিতা] একটা নাট্যশালা স্থাপন করিয়া কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়া একটা ষ্টেজ নির্মাণ করিতে থাকেন। গিরিশবাবুর আদেশক্রমে আমি জামপুকের বাইরা ষ্টেজ নির্মাণ-কার্যে বিশেষ সাহায্য করি। উক্ত ষ্টেজ নির্মাণ সমাপ্ত হইতে না হইতেই, ব্রজবাবু ইহলোক পরিত্যাগ করেন। নির্মাণ কার্য স্থগিত থাকে। তিন মাস পরে গিরিশবাবু, আমাকে উক্ত ষ্টেজের কাঠাদি লইয়া নতুন ষ্টেজ প্রস্তুত করিতে বলেন ও আমাকে সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম প্রদান করেন। আমি স্বীয় বাটীতে ঐ সকল কাঠাদি লইয়া ও আপনা-আপনির মধ্যে ৬০/- বাট টাকা চীনা তুলিয়া ষ্টেজ নির্মাণ ও একজন পেণ্টারকে দিয়া Scene painting আরম্ভ করি। একখানি সিন আঁকা হইতে না হইতেই টাকা ফুরাইয়া গেল। টাকার ক্ষমাপত্র আমি করিতাম। তখন আমাদের লীলাবতীর রিহারসাল চলিতেছে। আমাদের মধ্যে এমন কি অধিকাংশ লোকই Blank Verse (অমিত্রাক্ষর ছন্দ) পড়িতে জানিত না! গিরিশবাবু, তাহা কিরূপে পড়িতে হয়, সকলকে শিখাইয়া দেন। প্রকৃতপক্ষে থিয়েটারের ক, খ, শিক্কা হইতেই গিরিশবাবু মাঠার। রিহারসাল খুব চলিতেছে, অবশ্য ষ্টেজ নাই। ক্রমে ক্রমে এক একখানি করিয়া লীলাবতীর সমস্ত সিনগুলি আমার দ্বারা আঁকা হইল এবং আমিও সকলের নিকট অভ্যস্ত আদর পাইলাম। তাহার পর ষ্টেজ Complete (সম্পূর্ণ) হইলে, আমরা কৃন্দাবন পালের গলির রাজেন্দ্রলাল পালের বাটীতে ষ্টেজ বাঁধিয়া লীলাবতীর অভিনয় হুৎকার রূপে সম্পন্ন করি। My statement is correct. (sd.) D. D. Sur.

‘ধর্মদাসবাবুর statement পাঠে ভরসা করি, বিচক্ষণ পাঠকগণ ‘বিশ্বকোষের’ রদালয়-লেখকের সভ্যতার পরিমাণ বুঝিতে পারিবেন। যিনি জামপুকের বাইরা ব্রজবাবুর ষ্টেজ-নির্মাণে সাহায্য করিতেন, সেই ধর্মদাসবাবু লিখিতেছেন, ব্রজবাবুর মৃত্যুর তিন মাস পরে আমি গিরিশবাবুর কথামত জামপুকের বাইরা কাঠাদি লইয়া আসি। আর ‘বিশ্বকোষে’ লিখিত হইয়াছে,—‘ব্রজবাবু তখনও শয্যাগত। অর্ধেকদুবাবু ব্রজবাবুর নিকট কাঠকাঠরা প্রার্থনা করায় তিনি আনন্দিত হইয়া তাহা দান করিলেন।’ যে ব্যক্তি বড় সাধ করিয়া রঙ্গমঞ্চ নির্মাণ করিতেছিলেন, রোগমুক্ত হইলে তাহা সম্পূর্ণ করিবার আশা রাখেন, তাহার শয্যাশায়ী অবস্থায় গিয়া তাহার নিকট কাঠগুলি প্রার্থনা করা সম্ভবপর নহে। আবার সেই সংবাদ শুনিয়া রোগী আনন্দিত হইয়া উঠিলেন, ইহাও নূতনত্ব বটে!

‘ব্রজবাবুর পীড়াকালীন গিরিশবাবু প্রায়ই রিহারসালে বাইতে পারিতেন না বলিয়াই বোধ হয় ‘অর্ধেকদুবাবু শিক্ষাদাতা হইলেন’ বিশ্বকোষে লিখিত হইয়াছে। কিন্তু নগেন্দ্রবাবু, রাধামাধববাবু তাহারও যে গিরিশবাবুর অল্পপরিচিতি-কালে ছোট ছোট

জুরিকাগুলি নিশাইতেন, এ কথা 'বিশ্বকোষে' লিপিত হইল না কেন ?

'ভ্রাসানাল গিয়েটার সম্প্রদায়' 'নীলাবর্তী'র পর 'নীলদর্পণে'র রিহারক্সাল দিতে আরম্ভ করেন। 'বিশ্বকোষে' নীলদর্পণের রিহারক্সাল ব্যাপার হইতে গিরিশবাবুকে একেবারে ছাটিয়া বাধ দেওয়া হইয়াছে। বিশ্বকোষ বলিতেছেন,—'গিরিশবাবু বাতীত নীলাবর্তীর দলের সকলেই আসিয়া দ্রুতিলেন। পূর্বোক্ত বহুবাক্যবর্ণনের যত্নে এবার কার্যের একটা পৃথক দাপিত হইল। নগেন্দ্রবাবু সম্পাদক (ডেক্টেটরী), ধর্মদাসবাবু কথ্যধাক (ম্যানেজার), কান্তিকবাবু দেশকারী (ডেসার) আর অর্ধেন্দুবাবু পরিচালক ও শিক্ষক (Director ও Teacher) হইলেন।... অর্ধেন্দুবাবুর প্রস্তাবে 'নীলদর্পণ' অভিনয় করা হইল।' কিন্তু একথা একেবারেই সত্য নহে। তৎকালীন ম্যানেজার ধর্মদাসবাবু এবং পূর্ণপোষক শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন নিয়োগী মহাশয়ের স্বাক্ষরিত-অ'প 'গিরিশ-শ্রীভাসানী' হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি—

'বাহাই হউক সম্প্রদায় তৎপরে বিগুণ উৎসাহে শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন নিয়োগীর পক্ষাটের বৈঠকখানায় গিরিশবাবুর প্রস্তাবমত 'নীলদর্পণের' রিহারক্সাল দিতে লাগিলেন। রিহারক্সাল সমাপ্ত হইলে, দর্শকবৃন্দের আগ্রহাতিশয় দর্শনে সম্প্রদায়, টিকিট বিক্রয় করিবার প্রস্তাব করেন। এ প্রস্তাবে তাঁহাদের অভিনয়-শিক্ষক শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ অসম্মত হন। তিনি বলেন,—'আমাদের রপমক, দুগপট ও অজ্ঞাত সাফল্যরত্ন এমনও একপ উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে নাই, বাহাতে 'ভ্রাসানাল গিয়েটার' নামকরণ পূর্বক টিকিট বিক্রয় করিয়া, সাধারণে প্রকাশিত হওয়া যায়।' কিন্তু সম্প্রদায়ের অধিকাংশই একপ উত্তেজিত হন যে, তাঁহাদের শিক্ষাগুরু,—গীহার অসাধারণ শিক্ষানৈপুণ্যে তাঁহাদের সম্প্রদায় এত প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল এবং গীহার বিপুল অধ্যবসায় গুণে হুমকিত হইয়া, তাঁহারা 'নীলদর্পণ' অভিনয়ে এরূপ নবোৎসাহে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, সেট গিরিশবাবুর কথা শুনিয়া করিতে অসম্মত হইলেন। চিরস্বাধীন গিরিশবাবু, তাঁহার বহু যত্নের শিক্ষাদানের 'নীলদর্পণ' অভিনয় দর্শনে, সাধারণে দিকপ মন্তব্য প্রকাশ করে, সে কোতুল নিবৃত্তির আগ্রহ পরিত্যাগ পূর্বক তৎক্ষণাত সম্প্রদায়ের সংস্রব ত্যাগ করিলেন।'

(Sd) Dhurma Dass Sur.

(Sd.) Bhooban Mohon Neogy

(স্বাঃ) ভ্রুবনমোহন নিয়োগী।

'১৮৭৭ সাল, ভাদ্রমাসের 'নাট্যমন্দিরে' ধর্মদাসবাবুর স্বরচিত আত্মজীবনী প্রকাশিত হয়। তাহা হইতেও নীলদর্পণের রিহারক্সাল-দ্রুত উদ্ধৃত করিতেছি।—

'...পরে 'নীলদর্পণের' রিহারক্সাল আরম্ভ হইল। আমার স্বভাতি ও প্রতিনিধী শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন নিয়োগী মহাশয় তাঁহার গন্ধার উপরিহিত বৈঠকখানা আমাদের রিহারক্সাল ও আপিস করিতে দিলেন এবং আমাদের সময়ে সময়ে সাহায্য করিতে প্রতীক্ষিত হইলেন। আমরাও বিগুণ উৎসাহে কার্য করিতে লাগিলাম। ক্রমে আমাদের

'নীলদর্পণ' অভিনয় উপযোগী সিনগুলি সব প্রস্তুত হইয়া আসিল। টিকিট বিক্রয় করিয়া থিয়েটার করিবার জন্য জোড়াসাঁকোর ৮মধুসূদন সান্যাল মহাশয়ের বাটী (যে বাটী এখন ঘড়িওয়ালা বাটী বলিয়া খ্যাত) ঐ বাটী জোগাড় করা হইল। আমি ঠেঁজ প্রস্তুত করিলাম। আমরা সকলেই উৎসাহিত; কেবল গিরিশবাবুর অমত। কিন্তু আমাদের সকলে একেবারে উগ্র হইয়া উঠিয়াছে - কেহই গিরিশবাবুর আপত্তি ও অমত গ্রাহ্য করিল না, বরং সকলেই একমত হইয়া স্থির করিল, - এর অমত চয়, আমরা উগ্রকে চাহি না। উগ্রকে বাদ দিতে গেলে আমাদের সকলকে দমনে রাখে - এমন একজন আবশ্যক। কাজেই শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ মিত্র মহাশয়কে আমরা প্রেসিডেন্ট করিলাম। তাহাতে গিরিশবাবু আমাদের সকলের উপর রাগ করিলেন ও সেই কারণেই গিরিশবাবুর "লুপ্তবলী" গানের সৃষ্টি হইল। কারণ আমরা বৈদ্যনাথের নাম বিজ্ঞাপনে ছাপাই নাই।....'

'...টিকিট বিক্রয় করিয়া অভিনয় করিবার তাহাদের অধিক আগ্রহ ছিল, অর্ধেকদ্বাবু ও তাহাদের মধ্যে একজন প্রধান। তাহার কারণ, তিনি তখন অন্য কোন কাজ করিতে নাই, নাট্যাভিযান বশতঃ আকরা গৃহেই সদাসর্বদা থাকিতেন। পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, আত্মীয়তাস্বত্রে পাণ্ডুরিয়া বাটায় মহারাজা স্বতীন্দ্রমোহন ও দৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর রাজত্বের বাটীতে থাকিয়া অর্ধেকদ্বাবু লেখাপড়া করিতেন। কিন্তু কখনোনাট্য (জোড়াসাঁকো রতন সরকার গার্ডেন ষ্ট্রীটে) অভিনীত 'কিছু কিছু বৃষ্টি' প্রহসনে দস্ত-বজুর ভূমিকা (দস্ত-রোগাক্রান্ত দৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রতি স্নেহব্যক্তক) অভিনয় করিয়া তিনি পাণ্ডুরিয়াবাটী রাজবাটীতে বসবাস পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। এই মনোমালিন্য এত অধিক বৃষ্টি পাইয়াছিল যে ঠাকুর বাটী হইতে অর্ধেকদ্বাবুর পিতা ৮তমাত্রণ মৃতদেী মহাশয় যে মাসোচারা পাইতেন, তাহাও বন্ধ হইয়া যায়। এই নিমিত্ত ত্র্যমাত্রণবাবু অর্ধেকদ্বাবুর উপর বিশেষ বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় বর্ণিত 'মানসী ও মঞ্চালী' মাসিক পত্রিকায় (জানু., ১৩২৩ সাল) বাহা লিপিত হইয়াছে, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।—

'...অর্ধেকদ্বাবুর কিছু টানাটানি ছিল; তাহাকে প্রায়ই টাকা দিতে হইত। নীলদর্পণের তৃতীয় অভিনয় রজনীতে অর্ধেকদ্বাবুর অদর্শনে আমরা স্থির হইয়া পড়িলাম; কোনও রকম করিয়া যোগেশনাথ মিত্রকে দিয়া তাহার কাজ চালাইয়া লইলাম। পরদিন প্রাতে অর্ধেকদ্বাবু বাটীতে গিয়া তাঁহার পিতা ৮তমাত্রণ মৃতদেী মহাশয়ের হস্তে নগেন বন্দ্যোপাধ্যায় চারিটা টাকা দিয়া আসিলেন। তখনকার মত গেল মিটিয়া গেল। উহা অন্য অর্ধেকদ্বাবুকে দোষ দিতে পারি না। থিয়েটারের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি করিতে গিয়া তিনি নিজের সংসারের বিকে দুকপাত করিবার অবসর পান নাই। তাহার পাণ্ডুরিয়াবাটীর ঠাকুরবাটী হইতে নবাবের মাসে মাসে যে বৃষ্টি পাইয়া আসিতেছিলেন, 'কিছু কিছু বৃষ্টি' প্রহসন অভিনয়ের পর হইতেই তাহা বন্ধ হইয়া যায়। সুতরাং থিয়েটারের জন্য তাহাদিগকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইল। যদি আমরা তাহার সর্বাঙ্গীণ মোচনের

‘সেটা না করিলাম, তাহা হইলে আমাদের আচরণ অত্যন্ত পবিত্র হইত।’ (৩৭০ পৃ।)

‘নীলাবতী নাটকের জীৱোৎসাহিনী’র ভূমিকার অভিনেতা রাধামাধববাবু চলিয়া যাওয়ায়, নীলদর্পণ নাটকের মৈরিজীর ভূমিকা অমৃতবাবুকে প্রদান করা হয়। ‘বিশ্বকোষে’ লিখিত হইয়াছে, অর্জুনবাবুই তাহাকে সম্পূর্ণ শিক্ষা প্রদান করেন। কিন্তু অমৃতবাবু তাহা স্বীকার করেন না। [হ. শিশির বহু লিখিত আলোচনা। ম. এ] --

‘...অমৃতবাবু সহজে বিশ্বকোষে ‘এক আঙঠু’ ছিল’ আছে, কিন্তু গিরিশবাবু সম্পর্কে সেই কালের মাত্রা অত্যধিক বাড়িয়া গিয়াছে। ১৩১৫ সালে, ‘আবিন মাসে’ মিনাটা গিয়েটারে অর্জুনবাবুর শোকসভায় গিরিশবাবু অর্জুনবাবু সহজে যে প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাহাতে বিশ্বকোষের এই সকল ত্রুটি সহজে উল্লেখ করেন। ‘বিশ্বকোষ-সম্পাদক’ পণ্ডিত ব্রজেন নাগেন্দ্রনাথ প্রাচ্যাদিকামহাশয় মহাশয়ও সেই সভায়ই উপস্থিত ছিলেন। তিনি ডাঙলে বলেন, — “বিশ্বকোষে প্রকাশিত ‘রত্নাশ্রম’ প্রবন্ধটি অর্জুনবাবুর পুত্র গোমাকেশ বা আমাকে লিখিয়া দেন। নানা কারণে আমি এ প্রবন্ধটী গিরিশবাবু ও অমৃতবাবুকে দেপাইয়া লইতে পারি নাই। এক্ষণে বুঝিতেছি, এই প্রবন্ধটীতে অনেক গলদ রহিয়া গিয়াছে। ষাটাই হউক পুনর্দ্রষ্টব্য কালে আমি ইহা সংশোধিত করিয়া বাহির করিব। আমি এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ, ভরসা করি, আপনারা। এতদ্বিষয়ে আমাকে সাহায্য করিবেন।”

স্বীকৃতি

কালিকা টাইপ ফাউণ্ডার শ্রীমলয়কুমার চক্রবর্তী তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে ‘বিশ্বকোষ’ ১৬শ খণ্ডটি ব্যবহার করার স্বযোগ দেওয়ায় বর্তমান মুদ্রণে কুলের সঙ্গে মিলিয়ে গ্রন্থ সংশোধন করা সম্ভব হয়েছে।

॥ ক্রোড়পত্র সমাপ্ত ॥

পত্রিকার কথা

'শারদীয় একশ ১৩৮*' প্রকাশিত হল। এটি একাধারে দশম বর্ষ / বর্ষ সংখ্যা ৪। গত এক বছর পত্রিকার প্রকাশ বিশেষভাবে বিলম্বিত হওয়ায় একই বর্ষের সীমায় দু'বার শারদীয় সংখ্যা প্রকাশে বাধ্য হতে হল। আর পত্রিকার দশম বর্ষও পূর্ণ হয়ে গেল এই সঙ্গে। এখানে উল্লেখযোগ্য, ১৯৬১ থেকে স্বাধীনতা পত্রিকার নিয়মিত প্রকাশ ঘটলে এটি হতো ত্রয়োদশ বর্ষের শারদীয় সংখ্যা।

যেসব বন্ধু ও হিতৈষীর নানা সহায়তায় এ সংখ্যার প্রকাশ সম্ভব হল তাঁদের আলাদাভাবে কৃতজ্ঞতা জানানো বাহ্যিক মনে করছি।

পত্রিকার সকল শুভামুধ্যায়ীকে শারদীয় কৃতজ্ঞতা জানাই।

স্বীকৃতি

মুদ্রণে সহায়তা।

শান্তিনাথ প্রেস

১৬ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা ৬

রক ও প্রস্তুতকরণ * ১

ইণ্ডিয়ান কটো এনগ্রেভিং কোম্পানি প্রা. লি.

২৮ বেনেটোলা লেন, কলকাতা ৯

ব্যাংক

দৌরাদ বাইপাস

৭৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা ৯

ঐশ্বরী ঘোষ কর্তৃক ব্যবসা ও বাণিজ্য প্রেস, ৯/৩ রত্ননাথ মহাস্থান স্ট্রিট, কলকাতা ৯ থেকে মুদ্রিত ও সংবর্ধক ৭০ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা ৯ থেকে প্রকাশিত।